মনের মধ্যে মন

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রকাশিকা ঃ

শ্রীমতী শতদল জানা

সুপ্রীম পাবলিশার্স

১০/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ গণেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ

গোপাল চন্দ্র পাল

স্টার প্রিন্টিং প্রেস

২১/এ, রাধানাথ বোস লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরম স্নেহময়ী

পূর্ণিমা দেবী

ও

পঙ্কজা দেবীকে

ক্রমানুসারে উপন্যাসসমূহ

সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য এক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি আবির্ভূত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দু'-একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির কালানুক্রমিক একটি গ্রন্থ-তালিকা নিচে দেওয়া হল। শিশুসাহিত্য ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি এই তালিকায় দেওয়া হল না। সেই সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় যুক্ত হল তাঁর স্বাক্ষর।

শৈলপুরী কুমায়ুন
কলাভূমি কলিঙ্গ
অগ্নিকন্যা
অনেক বসন্ত দুটি মন
ভোরের রাগিণী
ডাক্তার জনসনের ডায়েরী
রোদ বৃষ্টি ভালবাসা
কন্যা কাশ্মীর
বসন্ত বিলাপ
হিরণ্যগড়ের বধূ
আঁধার পেরিয়ে
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে
রিসেপ্‌শনিস্ট
ফরেস্ট বাংলো
নির্জনে খেলা
মোহিনী
কালের কল্লোল
পরমা
আর্য-অনার্য
আপন ঘর
সাইক্লোন
মহাকালের বন্দর
ত্রিবেণী
মরু-মৃগয়া
বনপর্ব
মেঘ-ময়ূরী
নির্জন নির্ঝর
কালের রাখাল
জয়িতা
অনুরাগিণী
মন-অরণ্য
অনন্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প
অমৃত নিকেতন
স্বপ্ন-শিখর
পদধ্বনি
লীলা সঙ্গম
মন্থন
নীলাঞ্জনা
দাহা তিসি গোংগা

জন্মান্তর

সিস্টার অ্যান বার্ণাদেৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলেন।

কুমার অভিরাম ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন। বার্ণাদেৎকে ধরে গাড়িতে তোলা হল। আঘাত সম্ভবতঃ মাথাতেই। অভিরামের বুকের ওপর মাথাটা হেলান দিয়ে বসে রইলেন বার্ণাদেৎ।

গাড়ি ছুটে চলেছে দেরাদুন ছাড়িয়ে মুসৌরীর পথে। হেডলাইট জ্বলছে। সাপের মত বাঁকগুলো আসছে আবার পিছলে সরে যাচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে কুমারসাহেবেরও। কি ভয়ানক অ্যাকসিডেণ্ট। যেন মুহূর্তে সামনের দু'খানা পা শূন্যে তুলে হ্রেষারব করে উঠল একটা তেজীয়ান ঘোড়া। তারপরই ট্রেনটা কাত হয়ে পড়ল। আশ্চর্যভাবে টাল সামলে নিলেন কুমারবাহাদুর। কিন্তু সহযাত্রিনীটি ছিটকে পড়লেন দরজার ওপর।

স্টেশনের কাছেই অ্যাকসিডেণ্টটা ঘটেছিল। লোকের আর্তনাদ, দৌড়া-দৌড়ি, আলো অন্ধকারে মিলে মুহূর্তে বিরাট স্টেশনটা যেন কেঁপে উঠল।

ড্রাইভার দিলওয়ার সিংই প্রথম বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেছিল। বেরিয়ে আসতে গিয়ে বাধা পেলেন কুমারবাহাদুর। নানের পোশাকপরা মেয়েটি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে দরজার পাশেই। দিলওয়ার সিংকে ইঙ্গিত করলেন কুমারবাহাদুর। জল এলো। মুখে চোখে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন স্বয়ং লালসিয়া এস্টেটের রাজকুমার।

নান একবার যেন একটুখানি প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করলেন। তারপর আবার সেই নিশ্চল অচেতন অবস্থা। অগত্যা কুমারবাহাদুর দিলওয়ার সিংএর সাহায্যে তরুণী নানটিকে তুলে আনলেন স্টেশনের বাইরে। মাঝপথে দিলওয়ার সিং একবার জিজ্ঞেস করল, সাহাব, রেসিডেন্স চলে ঁ ইয়া হসপিট্যাল ?

নেহি ঁ—কোঠি চলো।

গাড়ি আরও জোরে ছুটে চলল।

কুমারমহল। লালসিয়া এস্টেটের দুটি বাড়ি এই পাহাড়ী শহর মুসৌরীতে। একটি ল্যাণ্ডোর ক্যাণ্টএ, অন্যটি কোম্পানিবাগের চড়াই যেখানে শেষ হল, তার ঠিক নীচের পাহাড়ে। ল্যাণ্ডোরের দেওদার বনের আলোছায়ায় কুমারমহল। ছোট্ট বাড়ি। মনে হবে দক্ষ কোন শিল্পীর একটি বহুপ্রশংসিত ল্যাণ্ডস্কেপ।

অন্য বাড়িখানা প্রাসাদবিশেষ। বহু প্রাচীন উঁচু গম্বুজওয়ালা মহল। বাগান, লোকলস্কর, কর্মচারীদের বাইরের ঘর। ভেতর মহল। দোতলা প্রাসাদ। শতাধিক ঘর। পাহাড়ের তিনটি ধাপে বাড়িখানা উঠে গেছে। বাগানে বসার জন্যে কংক্রিটের চেয়ার। পাইনগাছের সারি। এক এলাহী কাণ্ড। প্রাসাদের সামনের গেটে লেখা আছে—'রানীমহল'।

রাজা সুরিন্দর সিং মৃত্যুর আগেই প্রিয়তমা রানীসাহেবাকে এই মহলটি উপহার দিয়ে যান। বহু অর্থ ব্যয়ে তৈরী হয়েছিল এই শৈলাবাস। সামনের তোরণে একটি পাথরের ফলকে 'রানীমহল' কথাটিও উৎকীর্ণ করে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজা সুরিন্দর সিংএর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে তাঁর বিশাল জমিদারি, সারা ভারত জুড়ে ছোটবড় ব্যবসা-বাণিজ্য, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই সংশ্লিষ্ট লোকদের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ দক্ষতায় সবকিছুকে রক্ষা করলেন লালসিয়ার রানীসাহেবা।

একমাত্র সন্তান অভিরাম বড় হতে লাগল। বিলাতের ইস্কুলে পাঠ শেষ হলে রানীসাহেবা তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। এখন থেকে এস্টেটের ভার একটু একটু করে বুঝে না নিলে ভবিষ্যতে নানা ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে। তাই তরুণ পুত্রটিকে রানীসাহেবা ম্যানেজারের সঙ্গে এস্টেটের নানা জায়গায় পাঠাতে লাগলেন।

অভিরাম প্রখর বুদ্ধিধর, কিন্তু স্থির। তাই সবকিছু বুঝে নিতে তার বিলম্ব হল না।

রানীসাহেবা বর্তমান থাকতেই ল্যাণ্ডোরে কুমারবাহাদুরের জন্য 'কুমার-মহল' তৈরি করান।

কুমার অভিরামের ইচ্ছা অনুসারে সে বাড়িখানি হয়েছিল খুবই ছোট। গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন স্বয়ং কুমারবাহাদুর, অবশ্য ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন বিলেত থেকে তাঁর সে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে।

দুটি পাহাড় যেখানে এসে মিলেছে তারই শিরায় উঠে গেছে দেওদারশ্রেণী, নীচ থেকে ওপরে। বর্ষায় ঐ দেওদারের গা বেয়ে কুলকুল করে নামতে থাকে ঝরনার ধারা। নুড়িগুলো জলের স্রোতে ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। ঐ দেওদার বনের ফাঁকে দেখা যায় কুমারমহল। সাদা লালে মেশা বাড়িখানা। সামনে লতাবিতান। ছোট্ট একটি বসবার জায়গা। মাথায় গম্বুজাকৃতি চন্দ্রাতপ। লতায় ফুলে পাতায় তা ঢাকা পড়ে গিয়ে আরও সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ি-খানার ঠিক সামনে, লতাবিতানে যাবার পথে একটি মূল্যবান পাথরে বাঁধান অতিক্ষুদ্র জলাধার। তাকে বলা যায় জলদর্পণ। কুমারমহল সেই ছোট আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

এ হল কুমারমহলের সামনের দৃশ্য। পেছনের বন গম্ভীর হয়ে উতরাইতে নেমে গেছে। সেখানে কোন বাড়ি নেই। শুধু বন আর গভীর খাদ। এই মহলের পেছনে পাহাড়ের ঐ খাদের গায়ে পাথর সাজিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরখানার ওপরে বড় বড় পাথর এমনভাবে রাখা হয়েছে, আর এমন গাছগাছালিতে তা ভরে দেওয়া হয়েছে যাতে এই গৃহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই থাকে না। এ ঘরখানা কুমারমহলের মূল বাড়িখানার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গপথে যুক্ত। অতিশয় মনোরম ও সুসজ্জিত। একমাত্র কুমারবাহাদুর ছাড়া এই গুপ্তগৃহে অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ।

হাঁ, আর একজন মাত্র ইদানীং সে গুপ্তগৃহে মাঝে মাঝে প্রবেশের অধিকার পায়। অবশ্য কুমারবাহাদুরের সাহস হয়নি জননী মহারানীসাহেবা বর্তমানে কাউকে সেখানে প্রবেশের অধিকার দিতে। রানীসাহেবার মৃত্যুর পরে লালসিয়া এস্টেটের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। একটি প্রবাদের সূত্র ধরে 'রানীমহল'এ

উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বসবাস। লালসিয়ার উত্তরাধিকারী তরুণ, তার ওপর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন কুমারবাহাদুরের যদি এতে চিত্তচাঞ্চল্য কিছু ঘটে থাকে তাহলে তা অস্বাভাবিক নয়।

আর মানুষের যখন মন চঞ্চল হয় তখন আশেপাশে দু'একজন সঙ্গীও এসে পড়ে। সুজন সিং কুমারবাহাদুরের তেমনি এক সঙ্গী। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়, তারপর কুমারবাহাদুরের আকর্ষণে চলে আসে সুজন সিং তাঁর এস্টেটে। এখন সুজন সিং কুমারবাহাদুরের অন্তরঙ্গ অনুচর। কিন্তু পরিজনেরা কানাঘুষোয় বলেন, বৃদ্ধ ম্যানেজারের পরেই সুজন সিং ধরবে এস্টেটের হাল, তখন আর লালসিয়া এস্টেটের ভরাডুবির বিলম্ব হবে না।

সুজন সিং যে সর্বতোভাবে সুজন নয় তা বুদ্ধিধর কুমার-বাহাদুরের অজানা নয়, কিন্তু বুদ্ধি মানুষের যত তীক্ষ্ণই হোক, হৃদয়ের কাছে হার তার প্রায়ই হয়ে থাকে। কুমারবাহাদুরের বুদ্ধি তাঁর হৃদয়ের কাছে হার মানছিল প্রতিদিন। আর এই হার মানার খেলায় যে তাঁকে চালনা করছিল সে স্বয়ং সুজন সিংএর অসাধারণ কলাবতী ভগ্নী লক্ষ্মীবাই।

এই লক্ষ্মীবাইয়ের প্রেমে তখন কুমার অভিরাম মগ্ন। তাঁর ল্যাণ্ডোর ক্যাণ্টের গুপ্তগৃহে তাই ইদানীং লক্ষ্মীবাই-ই ছিল একমাত্র আকাঙ্ক্ষিতা অতিথি।

কুমারবাহাদুরের পরিজন, এমন কি লালসিয়া এস্টেটের সাধারণ কর্মচারীদেরও ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে লক্ষ্মীবাই একদিন এই লালসিয়া এস্টেটের কাল হয়ে দাঁড়াবে। তারা শুনতে পাচ্ছিল লালসিয়া এস্টেটের অন্দরমহলে অলক্ষ্মীর পদসঞ্চার।

কোন এক বেলাশেষে যখন পাহাড়ী দেওদারের মাথায় মাথায় সূর্য তার শেষ সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন পাশাপাশি বসে ছিল কুমারবাহাদুর আর লক্ষ্মীবাই। কুমারবাহাদুরকে রাজস্থান কাহিনীর একটি অংশ পড়ে শোনাচ্ছিল লক্ষ্মীবাই। হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে লক্ষ্মীবাই দেখল, কুমারবাহাদুর শেষ সোনার খেলা দেখছেন গাছের পাতায় পাতায়।

বইখানা বন্ধ করে কুমার অভিরামের আরও কাছাকাছি সরে এল লক্ষ্মীবাই।

একটা উত্তপ্ত নিশ্বাসের ছোঁয়া পেয়ে কুমারবাহাদুর চকিত হয়ে উঠলেন : তারপর, তারপর কি হল শিলাদিত্যের? সেই অরণ্যে ভরা মন্দিরের দ্বারে বসে শিলাদিত্য ডাকতে লাগলেন তাঁর ভগ্নীর নাম ধরে। তারপর দরজা কি খুলল?

কুমারবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির রেখা মুখে টেনে বলল লক্ষ্মীবাই, দরজা কি কখনো খোলে কুমারবাহাদুর? তাকে খুলতে হয়।

একটু সংকুচিত হয়ে অভিরাম বললেন, কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মী, আমি সত্যিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হাঁ, তারপর শিলাদিত্য

ডাকতে লাগল ভগ্নীর নাম ধরে।

কুমারবাহাদুর, ওদের আমরা অনেক দূরে ফেলে এসেছি। এখন বাপ্পাদিত্যের রাজত্ব কাল।

তোমার কাছে প্রতিদিনই আমার হার হচ্ছে লক্ষ্মীবাই।

ও কথা কেন কুমার ?

এই যেমন কখনো তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না আমি, কখনো তোমার পড়ার সময়ে অন্য কথা ভেবে চলেছি।

পুরুষ একটু অন্যমনস্ক হলে ভাল লাগে কুমারবাহাদুর।

কার ? হেসে জিজ্ঞেস করেন অভিরাম।

যেন প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় লক্ষ্মীবাই। মিঠি হাসির সঙ্গে জবাব ফিরিয়ে দেয়, মেয়েদের।

কুমার অভিরাম অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

এ সপ্তাহে কেম্‌টি ফল্‌স্‌এর দিকেই আমাদের মৃগয়াযাত্রা হবে, কি বল ?

উচ্ছল হয়ে উঠল লক্ষ্মীবাই ঃ সেদিন আমাদের শিকারপর্ব শেষ না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল। এবার ভোরবেলা থেকেই আমাদের যাত্রা। ভাইজীকে আগেভাগেই খবরটা দিয়ে রাখতে হবে।

যদি বলি, এ যাত্রায় শুধু তুমি আর আমি থাকব, সুজন থাকবে না—

আপনার অভিরুচি।

আমার সঙ্গে একা যেতে ভয় করবে না তোমার ?

লক্ষ্মীবাই সকৌতুকে পালটা প্রশ্ন করল, আপনি বুঝি খুব ভয়ংকর ?

যথার্থ পুরুষ সব সময়েই ভয়ংকর লক্ষ্মী।

তাহলে আমাকেও বলতে দিন কুমার, যথার্থ নারী সেই ভয়ংকর পুরুষের কাছেই তার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

হাসলেন কুমার অভিরাম। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট করে পড়ে নিতে পারল না লক্ষ্মীবাই। সূর্যের আলো ততক্ষণে নিভে এসেছিল। অরণ্যের ঘন ছায়া এসে পড়েছিল ঘরের ভেতর।

লক্ষ্মীবাই নিবিড় হতে চাইল এই মুহূর্তে। রক্তে তার বয়ে এল আদিম উত্তাপ। উত্তরের কঠিন তুষার হাওয়াও তাকে শীতল করতে পারল না। কিন্তু একসময় মনে পড়ল তার সুজন সিংএর একটি কথা। চড়াই ভাঙা কঠিন, কিন্তু সেখানে পড়ার ভয় কম, উতরাই যত সহজই হোক সেখানে তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে গেলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

নিজের মনের প্রবল একটা পীড়নকে লক্ষ্মীবাই চাবুক মেরে নিরস্ত করে বলল, এখন আমরা বাইরে যেতে পারি কুমারবাহাদুর।

নিশ্চয়ই। আবার কাল শুরু হবে আমাদের পাঠ। তোমার উচ্চারণ, তোমার গলার ওঠা-নামা আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে লক্ষ্মীবাই।

আপনার প্রশংসার যোগ্য আমি নই তা জানি কুমারবাহাদুর। তবু আপনার মুখের ঐ কথাটুকুকে মিথ্যা বলে ফিরিয়ে দেব এমন সাধ্য

আমার নেই।

শেষ অবধি শিকারযাত্রার সঙ্গী হল সুজন সিং। বনের ভেতর বাঁধা হল তিনটি মাচান। লক্ষ্মীবাই উপযাচক হয়ে নিজের জন্য পৃথক একটি মাচানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সে বলেছিল, শিকারে আমি কারো ওপর নির্ভর করতে চাই না।

পাহাড়ী একটা ঝরনা বয়ে গেছে বনের বুক চিরে। তারই একটু দূরে তিনটি গাছে তিনটি মাচান।

কথা হয়েছে, হরিণের দুটি চোখের মাঝে কপাল লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে লক্ষ্মীবাই। কণ্ঠ হবে কুমারবাহাদুরের লক্ষ্যস্থল। আর সামনের দুটি পায়ের মধ্যেকার বক্ষ হবে সুজন সিংএর লক্ষ্য। যে সফল হবে সেই পাবে শ্রেষ্ঠ শিকারীর শিরোপা।

সকাল থেকে উত্তেজনার অন্ত ছিল না। কিন্তু শিকার পাওয়া যাবে রাতে। উদ্যোগ-আয়োজন অল্প সময়ের ভেতরেই শেষ হয়ে গেল। কুমারবাহাদুরের যে দু'একজন পার্শ্বরক্ষী ও পরিচারক ছিল তাদের বিদায় দেওয়া হল। দূরের ঘাসগুমটির কাছে তারা তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করবে। সারারাত চলবে শিকারপর্ব।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। চাঁদ উঠবে দু'প্রহর পরে। সন্ধ্যা নামল পাহাড়ে। পাশাপাশি কতকগুলি সুউচ্চ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই গভীর সানুদেশ জুড়ে বন। বনে ছায়া নেমে এসেছে আগেই। বড় বড় পাহাড়ের ছায়া আর বনের ছায়া মিলে সূর্যাস্তের আগেই যেন ঘন আঁধারের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকের কাছেই আছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বন্দুক, টর্চ। কিন্তু নিতান্ত দরকার ছাড়া টর্চ জ্বালানো বারণ। জন্তুজানোয়ারগুলো এ বনে একটু বেশী সজাগ। বহু শিকারীর আনাগোনা এ অঞ্চলে। প্রতীক্ষা করছে শিকারীর দল। চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষা। অন্ধকারে খাদের ভেতর থেকে লাল আর হলুদ চোখের তারা জ্বলে জ্বলে উঠছে। বুনো মোষ, বাঘ কিংবা পাখিদের চোখের তারার আলো ভিন্ন ভিন্ন রকম। অভ্যস্ত শিকারী দেখলেই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে বনের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছোটখাট জন্তু-জানোয়ারের দৌড়ে যাবার শব্দ ভেসে আসছে। সে শব্দ থেমে গেলে বনের কীটপতঙ্গের মিহি সুরের আওয়াজ জেগে ওঠে। একটু কান পাতলেই শোনা যায় আর একরকম শব্দ। ভারী মিষ্টি সে আওয়াজ। বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে নুড়িগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে চলেছে যে জলধারা তারই শব্দ। রাতে সকল শব্দই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়, দিনে কোথায় যেন সব হারিয়ে যায় বিপুল শব্দতরঙ্গের মধ্যে।

চাঁদ দেখা গেল। গাছগুলোর মাথায় মাথায় সাদা মিহি ওড়না যেন কে বিছিয়ে দিয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকার আকাশে যে তারাগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল তারা ধীরে ধীরে কিছুটা অস্পষ্ট হল। আকাশ নীল নির্মল। চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাহাড়ের প্রতিটি খাঁজে, বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

ঝরনার স্রোতধারাকে মনে হচ্ছে একটি তরল গলিত রৌপ্যের প্রবাহ।

থেমে গেছে আরণ্যক প্রাণীদের অন্ধকার-বিচরণ। যেন সমস্ত বনভূমি একটি নতুন নাটকের জন্য পট তৈরি করে রেখেছে। তিনটি গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে রয়েছে তিনজন। তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে একটি বড় শিলাখণ্ডের ওপর। যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতি রাতে বনের প্রাণীরা ঐ ঝরনার জলপ্রবাহ থেকে পিপাসা মেটায়।

প্রথমে এলো কয়েকটি বুনো মোষ, সঙ্গে বাচ্চা। অলসভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝরনার জল খেয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। কিছুক্ষণ সবকিছু নিস্তব্ধ। দু'একটা শেয়ালের হঠাৎ থেমে থেমে গন্ধ শোঁকা তারপর চোঁ চোঁ দৌড়ে বনের ভেতর ঢুকে যাওয়া। ওরা তিনজনে দেখছে, ভাবছে তিনজনে। কুমারবাহাদুর ভাবছেন, চিত্রিত একটি হরিণ জল পান করে ফিরে তাকিয়েছে। আর তার চোখ দুটি উঁচু করে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠেছে তাঁর হাতের বন্দুক। কণ্ঠে বিদ্ধ হয়েছে গুলি। পড়ে যাবার সময়ে একটি আর্ত চীৎকার করবার সুযোগও সে পেল না।

না, এবারও হরিণ এলো না, দুটো শূকর ঘোঁৎঘোঁৎ করে বনের এপার থেকে সরু পথটা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল।

একটি মিনিটও পার হয়নি, একটা বাচ্চা হরিণকে সঙ্গে নিয়ে ঝরণার ধারে এসে দাঁড়াল একটা বড় হরিণী। একবার ত্রস্তে তাকাল এদিক ওদিক। তারপর নির্ভয়ে জল পান করতে লাগল। কিছু পরে তাকাল সঙ্গের শিশুটির দিকে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পান করে নাও, দেখ কত ঠাণ্ডা—হরিণের ভাবটা এমনি।

হরিণশিশুটিও মুখ নামাল সেই স্রোতধারায়। একবার মায়ের দিকে, একবার জলের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হরিণটি তাকাল পূর্ণ চাঁদের দিকে।

ফিরে দাঁড়িয়েছে। কি আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে! পেছনে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাটা।

তিনটি বন্দুকই গর্জে উঠল। একটি বন্দুকের গুলি আকাশের চাঁদের দিকে নিক্ষিপ্ত হল। যেন এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটুকুকে মুছে ফেলার জন্য চাঁদের আলো নিভিয়ে দেবার চেষ্টা।

হরিণটা পড়ে গেছে পথের ওপর। পড়ার আগে সে শব্দ করেছিল। নাঃ, কুমারবাহাদুরের শিকারী সাজা উচিত হয়নি। চাঁদের আলো আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুজন সিংই কথা কইল, এবার নামা যাক।

উত্তর এলো লক্ষ্মীবাই-এর কাছ থেকে, আমিও নামছি কিন্তু।

না, তোমাদের কাউকেই নামতে হবে না, আমিই পরীক্ষা করব।—নিজের আস্তানা থেকে হেঁকে বললেন কুমার অভিরাম। তারপর মই লাগিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন নীচে।

ওরা দেখল কুমার অভিরাম ছুটেছেন হরিণটির কাছে। বাচ্চা হরিণটা

এতক্ষণ মায়ের গা শুঁকছিল, একটি মানুষকে দৌড়ে আসতে দেখে সে লাফাতে লাফাতে বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমার অভিরাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন হরিণটার কাছে। তিনি জানেন, আকাশের বুকে তাঁর নিশানা উধাও হয়েছে। এখন বাকী দু'জন। কৌতূহলী কুমার হরিণের দেহ স্পর্শ করে দেখলেন একটিমাত্র বুলেটের চিহ্ন সেখানে বর্তমান ; আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার বুলেট হরিণের ললাট বিদ্ধ করেছে।

কুমার উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেনঃ সাবাস লক্ষ্মীবাই, জয়তিলক তোমারই ললাটে পড়ল। কেঁপে উঠল লক্ষ্মীবাইএর সমস্ত মন। কোন্ জয়তিলক তার ললাটের জন্য অপেক্ষা করে আছে। লক্ষ্যভেদ, না স্বয়ং লালসিয়ার যুবরাজ কুমার অভিরাম। দ্বিতীয় ইচ্ছাটা তার লক্ষ লক্ষ শিরা-উপশিরাকে পাক দিতে দিতে মাতাল করে তুলল।

অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে আসছিলেন কুমারবাহাদুর লক্ষ্মীবাইএর মাচানের দিকে।

তীক্ষ্ম চীৎকার করে উঠল সুজন সিং।

মুহূর্তে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। পেছন থেকে তীব্রবেগে তীক্ষ্ম শিং উঁচিয়ে ছুটে আসছে একটা বাইসন। পেছন ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে কুমারবাহাদুর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। গর্জে উঠল সুজন সিংএর বন্দুক। বাইসনটাও কুমারবাহাদুরের একটু দূরেই টলতে টলতে পড়ে গেল। লক্ষ্মীবাইএর আর্ত চীৎকারে খানখান হয়ে ভেঙে গেল বনের অন্ধকার।

কুমারমহলের একটি কক্ষে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন কুমার অভিরাম।

পাশে এসে দাঁড়াল নার্স সুভদ্রা ভার্গব। কুমারবাহাদুর বললেন, আজও আমি একটু উঠে বসতে পাব না সিস্টার ?

ডাক্তার গর্গের কাছে অনুমতি মেলেনি কুমারবাহাদুর, তবে দু'একদিনের ভেতর আপনি নিশ্চয়ই উঠে বসবেন।

একটু থেমে নার্স বলল, উত্তরের জানালাটা খুলে দেব কি ? দূরের পাহাড়গুলো আপনার চোখে পড়বে।

কিছু না পাওয়ার চেয়ে এ একরকম করে পাওয়া। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কুমার অভিরাম।

নার্স সুভদ্রা জানালা খুলে দিল।

ভোরবেলার আলোর খেলা শুরু হয়ে গেছে মেঘে মেঘে। তুষারের পাহাড় তার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক যেন ঘোমটার আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করছে। হালকা পিংকরঙের ছোপ লেগে আছে তুষারের গায়।

জানালাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বয়ে এলো।

নার্স তাড়াতাড়ি পায়ের কাছে পড়ে থাকা কম্বলটা কুমারবাহাদুরের গায়ের

ওপর টেনে দিল।

এটা আবার কেন সিস্টার ? বেশ তো ভাল লাগছিল হাওয়াটুকু।

অনেক কিছু যা ভাল লাগে, সব সময়ে তা ভাল নাও হতে পারে।

নার্স সুভদ্রা ভার্গব মাসাধিককাল রাতদিন রয়েছে কুমারবাহাদুরের পাশে। তাই যে কোন কথাকেই সে অসংকোচে বলার শক্তি অর্জন করেছে।

কুমার অভিরাম সুভদ্রার সেবায় সুস্থ জীবন ফিরে পাচ্ছেন। সুভদ্রা ভার্গবের সহজ মধুর কথা আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এই ক'টি দিনের ভেতর।

আর কোন কথা না বলে তেমনি করে চুপচাপ শুয়ে রইলেন কুমারবাহাদুর।

হরলিক্সের কাপটা মুখের কাছের টিপয়ের ওপর রেখে কুমারবাহাদুরের পাশের চেয়ারে বসল নার্স সুভদ্রা।

আজ আমি হলফ করে বলতে পারি কুমারবাহাদুরের শরীর খুবই হালকা মনে হচ্ছে

কুমার অভিরাম আঙুল দিয়ে জানালার বাইরে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। একটি পাখি উড়ছিল তার সাদা ডানা মেলে ভোরের আকাশে।

হরলিক্স এক চামচ কুমারের মুখের সামনে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল সুভদ্রা ভার্গব, কবি হলেই আপনাকে মানায় ভাল, শিকারী হওয়া আপনার সাজে না।

তাই তো সাজা পেলাম। সেদিন তোমাকে কাছে পেলে হয়তো ভুলটা আমার শুধরে নেবার সুযোগ পেতাম।

কুমার অভিরাম কথাগুলো বলে তাকালেন নার্সের দিকে। কি যেন অদৃশ্য লিপির পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন নার্স সুভদ্রার মুখে।

স্থির, প্রশান্ত সুভদ্রা ভার্গবের মুখ। হরলিক্সের চামচটা এবার মুখের এত কাছে এগিয়ে এনেছে নার্স যে সেটাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে হল।

কিছুক্ষণের নীরবতা। শুধু সুভদ্রার হাতের চামচের সঙ্গে কাপের সংঘাতে মাঝে মাঝে মিষ্টি একটা ঠুংঠাং আওয়াজ উঠছিল। খাওয়া শেষ হলে সুভদ্রা আজ তোয়ালেখানা কুমারের হাতে এগিয়ে দিল।

কুমারবাহাদুর হেসে বললেন, আজ থেকে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে, কি বল ?

তাই তো আপনার পছন্দ ; মুখে বলল, কিন্তু তোয়ালেটা নিজের হাতে নিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল অভিরামের।

তারপর সুভদ্রা আর সেখানে বসল না। নিজের কাজে চলে গেল কক্ষান্তরে।

তোপটিম্বার ওপরে সেন্ট মেরিজ হসপিট্যাল। সুভদ্রা ভার্গব সেখানকার স্টাফ নার্স। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করতে হয় তাকে। তারপর সে পায় প্রাইভেট কাজ করার সুযোগ।

ডাক্তার গর্গ বহুকাল লালসিয়া রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত। রাজা সুরিন্দর সিংএর সময়ে তিনি চিকিৎসক হয়ে তাঁর পরিবারে আসেন। তারপর রাজা

সুরিন্দরের চেষ্টাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন সেন্ট মেরিজ হসপিট্যালে। এখন তিনি হসপিট্যালের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান।

নার্স সুভদ্রা ভার্গবকে তিনিই নিযুক্ত করেছিলেন কুমারবাহাদুরের পরিচর্যার কাজে। সুভদ্রা তাই কিছুদিনের জন্য হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছিল। ডাক্তার গর্গ সুভদ্রাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সুভদ্রার কাজে নিষ্ঠা এবং সেবায় আন্তরিকতার জন্য তিনি তাকেই নির্বাচন করেছিলেন এ কাজে। সুভদ্রাকে তিনি নার্স কোয়ার্টারে না গিয়ে কুমারমহলেই থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সারারাত সুভদ্রা কুমার অভিরামের বেডের কাছটিতে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে। ঐখানেই তার নিদ্রা, ঐখানেই জাগরণ। মাসাধিক-কাল ঐ ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে। তবে প্রয়োজন আর হবে না রাত্রি জাগরণের। সুভদ্রার সেবার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

আজ সকালে কুমারকে খাইয়ে, সুভদ্রা পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল। আজ আর নার্সের পোশাক পরতে ভাল লাগছে না তার। স্নান সেরে সে পরল একখানা শাড়ি। হালকা সবুজ রঙ, আঁচলায় সোনালী কাজ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে প্রসাধন করল। তারপর কুমারমহলের পেছনদিকের বাগানে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। কত রকমের লতা আর ফুলের গাছ। নানা রঙ, নানা আকার। প্রজাপতি একটা উড়ছিল। এ ফুলে ও ফুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাসি পেল সুভদ্রার। কি চঞ্চল! কোথাও একটু স্থির হয়ে থাকবে না। মন বসবে না ওর কিছুতেই এক ফুলে। আপনমনে খুশিতে ভেঙে পড়ল সুভদ্রা। হাত নেড়ে নেড়ে সে তাড়া করতে লাগল প্রজাপতিটাকে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে কখন হাওয়ায় ভেসে গেল চিত্রিত পতঙ্গটি। এবার খোঁজার পালা সুভদ্রার। ফুলের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে, লতাপাতায় কাঁপন জাগিয়ে ও খুঁজে চলল। চঞ্চল কিশোরী হয়ে গেছে আজ সুভদ্রা। গাড়োয়ালের কোন্ পাহাড়ঘেরা গাঁয়ে কতদিন আগে তার জন্ম হয়েছিল, সঙ্গীদের নিয়ে শৈশবের কত খেলা খেলেছিল, মা বাবার মৃত্যুর পর কেমন করে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করল, সবই আজ ভুলে গেল সুভদ্রা ভার্গব। একটি পরিপূর্ণ সুখী মন আজ সঞ্চরণ করতে লাগল ফুলে ফুলে, লতায় পাতায়। সে স্নান করল প্রথম প্রভাতের আলোর ধারায়। যেন আজ কোথা দিয়ে তার জন্মান্তর ঘটল। সত্যি খুশির পরীগুলো যেন আজ তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই বাগানটুকুর ভেতর। সুভদ্রা আঁচল ঘুরিয়ে গুনগুনিয়ে গান করতে লাগল।

একসময় সে বসল একটি গোলাকৃতি শিলাখণ্ডের ওপর। নীল ও সাদায় মেশা মসৃণ শিলা। সে ভাবতে লাগল। কত অস্পষ্ট স্বপ্ন হিমেল মেঘের মত তার চারদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। এতদিন জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যাকিছু সে ভাববার সুযোগ পায়নি, আজ এই অবসরে তারা সব যেন তাদের

পুরো পাওনা চুকিয়ে নেবার জন্য সুভদ্রার কাছে ভিড় করে এলো। প্রজাপতিটা ফিরে এসেছে। এবার একা নয়, সঙ্গী নিয়ে এসেছে আর একটি। সুভদ্রা সব ভুলে নিবিষ্ট হয়ে তাদের দেখতে লাগল। ফুলে ফুলে দুলে দুলে সে কি নাচ! একসময় সুভদ্রার সামনে এসে হাজির হল নর্তক নর্তকী। সুভদ্রাকে ঘিরে শুরু হল তাদের নাচ। যেন কতকগুলো এলোমেলো ভাবনা মনের আকাশে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা কখন চলে গেছে, আর সুভদ্রা পানের পাতার মত দুটি হাত মুখে ঢেকে কাঁদছে, অঝোরে কাঁদছে। কেন এ কান্না। কি হল আজ সুভদ্রার। নিটোল দীঘির নিস্তরঙ্গ জলে কিসের ঢেউ জাগল!

চমকে উঠল সুভদ্রা, মাথায় কিসের ছোঁয়া পেয়ে। ফিরে তাকাতেই চোখাচুখি হল যার সঙ্গে সুভদ্রা স্বপ্নেও ভাবেনি এখানে তাকে দেখতে পাবে এমন অবস্থায়। কুমার অভিরাম দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। মুখে এক অদ্ভুত হাসি, কিন্তু কাঁপছিল তাঁর সারা শরীর। দুর্বল পায়ের ওপর দেহের ভার যেন আর রাখা যাচ্ছিল না।

কেন, কেন এসেছেন এখানে!—প্রায় কান্নার সুরে অভিরামকে জড়িয়ে ধরল সুভদ্রা। তারপর নার্স যেমন করে অসুস্থ অপটু রোগীকে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে চালনা করে, ঠিক তেমনি সুভদ্রা ভার্গব নিয়ে গেল কুমারসাহেবকে তাঁর বিছানায়।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমলে অভিরাম যখন সুস্থ বোধ করলেন, তখন সুভদ্রা বলল, এই সামান্য মেয়েটির রুটি রোজগারের পথটা বন্ধ না করলে কি চলছিল না কুমারবাহাদুর। আজ যদি কিছু একটা ঘটে যেত, তাহলে কি কৈফিয়ত দিতাম আমি ডাক্তার গর্গের কাছে। আর তাছাড়া—। একটু থামল সুভদ্রা।—তাছাড়া লক্ষ্মীবাই রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যান। নানারকম মিঠে কড়া নির্দেশও দিয়ে যান। তিনি ঘটনাটা জানতে পারলে আমাকে কি আর একদণ্ড চাকরিতে বহাল রাখবেন।

কুমার অভিরাম বুঝলেন, লক্ষ্মীবাই এই সুন্দরী লাবণ্যময়ী নার্সটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে ভোলেনি।

প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় একবার করে কুমারবাহাদুরের কাছে আসত লক্ষ্মীবাই। অন্য সময় কারো আসা বারণ ছিল ডাক্তারের।

লক্ষ্মীবাই এসে খোঁজখবর নিত। কথায় কথায় সুজন সিংএর প্রশংসা করত। তারপর কোনদিন কুমারবাহাদুরের ইচ্ছা হলে রাজস্থান কাহিনী অথবা কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘের কথা পড়ে শোনাত।

মাঝে মাঝে অবশ্য থামতে হত তাকে। নার্স সুভদ্রা কোন কারণে ঘরে ঢুকলেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে তার মুখের গভীরে যদি কোন লুকোনো ভাবভাবনা থাকে তা দেখে নেবার চেষ্টা করত সে।

লক্ষ্মীবাইএর ওপর এজন্য মনে মনে কিছুটা অসন্তোষ জমা হলেও মুখে তার আভাসমাত্র প্রকাশ করলেন না অভিরাম। সাংঘাতিক আঘাতে আহত হয়ে যখন কুমারবাহাদুর জ্ঞান হারিয়েছিলেন তখন নাকি ঐ ভয়াল জন্তুটাকে গুলি

করে মেরেছিল অব্যর্থ শিকারী লক্ষ্মীবাই। জ্ঞান ফেরার পর একদিন সুজন সিংএর মুখ থেকেই তিনি শুনেছিলেন এই কথা। তাই লক্ষ্মীবাইএর ক্ষুদ্র তুচ্ছ ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যেতেন কুমারবাহাদুর এক প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতাবোধে।

এদিকে কুমারের চোখে নার্স সুভদ্রা ভার্গব এনে দিয়েছে অন্য এক জগতের আলো। সে জগৎ কোলাহলের বাইরে হাতছানি দেয় নির্জন বিশ্রামের। লক্ষ্মীবাই নদীপ্রবাহ, আর সুভদ্রা তার মাঝে প্রসারিত চর। শ্রান্ত অভিরাম মনে মনে খরস্রোতা জলধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে চরের বুকে একটি শান্ত আশ্রয় গড়ে নিতে চাইলেন। সুভদ্রা এদিক থেকে তাঁর কাছে অনেক বেশী কাম্য বলে মনে হল।

সুভদ্রা যখন লক্ষ্মীবাইএর নাম উল্লেখ করে বলল যে আজ ভোরবেলাকার ঘটনাটা জানতে পারলে লক্ষ্মীবাই তাকে চাকরিতে বহাল রাখবে কিনা সন্দেহ, তখন কুমার অভিরাম ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, সুভদ্রা ভার্গব চাকরি চলে যাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে অন্ততঃ এ বিশ্বাসটুকু আর যে করুক অভিরাম করবে না। আর তাছাড়া চাকরি দেখার ক্ষমতা যেমন লক্ষ্মীবাইএর হাতে কেউ তুলে দেয়নি, তেমনি চাকরি কেড়ে নেবার অধিকারও দেওয়া হয়নি তাকে।

সুভদ্রা এ তর্কের ভেতর যেতে চাইল না এই মুহূর্তে। কুমারবাহাদুরের কথাগুলো তার মনে কেমন এক অশ্রুত ঝংকার তুলল।

সুভদ্রা প্রসঙ্গটিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে প্রথমে মুখে আঙুল দিল, তারপর সকৌতুকে বলল, এখন আপনার কথা বলা সম্পূর্ণ বারণ। আপনি যেহেতু খুবই অন্যায় করেছেন, সেজন্যে আপনাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

কি শাস্তি দেবে সুভদ্রা ?

লক্ষ্মীবাই ছাড়া আর সবার কাছে চুপ করে থাকার শাস্তি।

শাস্তিটা বড়ই গুরুতর হল, হেসে বললেন কুমারবাহাদুর, আর একটু লঘু করে দাও।

কি রকম লঘু ?

লক্ষ্মীবাইএর কাছে মুখটা না খুলে আর সবার কাছে খোলার আদেশ হোক।

এ আপনার শাস্তি এড়িয়ে যাবার ছল কুমারবাহাদুর। আর তাছাড়া সেই সারাদিনের ভেতর মাত্র একটিবার লক্ষ্মীবাই আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। তাঁকে এভাবে বঞ্চিত করতে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত।

মনে হচ্ছে এজন্যে তুমি বেশী কষ্ট পাচ্ছ ?

গম্ভীর হল সুভদ্রা। বলল, খুবই স্বাভাবিক। ভুলে যাবেন না কুমার-বাহাদুর, লক্ষ্মীবাইএর মত আমিও মেয়ে। সুতরাং মেয়েদের ব্যথা কোথায় বাজে তা আমার অজানা নয়।

অপরাহ্নে কথা হচ্ছিল। কুমারবাহাদুর বললেন, একটা কথার সঠিক উত্তর দেবে ?

সুভদ্রা দুটি চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরল।

আগে বল দেবে, তাহলে কথাটা বলব।

সুভদ্রা এবার মাথা নেড়ে তার নীরব সম্মতি জানাল।

এবার কুমারবাহাদুর বললেন, আচ্ছা, সকলেই একথা জানে যে মেয়েদের ওপর মেয়েদের ঈর্ষাটাই বেশী, তাহলে লক্ষ্মীবাইএর জন্যে সকালে এমন করে তুমি ওকালতি করলে কেন?

কুমারবাহাদুর এই প্রশ্নটি তুলে তাঁর ওপর সুভদ্রার আকর্ষণের নিবিড়তাটুকু পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন।

সুভদ্রা সম্পূর্ণ উলটো জবাব দিয়ে বসল: দু'জনের স্বার্থ যদি একই জায়গাতে থাকে তাহলেই ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা। লক্ষ্মীবাইএর ওপর আমার ঈর্ষার কি কারণ থাকতে পারে বলুন?

কুমার অভিরাম নার্স ভার্গবের কথায় উৎসাহের কিছু দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। সুভদ্রা কুমারবাহাদুরের মনের সংঘাতের ছবিটুকু আঁচ করে নিয়ে বলল, আপনি খুবই দুষ্টুমি করছেন কুমারবাহাদুর। ফলের রসটুকু খাবার সময় ইচ্ছে করেই আপনি পার করে দিচ্ছেন। নাঃ, আমাকে দেখছি আপনি আর নার্সের চাকরিতে বহাল রাখতে চান না।

কুমার অভিরাম হঠাৎ এক কান্ড করে বসলেন। সুভদ্রার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বললেন, চাই না তো। নার্সের কাজ তোমায় মানায় না।

সুভদ্রার বুকে আজ কিসের ধ্বনি জাগল। সে বাম হাতখানা টেনে নিল না। ডান হাত দিয়ে টিপয়ের ওপরে রাখা ফলের রসের কাপটা টেনে এনে কুমারবাহাদুরের মুখের কাছে তুলে ধরল। কোন কথাই কিন্তু বলতে পারল না সুভদ্রা।

ফলের রসের লোভটুকুর চেয়ে সুভদ্রার হাতখানা ধরে রাখার লোভ তখন প্রবল হয়ে উঠেছে কুমার অভিরামের কাছে। তাই হাত ছেড়ে কাপটা তুলে নিতে পারলেন না তিনি।

নার্স সুভদ্রাই ধীরে ধীরে এবার তার হাতখানা টেনে নিল। তারপর চামচেতে ফলের রসটুকু খাওয়াতে গিয়ে বলল, ক'দিন ধরেই তো হেঁটে চলে বেড়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এখন ডাক্তার গর্গ এসে যদি দেখেন, আপনাকে এখনও ফলের রসটুকু খাইয়ে দিতে হচ্ছে, তাহলে আপনার বিছানা ছাড়ার অর্ডার রদ হয়ে যাবে যে!

যদি বলি আমি তাই চাই। বিছানা ছাড়তে গেলে যদি আর একজনকে ছাড়তে হয়, তাহলে নাই বা ছাড়লাম বিছানা।

কথা শুনে এবার হেসে উঠল সুভদ্রা। বলল, ছেলেমানুষি করবেন না কুমারবাহাদুর। পুরুষ শক্ত পায়ে দাঁড়ালে তবেই তাকে মানায় ভাল।

ইতিমধ্যে কুমারমহলের কক্ষান্তরে আর একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল।

সুজন সিং ধরে রাখতে পারছিল না লক্ষ্মীবাইকে। আজ নির্দিষ্ট সময়ের

একটু আগে ভাই বোন কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এসে আড়াল থেকে যে দৃশ্য দেখেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

লক্ষ্মীবাই এই মুহূর্তেই একটা ফয়সালা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। নার্সটার চুলের মুঠি ধরে সে পথে বের করে দিয়ে আসতে চায়। তার পরের বোঝাপড়া চলবে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে। কিন্তু সুজন সিং তাকে চুপিচুপি বোঝাচ্ছিল, অভিরাম যেহেতু এখন নার্সটার প্রেমে ডুবে আছে, সেহেতু এই মুহূর্তে আঘাত করতে গেলেই হিতে বিপরীত হবে। তখন এতদিনের সাজান ভাই বোনের স্বপ্নের প্রাসাদ মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। তার চেয়ে সুকৌশলে লাঠিকে অক্ষত রেখে কালনাগিনীর পাঁজর ভেঙে দেবার সুযোগ খুঁজে দেখা দরকার।

ভাইএর কথায় উত্তেজনা কিছুটা দূর হলেও চোখের জলের বান ডাকল লক্ষ্মীবাইএর। এ আরও বিপদ। এখুনি কুমারবাহাদুরের কাছে গেলে লক্ষ্মীবাইএর ভাবান্তরটুকু ধরা পড়ে যাবে। সুজন সিং বলল, তোমারই পথ করে দেবার জন্যে আমি হরিণের ললাট লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছি। বাইসনকে গুলি করে কুমারবাহাদুরকে রক্ষা করার কৃতিত্ব নিজে না নিয়ে তোমার ওপরই দিয়েছি। তুমি ভাল করেই এসব জান, তবু সামান্য উত্তেজনার বশে সারা জীবনের সম্ভাবনাকে এমনি করে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছ কেন? জীবনে তুমি সুখী হও, আমি তোমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হই, আমাদের লক্ষ্য তাই নয় কি?

কিছু পরিমাণে শান্ত হল লক্ষ্মীবাই। কিন্তু দপদপ করে জ্বলতে লাগল মনের আগুন। সুজন সিং লক্ষ্মীবাইকে সঙ্গে নিয়ে এবার ঢুকল কুমারবাহাদুরের ঘরে।

ঢুকতে ঢুকতেই সুজন সিং বলে উঠল, দেখ, দেখ লক্ষ্মীবাই, আজ একেবারে মেঘমুক্ত। কুমারবাহাদুরকে দেখে এখন কে না বলবে যে, শখ করে অবেলায় উনি শুয়ে রয়েছেন। রোগের কোন চিহ্নই তোমার চোখে মুখে আজ দেখা যাচ্ছে না অভিরাম।

একটু থেমেই সুভদ্রার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, হাঁ, সিস্টার সুভদ্রার সেবাই তোমাকে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলেছে। লক্ষ্মীবাই তো সুভদ্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি বলি, লক্ষ্মীবাই সেদিন বাইসনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে অভিরামের প্রাণ, আর জল হাওয়ায় তাকে সজীব করে তুলেছে সিস্টার সুভদ্রা।

এবার লক্ষ্মীবাইএর দিকে ফিরে সহাস্যে বলল, কুমার তার প্রাণের জন্যে তোমাকে ষোল আনা প্রাপ্য দিতে রাজী থাকলেও, অন্তত চার আনা কৃতিত্ব সিস্টার সুভদ্রাকে তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

হাসল সকলে। সুভদ্রা কী যেন কাজ করছিল মাথা নীচু করে। এবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে বিনীত হাসির আভাস। বলল, কি বলছেন আপনি, কার সঙ্গে কার ভাগের হিসেব?

তারপর লক্ষ্মীবাইএর দিকে চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, উনি দিয়েছেন প্রাণ, প্রাণদানের সঙ্গে আর কোন দানের কি তুলনা চলে? সত্যি, সেদিন

আপনি না থাকলে কি সর্বনাশটাই না ঘটে যেত।

এবার বেলাশেষের আলোর মত একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল সিস্টার সুভদ্রার মুখে। বলল, নিঃস্বার্থভাবে আমরা সেবা করতে পারি কই বলুন। রুটি রোজগারের বিনিময়ে আমাদের কাজ করে যেতে হয়। আমাকে আপনারা অনুগ্রহ করে এখানে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন, অন্য কোন নার্সকে ডাক দিলে সে এমনি করেই তার কর্তব্য করে যেত। সুতরাং নার্সদের বেশী আর কম পাওনার কথাই ওঠে না।

সুজন সিং আড়চোখে তাকিয়ে ছিল কুমার অভিরামের মুখের দিকে। তার কথা, আর ঠিক তার পরেই নার্স সুভদ্রার কথা কি প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন আঁকে কুমারবাহাদুরের চোখে মুখে, তাই দেখতেই সে ছিল ব্যস্ত।

কিন্তু কুমারের ললাটে নতুন পাঠ পড়ার সুযোগ সে পেল না, কারণ পাহাড়ী সন্ধ্যার মেঘ ততক্ষণে কুমারমহলে তার গভীর কালো ছায়া ফেলেছে।

আলো জ্বালতে যাচ্ছিল লক্ষ্মীবাই। কুমারবাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন, বোস লক্ষ্মীবাই। আজ আর বইএর পাঠ ভাল লাগছে না। বরং এলোমেলো কিছু গল্পগুজব করা যাক।

লক্ষ্মীবাইএর মুখ গম্ভীর হল, কিন্তু আলোকহীন ঘরে এবারও মুখের ছায়া কেউ দেখতে পেল না। বাইরে সহসা আকাশ ঘনিয়ে বৃষ্টি নামল। ঘন অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

কুমারবাহাদুর বললেন, একটা অন্ধকার ঘরের ভেতর কয়েকটা মানুষ এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন সহজে তাদের চিনে খুঁজে নেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি মনের ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলে কোনকিছু ভাল করে বুঝে ওঠা যায় না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। তার মনের ভাব কি তবে টের পেয়েছেন কুমার অভিরাম। কোন উত্তর না দিয়ে বসে রইল সে।

কুমার বলে চললেন, মাটিতে বীজ পড়ে বিনা যত্নে যে গাছ বেড়ে ওঠে তার অধিকাংশই হয় আগাছা। ভাল গাছ পেতে হলে যত্ন করতে হয়। উপযুক্ত সেবা না পেলে গাছ বাঁচবে কি করে। তাই সেবা যে করে এক অর্থে সে প্রাণ দেয়।

কথাটা যদিও উপমার আবরণ দিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন কুমারবাহাদুর, তবু বুঝতে কারো বাকী রইল না কথার আসল লক্ষ্য কে বা কারা।

লক্ষ্মী তীরবিদ্ধ আহত পারাবত। পরোক্ষে কুমার অভিরাম প্রশংসা করছেন, প্রাণদাত্রী বলে বলতে চাইছেন নার্স সুভদ্রাকে। যে সেবা করে সে-ই বাঁচিয়ে রাখে। এরপর মনের ভাব প্রকাশের আর বাকী রইল কি।

নার্স সুভদ্রা ভার্গব বিব্রত ও ব্যথিত। সে বুঝতে পারছে লক্ষ্মীবাইএর ব্যথা। অন্ধকারেও যেন মুক্তোর বিন্দুর মত উজ্জ্বল হয়ে লক্ষ্মীবাইএর চোখের পাতায় ফুটে উঠতে দেখছে সে দুটি অশ্রুধারা।

সুজন সিংএর মুখের ভাব কঠিন। বুঝি সামনের পাহাড়ের চেয়েও কঠিন-ভাবে সে লুকিয়ে রাখতে পারে তার ভাবভাবনা।

এরপর সুভদ্রাই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

আমাকে এখন কিছু সময়ের জন্যে ছুটি দেবেন কি কুমারবাহাদুর? একটু বাজারে যাবার দরকার ছিল।

লক্ষ্মীবাই বলল, নিশ্চয়ই যাবে, দরকার হলে যেতে হবে বইকি।

অমনি সুজন সিং বলে উঠল, কোন্ বাজারে যাবে?

লাইব্রেরী বাজার, উত্তর করল সুভদ্রা।

তাহলে ত ভালই হল, আমার আজ ওখানে স্কেটিংএ যাবার কথা। তোমাকে একটা লিফট্ দিতে পারি।

সারা মন প্রতিবাদ করে উঠলেও মুখ ফুটে সুভদ্রা তা উচ্চারণ করতে পারল না।

কুমারবাহাদুর বললেন, যদিও বৃষ্টি থেমেছে তবু মেঘ কেটে যায়নি। সুজনের গাড়িতেই তুমি চলে যাও তাড়াতাড়ি।

ওরা চলে গেলে ঘরে রইল দুজন। অভিরাম লক্ষ্মীবাঈএর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যাবার সময় সুভদ্রা আলো জ্বেলে দিয়েছিল।

লক্ষ্মীবাই নীরবে নতমুখে বসে ছিল। তার মনের ভেতর বাইরের প্রকৃতির ঝড় যেন ভেঙে পড়ছিল।

কি, চুপ করে বসে রইলে যে, আজ কিছু পড়বে না?

তেমনি মুখ না তুলেই লক্ষ্মীবাই মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, পড়তে তার ইচ্ছে নেই আজ।

কেন, কি হল তোমার লক্ষ্মীবাই, পড়তে ত তুমি ভালই বাস!

লক্ষ্মীবাই মুখ তুলল। মুখে তার মৃদু হাসি। বলল, কুমারবাহাদুর, আমাদের রাজস্থান কাহিনীর পদ্মিনী জহরব্রত করে সেদিন জীবনলীলা শেষ করেছেন। এর পর পাঠ কি করে সম্ভব বলুন?

কুমার লক্ষ্মীবাইএর কথায় মনে মনে দুঃখ পেলেন। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল লক্ষ্মীবাই তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছে। সঙ্গ দিয়ে, সেবা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে তাঁর মন। আজ সত্যি অকারণেই তিনি দুঃখ দিয়েছেন লক্ষ্মীবাইকে।

উঠে বসলেন কুমারবাহাদুর। বললেন, আলোটা নিভিয়ে দেবে কি লক্ষ্মীবাই?

লক্ষ্মীবাই সন্ধানী দৃষ্টি মেলে একবার তাকাল কুমার অভিরামের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

এখন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনি কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর কুমারবাহাদুর বললেন, কোথায় তুমি লক্ষ্মীবাই?

একটা তরল হাসির ঝংকার উঠল ঃ অন্ধকার ঘরে চেনা মানুষকে কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কুমারবাহাদুর।

নিজের কথার প্রতিধ্বনি কুমার শুনতে পেলেন লক্ষ্মীবাইএর মুখে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শব্দ লক্ষ্য করে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীবাইকে

স্পর্শ করে বললেন কুমারবাহাদুর, কিন্তু আমি তো খুঁজে পেলাম।

হাসির তরঙ্গ থেমে গেছে। লক্ষ্মীবাই কুমারের বুকে মুখ গুঁজে কান্নার বন্যায় ভেঙে পড়ল।

তোমার খুব টাকার দরকার, তাই না সুভদ্রা?

সুভদ্রা সুজন সিংএর দিকে না তাকিয়েই হেসে বলল, গাছপালা পশুপাখি ছাড়া টাকার দরকার বোধ করে না এমন কে আছে বলুন।

সুজন সিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, খুবই বুদ্ধিমতী তুমি সুভদ্রা, আর পাঁচজন নার্সের সঙ্গে এইখানেই তোমার তফাৎ।

আমাকে অকারণে বাড়িয়ে দেখবেন না। নিজেকে আমি অতি সাধারণ হয়ত ভাবতে পারি না, কিন্তু তা বলে অসাধারণ ভাবব এমন বোকা আমি নই।

সুজন সিং কথার মোড় ফেরাল: আচ্ছা, মানুষের সেবা করতে গেলে মানুষের মন আর মেজাজের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করতে হয়, তাই না?

এ প্রশ্নের সহজ একটা জবাব দিতে পারত সুভদ্রা। কিন্তু তার মনে হল, সুজন সিং যেন প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু জানতে চায়। কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার এই দীর্ঘ সাহচর্য সুজন সিংএর মনে কি কোন সন্দেহের ছায়া ফেলল।

সুভদ্রা হেসে বলল, ঘুড়ি যারা ওড়ায় সুতোর সঙ্গে হাতের কারবার করতে হয় তাদের ঠিক, কিন্তু চোখ তাদের সারাক্ষণ থাকে ঘুড়ির ওপরই। সেবা আমরা করি নিয়মমাফিক, কিন্তু চোখ রাখতে হয় রোগীর মেজাজ মর্জির ওপর।

সুজন সিংএর বুদ্ধির আয়নায় সুভদ্রার মতিগতির স্পষ্ট ছবি ফুটল না।

তুমি বেড়াতে ভালবাস? সুজন সিংএর প্রশ্ন।

বেড়াতে কে না ভালবাসে বলুন। তবে নার্সদের বেড়ানোর সুযোগ বড় কম।

একটা প্রস্তাব রাখব তোমার কাছে?

সুভদ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুজন সিংএর দিকে।

কাল সন্ধ্যের আগে কোম্পানিবাগের দিকে বেড়াতে আসবে?

সুভদ্রা কি যেন একটু ভেবে নিল, তারপর বলল, আসতে পারি। তবে সন্ধ্যে সাতটার ভেতরেই আমাকে ফিরতে হবে কুমারমহলে। ডাক্তার গর্গ আসবেন ঐ সময়।

সুজন সিং বলল, এতদিন তো রইলে এ অঞ্চলে, কিন্তু কাল এমন একটা জায়গা দেখাব যা আগে কখনো দেখেছ বলে হয়তো বলতে পারবে না।

সুভদ্রা বলল, এখন থেকেই সেজন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

হাসল দুজনে। গাড়ি ততক্ষণে লাইব্রেরী বাজারে এসে গেছে। নেমে গেল সুভদ্রা। যতক্ষণ না বাজারের ওপরে উঠে গেল সে ততক্ষণ তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল সুজন সিং।

না, কোনরকমেই সুভদ্রা এড়িয়ে চলবে না সুজন সিংকে। সে এখুনি ইচ্ছে করলে আঘাত করতে পারে ঐ মানুষটাকে, কিন্তু তাতে সুভদ্রার জীবনে ঐ সাংঘাতিক লোকটি চিরদিনের একটা শনিগ্রহ হয়ে রইবে। তার চেয়ে সহজ বন্ধুত্বের দু'চারটি বাণী-বিনিময় ভাল। এতে আক্রোশ অথবা ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

পরদিন কুমারমহল থেকে একসঙ্গে বেরোতে দেখা গেল না সুজন সিং আর সুভদ্রাকে।

সুভদ্রা দিনের কাজ শেষ করল। আজ সারাটা দিন সে কুমারবাহাদুরকে কেমন যেন গম্ভীর আর আনমনা দেখল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনের দু'একটা কথাই শুধু হচ্ছিল।

আজ সুভদ্রা তাই মুখ বুজে নীরবে কাজ করে গেল। মনে মনে সে ভাবল, রাজা মহারাজাদের কখনোসখনো খেয়াল হয় সাধারণ মানুষকে নিয়ে দু'দণ্ড খেলা করতে। সুভদ্রা আজ নিজেকে তার চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারল না। তার মন কেমন যেন এক ভারহীন শূন্যতা বোধ করল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল এই ভেবে যে, তার দিক থেকে এমন কোন দুর্বলতা সে প্রকাশ করেনি যা তার মনকে গ্লানিতে ভরে দেবে।

আজ অপরাহ্নের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে উঠেছিল। মেঘগুলো হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মত আকাশ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিল।

ইচ্ছা করেই আজ উত্তরের জানালাটা খুলে দিল সুভদ্রা। দূরে পাহাড়ী রাজ্যের ওপারে তুষার-সাম্রাজ্য। এ যেন আর এক জগৎ, অন্য কোন রূপ-লোকের আভাস। কুমার অভিরাম আজ উঠে বসার জন্য সুভদ্রাকে কিছু বললেন না। তিনি শুয়ে শুয়েই পাহাড়, বন আর তুষারের শোভা দেখতে লাগলেন।

আজ অনেক আগেই এসে গেল লক্ষ্মীবাই। ইন্দ্রাণীর মত ঘরে এসে ঢুকল। হাতে একখানা বই। চেয়ারখানা টেনে নিয়ে সে বসল একেবারে কুমারবাহাদুরের শিয়রে।

আজ শত চেষ্টায় রোজকার কাজগুলোকে যেন সেরে তুলতে পারছিল না সুভদ্রা। এই পরিবেশ থেকে এই মুহূর্তেই সে যেন বেরিয়ে যেতে চাইছিল। কাজ শেষ হলে সুভদ্রা বিনীতভাবে বলল, ডাক্তার গর্গের আসতে এখনও অনেক দেরি। আমি কি এই সময়টুকু বাইরে যেতে পারি?

গত দিনের মত আজ আর লক্ষ্মীবাই কিছু বলল না। কুমার অভিরাম কি যেন ভেবে নিলেন, তারপর বললেন, সারাদিন এক ঘরে একজন অসুস্থ মানুষের কাছে থাকলে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিছুটা বাইরের আলো-বাতাস তোমার চাই বইকি সুভদ্রা।

চলে যাচ্ছিল সুভদ্রা, পেছন থেকে ডাক দিয়ে কুমারবাহাদুর বললেন,

ডাক্তার গর্গের আসার আগেই চলে এসো কিন্তু।

সুভদ্রা ফিরে না তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়ল লক্ষ্মীবাইঃ এতটুকু শিষ্টাচার জানে না। সাধারণ, অতি সাধারণ। আপনার কথার জবাবটুকু ফিরে দাঁড়িয়ে দেবার প্রয়োজনও বোধ করল না।

লক্ষ্মীবাইএর কথায় কুমার অভিরামের চোখে মুখে কোনরকম বিরক্তি বা উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল না। অভিরাম সোৎসাহে বললেন, সেই মরুবধূর কাহিনী শোনাও যে তার দূর-প্রবাসী প্রিয়তমের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। সেই সালহ্‌কুমার আর মারবানীর বিরহগাথা।

লক্ষ্মীবাই পড়তে লাগলঃ পুষ্করতীর্থে তীর্থযাত্রায় এসেছিলেন রাজা নল। সঙ্গে ছিল শিশুপুত্র। দারুণ মন্বন্তরে সে বছর রাজস্থানের মরুকবলিত পশ্চিমপ্রান্ত কম্পিত হচ্ছে। পুগলের অধিপতি পিঙ্গল রায়ও তপ্ত বালু তাড়িত হয়ে এসেছেন শিশুকন্যা মারুকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্করের শান্তসলিলা হ্রদের তীরে।

তারপর পরিচয় হল দুই পরিবারে। সামাজিক প্রতিপত্তিতে মহারাজা নলের সঙ্গে মরুবাসী সামান্য ভূস্বামী পিঙ্গলের কোন তুলনাই চলে না। তবু প্রজাপতির লীলা। নলের শিশুকুমারের সঙ্গে পুগল-রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল। তারপর যে যার পুত্র কন্যা নিয়ে ফিরে গেলেন নিজ নিজ রাজ্যে। কথা রইল, বয়োবৃদ্ধিকালে বর-বধূ পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।

কিন্তু পুত্র সালহ্‌কুমার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল তখন প্রথম বিবাহের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে মহারাজ নল মালবপতির রূপবতী কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন।

অন্যদিকে পুগলের মরুদ্যানে ফুটে উঠছিল আশ্চর্য এক পুষ্প। যৌবনের প্রতিটি দল বিকশিত করে সে বসে ছিল সমর্পিত হবার আশায়। কিন্তু ভৃঙ্গ এলো না। আশাপথ চেয়ে তার দিন কাটে। কবে আসবে চতুর্দোলা মারবার নগরী থেকে। তাকে নিয়ে যাবে প্রিয়সমাগমে। কিন্তু নলের রাজ্য থেকে এলো না কোন বধূ-বরণের রথ, এলো না সামান্য কোন সংবাদ। শুধু পুগল-রাজকন্যার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত মরুর জ্বালা এসে মিশে যেতে লাগল।

ওদিকে প্রতিটি ঋতু পুষ্পের সৌরভ নিয়ে আসে সালহ্‌কুমার আর মালবকুমারীর নবপরিণীত জীবনে। প্রেমের সরোবরে হংস-হংসীর লীলায় ভেসে চলে তাদের বিবাহিত দিনগুলি।

শেষে একদিন গোপনসূত্রে খবর পান যুবরাজ সালহ্‌কুমার তাঁর মরুবাসিনী বধূ সম্বন্ধে। তখন শুরু হয় তাঁর যাত্রা। মরুভূমির ওপর দিয়ে বহু দুঃখ ভোগের পর তিনি মিলিত হন তাঁর প্রতীক্ষাকাতরা বধূ মারবানীর সঙ্গে।

কাহিনী শেষ করে থামল লক্ষ্মীবাই। কুমার চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। কুয়াশার একটা পাতলা আবরণ ততক্ষণে আধো ঘোমটায় রহস্যময়

করে তুলেছে পাহাড় আর দেওদারের বনশ্রেণী।

কুমারবাহাদুরের মনে হল সামান্য কোন এক পর্বতকন্যা হয়তো মনে মনে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। নিজের মুখ ফুটে মনের কথাটুকু জানাবার ক্ষমতা তার নেই। শুধু সারাদিনের সংসারকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার মন প্রিয়-মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে।

অভিরাম ভাবতে থাকেন, তিনি কি কাউকে বঞ্চিত করেছেন। সহসা একটা মুখ কুয়াশার ঘোমটার ভেতর থেকে আধফোটা পদ্মের মত ভেসে ওঠে। চমকে ওঠেন কুমারবাহাদুর। এ মুখ যে তাঁর বহুচেনা বলে মনে হচ্ছে। সুভদ্রা, হাঁ সুভদ্রার মুখখানাই তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

কি ভাবছেন কুমারবাহাদুর? ডাক দিল লক্ষ্মীবাই।

সংবিৎ ফিরে এলো অভিরামের। মৃদু হেসে বললেন, ও কিছু নয় লক্ষ্মী, একটা আধভোলা স্বপ্ন।

লক্ষ্মীবাই ঘর থেকে উঠে গেল বাগানে। এক গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে এসে কুমার অভিরামের হাতে দিয়ে বলল, আজ ভারী ভাল লাগছে আপনার হাতে এই গোলাপগুচ্ছ তুলে দিতে।

কুমার বললেন, বড় ভয় পাই লক্ষ্মীবাই কারো হাত থেকে কোনকিছু নিতে। কিছু পেলেই তাকে রাখতে হয় তার যথাস্থানে। কিন্তু এত পেয়েছি জীবনে, বুঝি এখন আর আমার রাখার ঠাঁই সংকুলানই হয় না। তবু কারো ভালবাসার দান অনাদরে ফিরিয়ে দিতে পারি কই।

লক্ষ্মীবাই কুমারবাহাদুরের এই কথায় যেমন ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্বাস কিছু পেল না, তেমনি একেবারে আশা ছেড়ে দেবার মতও কোনকিছু দেখতে পেল না।

প্রেমের এক গোলকধাঁধার ভেতর লক্ষ্মীবাই ক্রমাগত ঘুরতে লাগল। এ যেন মেঘবাহন বর্ষাঋতু। রোদের ছোঁয়া সারা অঙ্গে লাগতে না লাগতেই বাদলছায়া ঘনিয়ে এলো।

লাইব্রেরী বাজার থেকে পথটা কোম্পানিবাগের দিকে বরাবর চড়াইতে উঠে গিয়েছে। চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। পাশেই একটি কনভেণ্ট স্কুল। রোববার বন্ধের দিন। এই কনভেণ্ট স্কুলের পর থেকেই উতরাই শুরু। স্কুলের পাশে একটা পাইনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল সুজন সিং। তীক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সে তাকিয়ে ছিল লাইব্রেরী বাজার থেকে উঠে আসা পথটার দিকে। না, সুভদ্রা নির্দিষ্ট সময় পার হতে দিল না। যথাসময়েই তাকে দেখা গেল কনভেণ্টের দিকে উঠে আসতে। সুজন সিং গাছের আড়াল থেকে দেখছিল। দেখছিল সুঠাম এক রমণীদেহ। উন্নত, সম্ভ্রান্ত আর নির্বিকার। ভাবছিল সুজন সিং, অনেক নারীকে সে সঙ্গ দিয়েছে, পেয়েছেও বহু নারীর সঙ্গ, কিন্তু এ নারী যেন একটু স্বতন্ত্র; তাদের সঙ্গে এই সামান্য নার্সটির কোথায় যেন বেশ খানিকটা পার্থক্য থেকে গেছে। একে

জয় করা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন একে ত্যাগ করা।

কাছে এসে চারদিকে একবার তাকাল সুভদ্রা। চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে আসতে সে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তার মুখে ফুটে উঠেছিল কয়েকটি সুন্দর স্বেদবিন্দু। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সুজন সিং। কেমন এক বিস্ময়ের হাসি হেসে বলল, অপরাধ নিও না, আমি অবাক হয়ে তোমার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। ভগবানের যে কারো কারো ওপর পক্ষপাতিত্ব আছে তা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।

একটু থেমে বলল, ঐ যে তোমার মুখের স্বেদকণাগুলো, ঠিক যেন মুক্তোর দানার মত কেউ সাজিয়ে দিয়েছে বলে ভ্রম হয়।

মুখটা রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল সুভদ্রা।

সুজন সিং অমনি বলে উঠল, ভাল লাগার জিনিসকে এত সহজে মুছে ফেলতে চাইলেই কি মোছা যায়!

আবার হাসল সুভদ্রা। বলল, আপনার মত সুন্দর করে সবাই কি কথা বলতে পারে। তাই আপনার কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব বলুন।

সুজন সিংএর কথার জবাব সুভদ্রা এমনি করে এড়িয়ে গেল।

সুজন সিং এবার কুমারবাহাদুরের খবর নিতে গিয়ে বলল, তোমার রোগী কেমন আছে সুভদ্রা? সে আজ এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছেড়ে দিলে।

আমি তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়েই এসেছি। আর তাছাড়া আপনার বোন লক্ষ্মীবাইও এসে গিয়েছেন, তাই নিশ্চিন্তে আসতে পারলাম।

সুজন সিং এবার তীর ছুড়লঃ জান সুভদ্রা, আমার মনে হয় কুমার লক্ষ্মীবাইএর সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতেছে। কখনো দূরে সরিয়ে দেয়, আবার কখনো কাছে টানে। এ ওর এক খেয়ালের খেলা। আর এই জন্যেই আমার ভয়। অভিরাম এক জায়গায় কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

সুভদ্রা তাকিয়ে ছিল সুজন সিংএর দিকে। কিন্তু সে তলিয়ে গিয়েছিল তার মনের গভীরে। একটি মানুষ যেন পেছন থেকে এসে তাকে চমকে দিয়েই হেসে উঠল। তারপর কখন একটা হাতের কয়েকটা বলিষ্ঠ আঙুল তার হাতখানাকে মুঠো করে ধরল। সে ছাড়াবার চেষ্টা করল না! তার মনে হল, এমনি অনন্তকাল ধরে সে যদি বসে থাকতে পারত।

সুভদ্রা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সুজন সিংএর তীক্ষ্ন চোখে তা এড়াল না।

মাঝে মাঝে তোমার এই হঠাৎ হারিয়ে যাবার ভাবটা আমায় কিন্তু বেশ ভাল লাগে। কথা ক'টি বলে হাসতে লাগল সুজন সিং।

ক্ষমা করবেন। সত্যিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

নিজের আচরণে অপ্রস্তুত হল সুভদ্রা।

হেসে বলল সুজন সিং, রোগীর কাছে এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সে বেচারার দশাটা কি হবে ভেবে দেখেছ কি?

এবার হেসে উঠল দু'জনেই। হাসি থামলে সুভদ্রা বলল, হাঁ, কি যেন এক

অভিনব জিনিস আজ আপনি আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন না।

সুজন সিং কেমন যেন ভাবনার ভান করল, তারপর অনেক ভেবে যেন বলল, নাই বা গেলে সেখানে সুভদ্রা। একটি মানুষের ওপর শ্রদ্ধা ভালবাসা সবই হারাবে। না, না, সে আমি হতে দেব না। আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার আমন্ত্রণ।

রহস্যের গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে সুভদ্রা।

সে একটু অবাক হয়েই বলল, শ্রদ্ধা, ভালবাসা হারাব কার ওপর?

যে মানুষকে তুমি শ্রদ্ধা কর, ভালবাস, বলল সুজন সিং।

মনে মনে কি যেন চিন্তা করল সুভদ্রা, তারপর বলল, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তার ওপর থেকে ও দুটো জিনিস সহসা সরিয়ে নেওয়া যায় না বলেই আমার ধারণা।

অনেক সময় আমাদের অনেককিছু ধারণাই ভুল বলে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।

চুপ করে গেল সুভদ্রা। এরপর এই কথার সূত্র ধরে বেশীদূর এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলল সুজন সিং ঃ আচ্ছা, ওকথা থাক, অভিশাপ বস্তুটিতে বিশ্বাস আছে তোমার?

সহসা এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সুভদ্রা। একটু ভেবে বলল, এ বিষয়ে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

অভিজ্ঞতার কথা নয় সুভদ্রা, বিশ্বাসের কথা। তুমি কি এই শাপশাপান্তের ব্যাপার বিশ্বাস কর?

যা আমার জীবনে কোনদিন ঘটেনি তাকে হয় না বলে উড়িয়ে দেব এমন অবিশ্বাসী আমি নই।

আমি এতক্ষণ তোমার কাছ থেকে এইটুকু কথাই জানতে চাইছিলাম। তুমি অন্তত আর পাঁচজনের মত ঘোর অবিশ্বাসে সবকিছুকে উড়িয়ে দেবে না এ ধারণা আমার না হলে তোমাকে আমি সে জায়গায় কেমন করে নিয়ে যাই আর কেমন করেই বা সে কথা বলি।

এবার সুজন সিং পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে কিছু আগে অদৃশ্য হয়েছে। কয়েক খণ্ড লাল মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে।

তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আসতে পার আমার সঙ্গে।

এই মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতি সুভদ্রার যাওয়ার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করল, কিন্তু প্রবল একটা ইচ্ছাশক্তি সামনে টেনে নিয়ে চলল তাকে। শক্তি তার কৌতূহলী মনের অথবা সামনে যে মানুষটা চলেছে তার, সে কথা সুভদ্রা বুঝে উঠতে পারল না।

ওরা নামতে লাগল উতরাইএর পথে। এসব জায়গায় সূর্যাস্তের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। দীর্ঘ ঋজু পাইনের বন প্রায়ান্ধকারে সারি সারি

মানুষের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট গুল্ম আর ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে কত রকমের পতঙ্গ ডাকছিল। সন্ধ্যার দিকে জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। উত্তুরে হাওয়া। শনশন একটা আওয়াজ কানে আসছিল। মনে হচ্ছিল এই পাহাড়ী অরণ্যের গাছে গাছে কি যেন মন্ত্রণা চলেছে।

ওরা খুব সাবধানে নামছিল। একসময় সুজন সিং থেমে গিয়ে বলল, আমার হাত ধর সুভদ্রা, আবছা আলোয় এই সরু পথটুকু পার হতে তোমার অসুবিধে হবে।

কোন কথা না বলে সুভদ্রা সুজন সিংএর দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর প্রায় অন্ধের মত কি করে যে দুটি পাহাড়ের মাঝের সংকীর্ণ সংযোগ সেতুটি পেরিয়ে এলো তা সুভদ্রা ভাবতেও পারল না।

এপারের পাহাড়টায় এসে সুভদ্রার অবাক হওয়ার পালা। কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নেই। নির্জন নিস্তব্ধ বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাসাদ। কোথাও বিদ্যুতালোকের রেখামাত্র ছিল না। কিন্তু আকাশের চাঁদ ওপারের পাহাড়ের মাথায় ততক্ষণে উঠে এসেছে। কুয়াশায় ভেজা চাঁদের ম্লান আলোর ঐ নির্জন প্রাসাদ আশ্চর্য রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল।

এসো সুভদ্রা, সুজন সিংএর গলা শোনা গেল। সেই ছোট দুটি শব্দ নির্জন জায়গায় প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। সুভদ্রা সেই ডাকে প্রথমে চমকে থমকে দাঁড়াল। সে কান পেতে শুনতে পেল, ঐ প্রাসাদের বড় বড় থামের আড়াল থেকে কে যেন তার ঐ নামটা ধরে বার বার ফিরে ফিরে ডেকে চলেছে।

সুভদ্রাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে পিছু হটে এলো সুজন সিং।

ভয় পেলে বুঝি, এই তো আমি রয়েছি তোমার পাশে।

আত্মসম্মানে একটু ঘা লাগল সুভদ্রার। সে হাসিতে পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়ে বলল, না না, ভয় কিসের, কোথায় যাবেন চলুন।

ওরা বাঁধান রাস্তার ওপর দিয়ে প্রাসাদটার দিকে এগোতে লাগল। কাছে গিয়ে সুভদ্রা তাকিয়ে দেখল, গম্বুজওয়ালা বিরাট এক অট্টালিকা। যে পথটা ধরে সুভদ্রা উঠে আসছিল তার পাশে কয়েক গজ দূরে দূরে ছিল কতকগুলি আলোকস্তম্ভ। সেই স্তম্ভের সারি শেষ হয়েছিল প্রাসাদের ঠিক সামনেই। সুভদ্রার মনে হল কে যেন বিপুল এক ফুৎকারে সব কটা আলোকে নিভিয়ে দিয়েছে।

সুজন সিং বলল, চল সুভদ্রা আমরা আর এক ধাপ ওপরে উঠে গিয়ে বসি।

প্রাসাদের দক্ষিণপ্রান্তে তারা চলে এলো।

একটি সুন্দর ফারগাছ ঘিরে সিমেণ্টবাঁধান বেদী।

সুজন সিং সুভদ্রাকে তার ওপর বসতে ইঙ্গিত করে নিজে বসে পড়ল। সুভদ্রা খানিক দূরে বসে তাকিয়ে রইল আজকের রাতের নায়ক সুজন সিংএর দিকে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটি রাত। চাঁদের আলো কুয়াশার পাতলা,

মসলিনখানা ভেদ করে তার উজ্জ্বল আলো ক্রমে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ঝাউগাছের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাসাদখানা চাঁদের আলোয় কেমন এক বিস্ময়পুরী বলে মনে হতে লাগল।

সুজন সিং কোন ভণিতা না করেই বলল, এ প্রাসাদ অভিরামের পিতা রাজা সুরিন্দর সিংএর।

সুভদ্রা বলল, কুমারবাহাদুরের অন্য একটি প্রাসাদ কোথায় যেন আছে বলে লোকমুখে শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য আগে কোনদিন হয়নি।

সুজন সিং বলল, আচ্ছা সুভদ্রা, বলতে পার এই বিরাট প্রাসাদখানা এমন করে ফেলে রেখে অভিরাম কেন ঐ ছোট্ট ঘরখানার ভেতর তার ডেরা বেঁধেছে?

সুভদ্রা মাথা নেড়ে জানাল যে সে এসবের কিছুই জানে না।

এবার সুজন সিং বলল, এর পেছনে যদি কোন রহস্য থাকে তা জানতে তোমার কৌতূহল হচ্ছে না?

সুভদ্রা একটু নড়েচড়ে বসে গভীর জিজ্ঞাসায় চিহ্ন চোখে মুখে এঁকে সুজন সিংএর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাঁ, আজ আমি তোমাকে ছোট্ট একটি কাহিনী শোনাবার জন্যেই এখানে ডেকে এনেছি। তোমার মধ্যে আমি একটি নারীর যথার্থ রূপ দেখেছি। তাই তুমি সামান্য কোন বিবেচনার ভুলে দুঃখ পাও, এ আমি চাই না।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল সুজন সিং। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল তার কাহিনী।

শোন তাহলে। আগেকার দিনে এমন বহু ধনী ছিল যারা লুঠতরাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা এ কাজকে অসম্মানের বলে মনে করত না। আর তাছাড়া ঐ লুঠের অর্থেই তাদের বিষয়সম্পত্তি, সোনাদানা ফেঁপে উঠত।

মাধো সিং ছিল এমনি এক লুঠেরা। তার তলোয়ারের ধার ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, তোশাখানায় হীরে জহরতের ভার ছিল তেমনি বিপুল।

মাধো সিংএর কালো ঘোড়া যে পথ দিয়ে যেত, সে পথের ধনী দরিদ্র সকলে পথে নেমে এসে মাধো সিংকে উপযাচক হয়ে নজরানা দিয়ে যেত।

মাধো সিংএর আর এক বিলাস ছিল মন্দির লুঠ করা। কারণ সোনাদানার প্রচুর সঞ্চয় থাকে এই মন্দিরগুলির মধ্যে। সে তার দুর্ধর্ষ কালো ঘোড়া আর তলোয়ারখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত তীর্থের পথে। যে জায়গা জনবিরল, সেখানে সে তার দলবল নিয়ে আস্তানা গাড়ত। তারপর সুযোগ বুঝে লুঠ করত তীর্থযাত্রীর সম্বল। কখনো বা পরিচিত তীর্থপথের বাইরে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত জায়গায় যে সব মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে গিয়ে মাধো সিং লুঠে নিয়ে আসত। কোন জায়গায় বিশেষ কিছু মিলত না, আবার কোথাও বিপুল পরিমাণ গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যেত।

এমনি এক মন্দির লুঠের সময় মাধো সিংকে মন্দিরের সেবায়েত বাধা দেবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে মাধো সিংএর তলোয়ারের ঘায়ে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মাধো সিং এরপর সেবায়েতের ঘরে ঢুকে পড়ে লুঠের আশায়।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে। সে ভুলে যায় ধনরত্ন লুঠের কথা। যে রত্ন তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জন্মজন্মান্তরেও এমন রত্ন মেলা ভার।

সেবায়েতের স্ত্রী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে ছিল। মাধো সিং তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। এমন রূপ, এমন দেহের গঠন এব আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ল না। অন্য সব রত্নের কথা ভুলে মাধো সিং সেদিন ঐ নারীরত্নটিকে তুলে নিয়ে এল নিজের প্রাসাদে।

কয়েকদিন একটি নির্জন ঘরে অবরোধের পর কিছু পরিমাণে সুস্থ হলে সেই সেবায়েতের স্ত্রী একদিন দেখল তার ঘরের ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে কে যেন একটি তীক্ষ্ম ছোরা ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল। তখনও অসহায় মেয়েটি বুঝতে পারেনি এই আকস্মিক ঘটনার তাৎপর্য কি। বুঝতে পারল সেইদিন রাত্রে। সামান্য নিদ্রা হয়ত বা এসেছিল তার, ঘর খোলার শব্দে চমকে জেগে উঠল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করে উঠল। একটা রক্তলোভী জানোয়ার ততক্ষণে লাফ দিয়ে তার সমস্ত প্রতিরোধকে ভেঙে দিয়েছে।

দয়া কর, আমি সন্তানের জননী হতে চলেছি।

শুধু এই আকুল আকুতিটুকু অন্ধকারে একবার কান্নাব মত ঝরে পড়ল।

কিন্তু উল্লাস তাতে কমল না বরং অন্ধকারে আরও বীভৎস আকার নিয়ে বেড়ে উঠল।

হঠাৎ সর্বহারা মেয়েটির বোধকরি মনে পড়ে গেল সকালে মেঝের ওপর এসে পড়া সেই ছোরাখানার কথা। সে ঐ ছোরাটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল মাধো সিংএর বুকে। অক্টোপাশের মত যে দুটো হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছিল মেয়েটিকে, মুহূর্তে তা একটা প্রাণফাটা চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুকের ওপর ফিরে এলো।

ঘরে ততক্ষণে আলোর রেখা এসে পড়েছে। মধো সিংএর স্ত্রী তার ন'বছরের শিশুপুত্রটিকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। সেবায়েতের স্ত্রী এবার এক অদ্ভুত হাসি হেসে হাতের ছোরাখানা বসিয়ে দিল নিজের বুকে।

মাধো সিং নিস্পন্দ পড়ে ছিল মেঝের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চারিদিক।

মেয়েটি একটু জল চাইল। মাধো সিংএর স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। শিশুপুত্রকে জলের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটির পাশে এসে বসল সে। স্বামীর দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।

মেয়েটি ঘোলাটে চোখ মেলে জড়িত স্বরে বলল, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; রোজ শুদ্ধ মনে দেবতার পুজো করেছি। আমি আজ মৃত্যুকালে অভিসম্পাত দিচ্ছি, এ বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে সমাজের মানুষের কাছে এমনি হীন নিকৃষ্ট বলে পরিচিত হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাধো সিংএর শিশুপুত্র জল নিয়ে দৌড়ে এলো মেয়েটির কাছে। মাধো সিংএর স্ত্রী মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটির মাথা নিজের

কোলের ওপর তুলে নিয়ে তাকে ধীরে ধীরে জল পান করাল।

মেয়েটি একবার তাকাল মাধো সিংএর স্ত্রীর মুখের দিকে, তারপর চাইল ছেলেটির দিকে। বলল, আমি হয়তো বাঁচতে পারতাম, কিন্তু আমার কলঙ্কিত দেহের মধ্যে যে সন্তান রয়েছে তাকে নিয়ে আমি এ পৃথিবীতে মা হবার জন্য বেঁচে থাকতে পারব না।

একটু থেমে বলল, আমার অভিসম্পাত মিথ্যে হবে না, তবে মরার সময় বলে যাই, তুমিই আমাকে দিয়েছ এই ছোরা, আর তোমার এই ছেলে আমাকে দিয়েছে জল, একে আমার শাপ স্পর্শ করবে না। এক এক পুরুষ অন্তর ফলবে আমার অভিশাপ। তুমি পালাও, এ পাপের আস্তানা ছেড়ে চলে যাও অন্য কোথাও তোমার এ সন্তানকে নিয়ে। একই ঘরে পুরুষানুক্রমে থাকবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। যাও, পালাও, এখুনি পালাও।

সেদিন মাধো সিংএর স্ত্রী তার ন'বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রাসাদ ছেড়ে। পাঞ্জাবের অন্যত্র পত্তন করেছিল বাসগৃহ।

মাধো সিংএর সেই সন্তান যোগীন্দর সিং নাম নিয়ে জমিদারির পরিচালনা করত। তার ব্যবহার আর দান-ধ্যানে লোকে ভুলে গেল তার খুনে পিতার কথা। কিন্তু অভিসম্পাত ফলল ঠিক পরের পুরুষে। যোগীন্দর সিংএর ছেলে অমর সিংএর দেহের রক্তে আবার পিতামহের অসংযত উত্তেজনার জোয়ার বইল।

ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের ছলে বলে কৌশলে নিজের অন্তঃপুরে আনতে লাগল অমর সিং। শেষে কোন এক সুন্দরী জমিদারবধূকে লুঠ করে আনতে গিয়ে বাধা পেল তীব্রভাবে। এরপর সরকারী আদেশে পুলিস অমর সিংএর মধুচক্র বেষ্টন করল।

নিরুপায় অমর সিং সেই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক নারকীয় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করল। গুপ্তগৃহের মৃত্তিকার তলায় সেদিন জীবন্ত সমাধি লাভ করল অসহায় কতকগুলি নারী।

আদালতের বিচারে সেবার নিষ্কৃতি পেল অমর সিং, কিন্তু অদৃশ্য এক আদালতের বিচারে চরম শাস্তি নেমে এলো তার ওপর। নামের অমরত্ব অমর সিংকে রক্ষা করতে পারল না। অকালে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হল তার। মরণকালে নাকি বার বার তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল তোমরা আমাকে মাটি চাপা দিচ্ছ কেন, সরাও সরাও; ওঃ, দম যে বন্ধ হয়ে এলো; হাওয়া কই, একটু হাওয়া, একটু হাওয়া।

মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এসেছিল অমর সিংএর।

এর পরের পুরুষ অভিরামের পিতা রাজা সুরিন্দর সিং। পাঞ্জাবের আবাস ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন মুসৌরীতে। তোমার সামনের প্রাসাদ রাজা সুরিন্দর সিংএর কীর্তি। রানীর নামে এই প্রাসাদ উৎসর্গ করে তিনি নামকরণ করেছিলেন 'রানীমহল'। যদিও রাজা সুরিন্দর সিংএর এক ছাড়া দ্বিতীয় রানী ছিলেন না। মুসৌরীর এমন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে

রাজা সুরিন্দর সিংএর দানের হাত না পৌঁছেছে।

রাজা সুরিন্দরের মৃত্যু হয়েছে। রানীমাতা সবই জানতেন। তাই অভিরামের জন্য তিনি পৃথক্ করে 'কুমারমহল' তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই বৃহৎ প্রাসাদ 'রানীমহল' তাই আজ শূন্য পড়ে আছে।

বুঝতেই পার সুভদ্রা, পুত্র অভিরামের ভবিষ্যতের জন্য রানীমাতার মনে কোনদিনই শান্তি ছিল না। তাই তিনি তাঁর কল্যাণের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। এক সাধুর দর্শনও নাকি তিনি পেয়েছিলেন। সাধু তাঁকে নাকি বলেছিলেন, অভিশাপের স্খলন হয় বইকি। পবিত্রতার ভেতর দিয়েই তা সম্ভব। এই রাজবংশে যদি এমন কোন বধূ আসেন যিনি একমাত্র পুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের চিন্তা কখনো করেননি, তিনিই শুধু পারবেন এ বংশের দীর্ঘদিনের অভিশাপ মুছে ফেলতে।

রানীর মৃত্যু হয়েছে। এখন মহাকাল তাকিয়ে আছে অভিরামের ভাগ্যের পরিণতির দিকে।

ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল তার আর্ত প্রতিধ্বনি।

চমকে উঠে সুজন সিংএর কাছে সরে এলো সুভদ্রা।

ভয় কি সুভদ্রা, বলল সুজন সিং, ও রাজবাড়ির ঘণ্টা। একটি বুড়ো দারোয়ান থাকে এখানে, সে-ই প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজিয়ে যায়।

সুভদ্রা বলল, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

চলো।

সুজন সিং এগিয়ে চলল।

আবার দু'জনে ফিরে চলেছে সেই পথে। চাঁদের আলোয় পথ এখন আগের মত অস্পষ্ট নয়। কারো মুখে কথা নেই। দু'জন ভাবছে ভিন্ন পথে। সুজন সিং ভাবছে এই কাহিনী শোনার পর সুভদ্রা কি আর চাইবে অভিরামের হাতে হাত রাখতে। এবার লক্ষ্মীবাই আর তার অধিকারের পথটা হয়তো প্রশস্ত হবে। যদি তাই হয়, তাহলে সে কি পাবে না এই লাবণ্যময়ী নার্সটিকে।

সুভদ্রা ভাবছে আকাশপাতাল।

কেন এমন হয়। কি ভয়ংকর এ অভিশাপ। কান্না পেল তার। কুমার অভিরামের অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নার্স সুভদ্রার বুক ঠেলে একটা কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এলো। এমন একটা সুন্দর মনের মানুষকে পূর্বপুরুষের পাপের ঋণ শোধ করতে হবে। কি জানি কি ভয়াবহ মূর্তিতে ঐ মানুষটার ওপর দেখা দেবে অভিশাপ। তার মনে হল, অদৃশ্য যেন কোন শক্তি ইতিমধ্যেই কুমারবাহাদুরের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। কুমার অভিরামের যে মন একদিন তার হাতখানাকে টেনে নিয়েছিল, সেই মন এখন সুখী হচ্ছে লক্ষ্মীবাইএর সান্নিধ্যে। এই চাঞ্চল্য হয়তো কুমারবাহাদুরকে একদিন গ্রাস করে ফেলবে। তখন কি ভয়ংকর রূপ নিয়ে সে দাঁড়াবে সমাজের কাছে।

ভাবতে গিয়ে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল সুভদ্রা।

আর এক ভাবনা এলো তার মনে। এমন কোন মেয়ে কি আসতে পারে না কুমারবাহাদুরের জীবনে যে কোনদিন মনে মনেও সহচররূপে কোন পুরুষকে কামনা করেনি। কুমারবাহাদুরই হবে তার জীবনের প্রথম আর শেষ পুরুষ।

সাধু বলেছেন, কেবলমাত্র সেই পবিত্রতাই উদ্ধার করবে এ বংশকে পাপের ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে।

নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাল সুভদ্রার। সে যদি তার কুমারীজীবনে পবিত্র থাকতে পারত। অবশ্য সে তার জীবনের এই বিশটি বসন্তে এমন কোন কাজ করেনি, যা সমাজের চোখে গর্হিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মন! বাইরের চোখে ধরা না পড়লেও তার নিজের কাছে সে যে বার বার ধরা পড়ছে। কত সন্ধ্যায় দূরের ঐ তুষারশৈলের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে তার মনে পাষাণ-ভার নেমেছে। আবার ঝ'ড়ো হাওয়ার সঙ্গে এলোমেলো চিন্তায় উড়েছে তার মন। বর্ষার ধারা যখন নেমেছে অঝোরে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাহাড় পর্বত, তখন রাতের বিছানায় তার চোখেও কি নামেনি বর্ষণ! একাকীত্বের দুঃসহ চিন্তায় সে কি জাগেনি কোন বিনিদ্র রজনী। কোন বান্ধবীর বিবাহবাসরে উত্তম কোন পুরুষকে দেখে তার মনে কি জাগেনি তেমনি কোন এক কান্তিমান কুমারের সান্নিধ্যের লোভ! একান্ত আপনার ছোট্ট একটি সংসার, অবাক চোখে চাওয়া একটি শিশু, বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি একটি পুরুষের স্বপ্ন কোন্ কুমারীজীবনকে না স্পর্শ করে যায়!

সুভদ্রা ভাবল, নারীর এই স্বাভাবিক চিন্তা তাকেও স্পর্শ করেছে, তাই অস্বাভাবিক এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার সামর্থ্য তার নেই।

না, সে আর যাবে না কুমারবাহাদুরের অবসর বিনোদনের সঙ্গী হতে। তার যতটুকু কাজ ততটুকু করে সে সরে আসবে নিঃশব্দে। এখন নিজেকে জড়াতে গেলেই কুমারবাহাদুরের ধ্বংসের পথই শুধু মুক্ত করে দেওয়া হবে। না, তা সে প্রাণ থাকতে করতে পারবে না।

আবার একটি চিন্তা তার মনকে অধিকার করে বসল। আচ্ছা, এই বিপদের কথা শুনে সে কেমন করেই বা ত্যাগ করে যাবে কুমারবাহাদুরকে। নার্সের কাজ তো ফুরিয়ে যাবে দু'দিনেই। তারপর সে কোন অজুহাতেই বা যোগসূত্র রক্ষা করে যাবে কুমার অভিরামের সঙ্গে।

বিদ্যুতের মত একটি চিন্তা সুভদ্রার ভারাক্রান্ত মনের মেঘের ওপর দিয়ে সহসা খেলে গেল।

সে অনুভব করল সুজন সিংএর হাত ধরেই সে এতক্ষণ চলেছে। সেই যে কখন সংকীর্ণ একটা সেতুপথ পার হবার সময়ে আবার সে হাত ধরেছিল সুজন সিংএর, ভাবনার তরঙ্গে পড়ে সে হাত এতক্ষণ সে ছেড়ে দেয়নি। আর সুজন সিংও সুভদ্রার সেই হাতটিকে শ্লথ করে দেবার কোন চেষ্টাই করেনি।

সুভদ্রা সংযোগের যেন একটি সূত্র আবিষ্কার করে মনে মনে ভীষণ খুশী হয়ে উঠল। সে যদি সুজন সিংকে তার জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে পারে,

তাহলে হয়তো কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি থাকবার একটা সুযোগ পেতে পারবে। আর সেই সুযোগে সে চেষ্টা করে যাবে দু'হাত দিয়ে কুমার অভিরামের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপর এসে পড়া অশুভ ছায়াগুলোকে সরিয়ে দেবার। অবশ্য ভাগ্যের বিধানের বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ্য তার কতটুকুই বা। তবু আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও যেমন অসুস্থ সন্তানকে জননী বুক দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি করে কুমার অভিরামকে সুভদ্রা অশুভ অশনির আঘাত থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল।

পথ এবার ফুরিয়ে গেল। ওরা ততক্ষণে এসে পড়েছে কনভেণ্টের কাছে।

সুজন সিং সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আজকের পথটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, তাই না?

সুভদ্রা মুখ নত করল, কিন্তু তখনও সে তার হাতটিকে সুজন সিংএর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না।

সাহস পেল সুজন সিং। দুর্জয় সাহসে ভর করে সে বলল, এ হাত এখন আমার, বল সুভদ্রা যদি একে আমি আর না ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চিরদিনের করে রেখে দিই।

সুভদ্রা তার অন্য হাতখানাও ধীরে ধীরে এগিয়ে দিল সুজন সিংএর দিকে। তারপর চারটি হাতের মাঝে নিজের মুখখানিকে লুকিয়ে কি এক আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা বার্ণাদেৎ আর কুমার অভিরামকে। কাহিনীর শুরুতে দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে যাকে আমরা প্রথম দেখেছিলাম, সে এখন সেই ভয়াবহ রাত্রির শেষ প্রহরে কুমারমহলে মাথায় অস্ত্রোপচারের পর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

আমরা এতক্ষণ যে কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করলাম, তা এই ট্রেন দুর্ঘটনার কিছুকাল আগের ঘটনাপ্রবাহ।

ডাক্তার গর্গ যাবার সময়ে বলে গেলেন, কুমার, জ্ঞান এর ফিরবে, তবে মাথায় যে ধরনের আঘাত তাতে অনেকসময় পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। হাঁ, তুমি একবার ডাক দাও সুভদ্রাকে। ও বিয়ের পর নার্সিং ছেড়ে দিয়েছে ঠিক, তবে ও ছাড়া এসব কেসে আর কারো ওপর ভরসাও রাখা চলে না।

চলে গেলেন ডাক্তার গর্গ।

কুমার অভিরাম বসে বসে ভাবতে লাগলেন। সুজন সিং তাঁর বন্ধু ঠিক, কিন্তু সে কি এই রাতে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে একা পাঠাতে চাইবে এই মহলে। আর সমস্ত ব্যাপারটাই রাখতে হবে সংগোপনে। এমনকি সুজনকেও জানান হবে না কথাটা। কারণ তাহলে লক্ষ্মীবাই জানতে পারবে। আর লক্ষ্মীবাই জানার অর্থই হল একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি। এই মানসিক ঝামেলার

ভেতর নিজেকে ফেলার অর্থই হল নিজের মনের সুখ আর শান্তি নষ্ট করা।

এই মুহূর্তে কুমারবাহাদুরের ভীষণ রাগ হল সুভদ্রার ওপর। তার মত সুন্দর স্বভাবের মেয়ে সুজনের মত একটা চতুরকে কেন বিয়ে করতে গেল। কেনই বা সে প্রতীক্ষা করে দেখল না আর কিছুদিন।

কুমারবাহাদুরের মনে হল, মেয়েরা বড় বেশী বিবেচক। তারা ভবিষ্যতের মনোহর সুখের আশার দিকে চেয়ে না থেকে বর্তমানের সামান্য সুখকেও মুঠো ভরে কুড়িয়ে নিতে চায়।

কিন্তু সুভদ্রা সম্বন্ধে তাঁর মনের থেকে সত্যিই কোন প্রতিবাদ নেই। প্রয়োজনে নীরবে সে তার সেবা করে গেছে। এখনও কোন অনুষ্ঠানে কাছাকাছি এলে তার চোখে মুখে দেখা গেছে বিনম্র আত্মনিবেদনের ভাব। না, কুমারবাহাদুর কোনদিনই তাকে অনাদর করে দূরে সরিয়ে দিতে পারবেন না।

ফোনটা তুলে নিলেন কুমার অভিরাম। ডায়াল করলেন; হাঁ, সুভদ্রাই ধরেছে।

আমি কুমারমহল থেকে কথা বলছি।

ওপার থেকে ভেসে এলো ঃ কুমারবাহাদুর, এত রাতে।

এত রাতে ? দরকার, বড় বেশী রকমের দরকার পড়েছে তোমাকে।

আমি এখুনি আসছি।

না না, এখুনি আসতে হবে না। একেবারে ভোরবেলা চলে এসো। কাউকে কোন কথা জানাবার দরকার নেই।

ঠিক ভোরেই কুমারমহলের ভেতর কলিং বেল বেজে উঠল।

কুমারবাহাদুর বেরিয়ে এসে দরজা খুলে সুভদ্রাকে সুপ্রভাত জানালেন। শীতের যথেষ্ট পোশাক গায়ে নিয়ে আসতে পারেনি সে, তাই বাইরে দাঁড়িয়ে কষ্ট হচ্ছিল সুভদ্রার।

কুমারবাহাদুর সুভদ্রার অবস্থাটা লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে এই প্রবল শীতের ভেতর নিয়ে এলাম তাই সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। অবশ্য শীতের পোশাক-গুলো পরে আসবার মত সময় তোমাকে আমি দিতে পারতাম। রোগীর কাছে ডাক্তার, নার্স সকলেই রয়েছে।

বিস্মিত হল সুভদ্রা। রোগী, কে আবার অসুস্থ হল ?

বাইরে দাঁড়িয়ে রইবে কতক্ষণ, ভেতরে এসো, সব জানতে পারবে।

সুভদ্রাকে কুমার অভিরাম প্রথমে বার্ণাদেতের ঘরে নিয়ে গেলেন না। তিনি তাঁর বসবার ঘরে সুভদ্রাকে এনে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী চা পরিবেশন করে গেল বেয়ারা।

দুজনে চা পান করছিল আর কথা হচ্ছিল।

সুভদ্রা বলল, কি ব্যাপার বলুন তো ? এমন রাতেভিতে তলব। তারপর বলছেন রোগী আছে। কুমারমহলে আবার রোগী কোত্থেকে এলো ?

সে অনেক কথা, কুমারবাহাদুর বললেন, আগে বল দেখি, তুমি যে এখানে

এলে সুজন কিছু জানে না।

সুভদ্রা হেসে বলল, কি মনে হয় আপনার ?

মনে হচ্ছে আমি তোমাকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম।

আপনি আমার কাছ থেকে তাহলে কি আশা করেন বলুন ?

কুমারবাহাদুর হেসে বললেন, এখনও তুমি একেবারে স্বাধীন জেনানা, এ কথা কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?

সুভদ্রা বলল, হয়তো নয়, কিন্তু আপনার যেখানে নিষেধ, সেখানে কি আপনি মনে করেন সুভদ্রা তাকে লঙ্ঘন করবে ?

আচ্ছা হার হল তোমার কাছে সুভদ্রা, কিন্তু একটা জরুরী বিষয় আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল অভিরামের মুখের দিকে।

কুমারবাহাদুর বললেন, তোমাকে আমার বেশ কয়েকদিন দরকার হবে সুভদ্রা, তাই সারারাত বসে বসে ভেবেছি কি করা যায়।

একটু থেমে বললেন, আমি যদি আজই জরুরী কোন কাজে সুজন আর লক্ষ্মীবাইকে কয়েকদিনের জন্যে বোম্বে পাঠিয়ে দিই, তাহলে কি তোমার বিশেষ আপত্তি হবে ?

সুভদ্রা হেসে বলল, আপত্তি, ঘোরতর আপত্তি। স্বামী আর ননদিনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিদেশে, পরস্ত্রীকে বন্দী করে রাখছেন নিজের কাছে, এ তো ভাল কথা বলে মনে হচ্ছে না কুমারবাহাদুর। তারপর বলল, ওসব কথা রাখুন, এখন বলুন দেখি আসল ব্যাপারটা কি ?

সুজন কিংবা লক্ষ্মীবাই কথাটা জানতে পারলে অসুবিধে ঘটতে পারে, তাই আগেভাগে একটা ব্যবস্থা করতে চাইছি।

সুভদ্রা বলল, যাকে যেখানে পাঠালে ভাল হয়, তা আপনি করুন হাজারবার, কিন্তু আমার কাজটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পরের দিন রাত তখন দুটো, সুভদ্রা কুমারবাহাদুরের বিশ্রামঘরে ঢুকল। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কুমার সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। কাঁধে কার হাতের ছোঁয়া লেগে উঠে বসলেন। সুভদ্রা বলল, আসুন রোগীর ঘরে, আপনাকে খুঁজছেন বলে মনে হচ্ছে।

কুমার অভিরাম সুভদ্রার সঙ্গে রোগিণীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মহিলাটি মনে হল, জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

কুমারবাহাদুর তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। রোগিণী একদৃষ্টে কুমার অভিরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একসময় দেখতে লাগলেন সুভদ্রাকে। আবার চোখ বুজলেন। পরে যখন চোখ মেললেন, তখন দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন। কি যেন চিন্তার চেষ্টা করছেন বলে মনে হল।

আমাকে চিনতে পারছেন ? কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সুভদ্রা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুভদ্রাকে দেখলেন, তারপর মৃদু একটুখানি হাসির

রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। এরপর কতক্ষণ কি যেন ভাববার চেষ্টা করলেন। চোখেমুখে সহসা ফুটে উঠল যন্ত্রণার রেখা। তারপর চোখ বন্ধ হল।

সুভদ্রা বলল, উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

কেন সুভদ্রা ?

সম্ভবতঃ কোনকিছু ভাবনার উত্তেজনায়।

সুভদ্রা মহিলাটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কুমার অভিরাম ফিরে গেলেন গৃহান্তরে।

কয়েকদিনের পরের ঘটনা।

রোগিণীকে নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানে পায়চারি করছিল সুভদ্রা। এ ক'দিনে বড় ভালবেসে ফেলেছেন মহিলা সুভদ্রাকে। ডাক্তার গর্গ ঠিকই বলেছিলেন। রোগিণী হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পূর্বস্মৃতি। এখন বর্তমানের সঙ্গেই তিনি করছেন বোঝাপড়া। তাই সেবাময়ী এই নার্সটির ওপর তিনি হয়ে পড়েছেন নির্ভরশীল।

কুমার অভিরাম কাছে এলে প্রথম প্রথম কেমন যেন চমকে উঠতেন বিদেশিনী এই মহিলা। এখন আর তেমনটি করেন না। খুব সহজভাবে একটু মিষ্টি হেসে সুভদ্রার গায়ে হাত রেখে বলেন, অভিরাম। যেন সুভদ্রার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কুমার অভিরামের।

এই মহিলাটি যে একজন নান সে পরিচয় জানে শুধু তিনটি মানুষ। কুমারবাহাদুর নিজে, ড্রাইভার দিলওয়ার সিং আর সুভদ্রা। জ্ঞান ফেরার পর মহিলাটিকে বহুভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাঁর ঠিকানা, কিন্তু অসহায় চাহনি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি আর কিছু।

তাই একদিন অভিরাম নিজের ঘরে সুভদ্রাকে ডেকে বললেন, ঐ মেয়েটিকে দেখে তোমার কি মনে হয় সুভদ্রা ?

তার মানে আপনি কি জানতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন।

আমি বলছি খ্রীষ্টান মিশনারী তো ঠিকই কিন্তু খাঁটি, বিদেশিনী বলেই কি তোমার ধারণা ?

আপনি ঠিকই ধরেছেন কুমারবাহাদুর। যদিও ওঁর গড়নের মধ্যে বিদেশী ছাপটাই বেশী, তবু পুরোপুরি বিদেশী বলে ওঁকে মনে হয় না।

কুমারবাহাদুর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা সুভদ্রা, আমি যদি ওঁর একটা নতুন নামকরণ করি।

বেশ তো, হাসি আড়াল করে বলল সুভদ্রা, যে নাম আপনার সবচেয়ে পছন্দ তাই দিন।

কুমারবাহাদুর অমনি বললেন, সে কি আর দেবার উপায় রেখেছ তুমি।

এবার অবাক হওয়ার পালা সুভদ্রার।

কি রকম ?

তুমি নিজেই সে নাম ধারণ করে বসে আছ।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুভদ্রা।

তাই নাকি, এত লোভ নামটার ওপর। ভাগ্যিস লোভটা নামের অধিকারীর ওপর এসে পড়েনি।

এবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কুমারবাহাদুর।

সহজ কৌতুকের আড়ালে মেয়েটি বার বার যেন কুমারবাহাদুরকে আঘাত করে চলেছে। আহত হচ্ছেন কুমার অভিরাম কিন্তু মেয়েটির ব্যবহার পরক্ষণেই সব দুঃখকে মুছে দিয়ে সেখানে খানিকটা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আবার কথা বলল সুভদ্রা, এখন তাড়াতাড়ি করে ওর একটা নামকরণ না করলে আমাদেরই কাজ চালান মুশকিল হয়ে পড়বে।

তুমিই বরং একটা নামকরণ করে দাও ওর।

সুভদ্রার মুখের দিকে সমাধানের আশায় তাকিয়ে রইলেন কুমারবাহাদুর।

সুভদ্রা গম্ভীর হবার ভান করে বলল, পছন্দ হবে আপনার?

কুমার তাকালেন সুভদ্রার দিকে।

আমার পছন্দ অপছন্দের ওপর কি যায় আসে সুভদ্রা।

ও কথা বলবেন না কুমারবাহাদুর। একদিন হয়ত সংগোপনে আমার দেওয়া নামটি ওঁর কাছে উচ্চারণ করতে গিয়ে ভাববেন, কি একখানা নামই না দিয়েছিল সুভদ্রা। আরও কিছু মিষ্টি করে দিতে পারল না; তাহলে আরও মধুর করে ডাকা যেত।

এবার কিন্তু তুমি দূর ভবিষ্যতের কথা নিয়ে জোর আলাপ আলোচনা শুরু করলে বলে মনে হচ্ছে। এত দূরের ভাবনা না ভেবে কাজ চলার মত যাহোক একটা কিছু নামকরণ করে ফেল দেখি।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে নানাধরনের নাম ভাববার চেষ্টা করল। তার চোখের সামনে কিছুকাল আগের একটা ছবি ভেসে এলো। কুমারমহলের বাগানে অজস্র ফুলের স্তবক। প্রজাপতি উড়ছে, কি বিচিত্র তার রঙ, কি সহজ তার গতিভঙ্গী। একটি মেয়ে ছুটছে প্রজাপতির পেছন পেছন। তাকে বসতে দিচ্ছে না কোন ফুলের গুচ্ছে। তারপর সে নিজেই বসে পড়ল একটা শিলা-খণ্ডের ওপর। সে প্রজাপতিটা ততক্ষণে ডেকে এনেছে তার দোসরকে। তারা নাচা শুরু করেছে মেয়েটিকে ঘিরে।

কি হল, সহসা চমকে উঠল মেয়েটি। কার হাতের ছোঁয়া লেগে তার সারা অঙ্গে কাঁপন জাগল! কুমারবাহাদুর কেন সেদিন এই সামান্য নার্সকে এমন করে কাঁদালো!

সুভদ্রা নিজের মনকে শাসন করল, এ সব কি ভাবছে সে। জীবনে শুধু কি নিজের পাওয়া না পাওয়ার কথাই ভেবে যাবে। কেন, তার ভাল লাগার মানুষটির জন্যে নতুন পথের দ্বার খুলে দিয়ে সে কি বলতে পারে না, তোমার পথ সুন্দর হোক।

তোমার পথের ধারে যে ফুলটি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তাকে তুলে নাও। কর তার সমাদর।

এই মুহূর্তে সুভদ্রার মনে হল এমন কিছু ত্যাগ নেই যা সে না করতে পারে কুমার অভিরামের জন্য।

কি, ভাবনার যে শেষ নেই তোমার দেখছি, বললেন কুমারবাহাদুর।

চমকে উঠল সুভদ্রা। মুখ থেকে তার বেরিয়ে এলো একটি নাম হীরাবাই।

হীরাবাই, হীরাবাই, দু'বার করে নামটা উচ্চারণ করলেন কুমারবাহাদুর।

এবার হেসে বলল সুভদ্রা, ও নাম বহু মূল্যবান্ কুমারবাহাদুর। আঁধারেও জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠবে। আপনার মনের সব অন্ধকার কেটে যাবে ও নামের উচ্চারণে।

মনে মনে খুশি হলেন অভিরাম। মুখে বললেন, এ নামে প্রথম তুমিই ওকে ডাক দেবে, কারণ নামটা তোমারই দেওযা।

দোহাই আপনার, আমি আর ওর ভেতর নেই। নাম দিয়েছি, ইচ্ছে হলে দাম চুকিয়ে দিন, পরেব স্ত্রী ঘবে ফিবে যাই।

কুমারবাহাদুর বললেন, ভাইবোন এখন বোম্বের মেরিন ড্রাইভে বেড়াচ্ছে, সুতরাং এখন তোমাকে একা অরক্ষিত ঘরে কেমন করে ছেড়ে দিই বল।

আবার কথা ছুঁড়ে মারল সুভদ্রা, এমন রক্ষক আছে জানলে এ আস্তানা ছেড়ে কে আর অন্যত্র যেত বলুন।

এবার সুভদ্রা আর অভিরাম দু'জনেই হেসে উঠল।

সুভদ্রা গেছে ল্যান্ডোরে কিছু কেনাকাটা করতে।

বাগানে একটা ইজিচেয়াবের ওপর বসেছিলেন মহিলাটি।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন কুমার অভিরাম।

কি অপূর্ব ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন তরুণী মহিলাটি। চেহারার মধ্যে এমন এক মাধুর্য মাখানো রয়েছে যা কোনদিন অন্য কোন মহিলার মধ্যে দেখেছেন বলে কুমারবাহাদুরের মনে পড়ল না।

হীরাবাই, তুমি হীরাবাই।

কথা কটি আবেগের সঙ্গে বললেন অভিরাম।

আমি হীরাবাই!

হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন মহিলা। খুশীতে ভরে গেল তাঁর সমস্ত মুখ।

কুমার বললেন, আজ থেকে তুমি আমার হীরাবাই, শুধু আমার।

শুধু তোমার, আমি শুধু তোমার হীরাবাই।

গুরুত্বহীন একটা উচ্ছ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মহিলা।

মনে হল কথাগুলোর যথার্থ অর্থ বা কুমারবাহাদুরের আবেগের উত্তাপ তেমন করে হীরাবাইকে স্পর্শ করল না।

তবু কেমন যেন এক খুশীর ঢেউ বয়ে গেল। যেন ভারী ভাল লেগেছে। বার বার করে উচ্চারণ করতে লাগলেন কুমারবাহাদুরের দেওয়া নামটা।

এরপর তাঁর একটা কথা মনে এলো। কুমার অভিরাম তাঁর নামটাকে কেমন

মধুর করে উচ্চারণ করেছেন। এমনি করে ডাকলে বুঝি সবকিছুই ভাল লাগে। কেমন একটা মিষ্টি সুর, কোমল ধ্বনি।

এই নামের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটি চেহারাও ফুটে উঠতে লাগল তাঁর ভাবনায়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সদাশয় একটি মানুষ। তরুণী নান অভিরামের দিকে খুশীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

অভিরাম চলে গেলেন বাগানের এক প্রান্তে। একটি গোলাপ তুলে এনে বললেন, হীরাবাই আজ প্রথম তোমার নাম ধরে ডাকলাম, তাই আজকের দিনটা এই গোলাপ দিয়ে স্মরণীয় করে রাখতে চাই।

হীরাবাই মৃদু হেসে গোলাপটি হাতে নিয়ে বললেন, খুব সুন্দর। যেমন কোমল তেমনি পবিত্র। ঠিক তোমারই মত অভিরাম।

কুমার মনে মনে সংকুচিত হলেন। জীবনে সত্যিকারের পবিত্রতা কাকে বলে তা তিনি কোনদিন অনুভব করেছেন বলে মনে আনতে পারলেন না।

আজ এই তরুণী নানের মুখে তাঁর সম্বন্ধে পবিত্রতার কথাটি ওঠায় নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল তাঁর।

কুমার অভিরাম একটু হেসে বললেন, ওটি ফুল নয়, আয়নার বুকে একটি প্রতিবিম্ব। তোমারই প্রতিবিম্ব পড়েছে ওখানে।

হীরাবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নিজের মনের গভীরে যেন অভিরামের কথাটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তারপর একসময় বললেন, সুভদ্রা কোথায় অভিরাম?

সে গেছে ল্যাণ্ডোর বাজারে।

আমি ল্যাণ্ডোর বাজারে তার কাছে যেতে চাই।

কেন?

আমার খুবই ইচ্ছে করছে এখুনি ওকে এই ফুলটা দিই।

অভিরাম হেসে বললেন, অদ্ভুত তোমার ইচ্ছে।

সে কথার কোন জবাব দিলেন না হীরাবাই। শুধু বললেন, এমন সুন্দর একটা উপহার ওরই পাওয়া উচিত। ও খুব ভাল মেয়ে, বড় দয়ালু।

সুভদ্রাই তোমার ল্যাণ্ডোরে যাওয়া মানা করে দিয়েছে। তুমি এখনও তোমার সবটুকু বল ফিরে পাওনি।

আমি তাহলে যাব না অভিরাম। ওর কথা আমাকে শুনতেই হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন, ওর কথা সবাইকে শুনতে হবে। তুমি শোন না ওর কথা?

খু-উ-ব। না শুনে উপায় আছে। খুশি আর তৃপ্তির একটা ছবি ফুটে উঠল হীরাবাইএর চোখেমুখে। সুভদ্রা যে সত্যিই ভাল, তাকে যে সকলের ভাল লাগে, এ খবরটুকু হীরাবাইএর মনের ওপর প্রবলভাবে রেখাপাত করল।

হীরাবাই এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কুমারমহলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল একটি রোডোডেনড্রন গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে লাল রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে আছে। কয়েকটা পাখি জটলা করছিল ডালের ওপর।

হীরাবাই বললেন, তুমি ঐ বৃক্ষের মত অভিরাম। তেমনি ঋজু, বলিষ্ঠ, আশ্রয়দাতা আর শোভন সুন্দর।

আমাকে এত বড় করে দেখো না হীরাবাই। অনেক অন্যায়, অনেক পাপ, আমার রক্তের ভেতর বাসা বেঁধে রয়েছে।

তুমি নিজেকে এমন ছোট করে ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয় অভিরাম। আমার কিন্তু তোমাকে এতটুকু খারাপ বলে মনে হয় না।

তারপর অভিরামের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তাকাও তো দেখি আমার দিকে।

কুমার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন হীরাবাইএর দিকে। এদিক-ওদিক মাথা দুলিয়ে হীরাবাই কি যেন দেখে বললেন, কখখনো না, এমন সুন্দর সোজাসুজি চেয়ে থাকতে পারে না পাপীরা। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে অভিরাম।

এবার কুমারবাহাদুর কৌতুক করে বললেন, আমাকে তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে কি?

স-ব-চে-য়ে।

হীরাবাই অনেক দীর্ঘ করে টেনে টেনে বললেন কথাগুলো।

আমার চেয়েও?

একটা হাসির তরঙ্গ উঠল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দুজনে দেখল কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা। চোখে মুখে তার উজ্জ্বল হাসির আভাস তখনও মুছে যায়নি।

কেন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন কুমার অভিরাম।

হীরাবাই এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরলেন।

কপট ক্রোধে সুভদ্রা বলল, এত যে রাত জেগে সেবা করলাম, তার বুঝি এই পুরস্কার। নেবার সময় একজনের কাছ থেকে নিলে, আর দেবার সময় উজাড় করে দিলে অন্যজনকে।

যেন খুবই বিব্রত হল হীরাবাই। ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুমি কি আমার কথায় খুব দুঃখ পেলে সুভদ্রা?

ভী-ষ-ণ, খু-উ-ব। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে সারাজীবন আড়ি করে দিই।

কি করবে বুঝতে না পেরে হীরাবাই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল বুঝি কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাছাড়া সবচেয়ে তাঁর খারাপ লাগল এই ভেবে যে তিনি যাকে সত্যিকারের ভালবাসেন তাকে তিনি আহত করেছেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হীরাবাইএর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

সুভদ্রা অমনি বলে উঠল, সে কি, আমার কথাগুলোকে একেবারে সত্যি ভেবে বসলে নাকি! নাঃ, তোমার আসল চিকিৎসার এখনও অনেক বাকী!

এবার হীরাবাইকে দু'হাতে ঝাকানি দিতে দিতে বলল সুভদ্রা, তুমি আমাকে ভালবাস, ভালবাস, ভালবাস। এত ভালবাসা কেউ কাউকে কখনো দিতে পারেনি আর পারবেও না।

সুভদ্রার কথায় হীরাবাইএর মনের মেঘটুকু কেটে সমস্ত হৃদয় নীল

আকাশের মত নির্মল হয়ে গেল।

হীরাবাই বললেন, তুমি বড় ভাল আর করুণাময়ী।

সুভদ্রা মনে মনে বলল, আমি করুণাময়ী কিনা জানি না, তবে তোমার হাতে যা তুলে দিলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।

অভিরামের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সৌভাগ্য, এমন রত্ন বিধাতা আপনার কাছে এনে দিয়েছেন। এ আপনার সমস্ত কুমারমহলের কল্যাণলক্ষ্মী।

কুমার অভিভূত হয়ে বললেন, একে তুমিই তো আমার কাছে এনে দিলে সুভদ্রা। তোমার সেবা না পেলে সবই তো ব্যর্থ হয়ে যেত।

দুষ্টুমীতে পেল সুভদ্রাকে। অমনি দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দিন, আমার এত বড় দানের প্রতিদান দিন। কত বড় স্বার্থ ত্যাগ করে দিলাম বলুন।

অভিরাম বললেন, চিরজীবন তুমি আমাকে ঋণী করে গেলে। তুমি আমাকে তোমার সবকিছুই দিলে, কিন্তু আমি তোমাকে সামান্য কিছু দিতে গেলেই তুমি দূরে সরে গেলে। চিরদিন মীনারের ওপরেই রইলে সুভদ্রা, নীচে নামলে না।

সুভদ্রা সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না। সামান্য ফুল তোলার অজুহাতে সে তার চোখের জলটুকুকে আড়াল করবার জন্য বাগানের এক প্রান্তে চলে গেল।

এই সামান্য সময়ে জীবনের কয়েকটি পুরোনো পাতা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে এসেছিল। অভিরাম আর সুভদ্রার সেই পাতার ওপর হয়েছিল চারিচক্ষের মিলন। মুহূর্তের সেই দেখা, তবু স্মৃতিটুকু অনাগত দিনগুলিকে স্পর্শ করে রইল।

না, সুভদ্রা আজ কিছুতেই তার মনকে আচ্ছন্ন হতে দেবে না। অভিরাম যদি এই মেয়েটিকে জয় করতে পারে তাহলে সে সত্যিই সুখী হবে। আর সুভদ্রা চিরদিনই তো প্রার্থনা করে এসেছে অভিরামের মঙ্গলের জন্য।

সে ভাবল, আজ সে প্রেমের পরীক্ষায় হেরে যাবার বদলে অনেক বেশী করেই জিতে গেল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। দিনান্তের গোলাপী আভাটুকু দূরের তুষার পাহাড় থেকে তখনও মুছে যায়নি। তন্মগত হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন হীরাবাঈ। সমস্ত দেহে যেন কিসের শিহরন বয়ে যাচ্ছিল। পায়ে পায়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা। কোন কথা না বলে সেও তাকিয়ে রইল ঐ দিনান্তের সমারোহের দিকে। যখন ছায়া নামল, তুষারের ছবি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল তখন দু'জনে পাশাপাশি ফিরে এল ঘরের ভেতর।

আলো জ্বলছে। দরজার ঠিক ওপরে অবলোকিতেশ্বরের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি। তারই তলায় কারুকার্যখচিত আলোকদান। উজ্জ্বল নীলাভ একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ফিকে হলুদ রঙের একগুচ্ছ ফুল লাল পলতোলা কাচের একটি ফুলদানিতে রাখা আছে বুক-শেল্ফএর

ওপর। আপন মনে একখানা বইএর পাতা উলটাচ্ছিলেন অভিরাম। দু'জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে বলে উঠলেন, কি হল, দুই সখীতে কিছু মতলব এঁটেছ নাকি ?

সুভদ্রা বলল, যে মানুষ সবসময় হেরেই আছে, তাকে আবার যুক্তি করে হারাতে যাব কোন্ দুঃখে ?

হার আবার কার কাছে কখন মানলাম ?

সুভদ্রা ওপরদিকে একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ ওপরে যিনি বসে পুতুলনাচের সুতো টানছেন, সেই ওপরওয়ালা খেলোয়াড়টির কাছে।

একটু থেমে বলল, আপনি এতদিন জীবনটাকে যেরকম করে গড়তে চেয়েছিলেন, বিধাতাপুরুষ আপনার গড়া পুতুলগুলোকে ভেঙে দিয়ে বললেন, এমনি করে সুতো ধরে এমনি সুন্দর পুতুল নিয়ে জীবনের খেলা খেলতে হয়। হার হয়েছে আপনার ঠিক। কিন্তু হেরে গিয়েও আপনি বড় রকমের একটা জিতে গেছেন। তাই নয় কি ?

তোমার এ প্রশ্নের হাঁ, না, কোন জবাবই আমি দিতে পারব না। যেমন একদিকে জয়ের আনন্দ আমার মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে হারানোর হাহাকারও আমাকে কম আহত করছে না।

সুভদ্রা এবার হীরাবাইএর দিকে ফিরে বলল, চল সখি, অকারণে এ কথার জালে তোমাকে জড়াব না ! আমার রুটিনের কাজগুলো এখন আমাকে করতে দাও।

সাঁঝের খাবার খাচ্ছিলেন হীরাবাই, পাশে বসেছিল সুভদ্রা।

হীরাবাই বললেন, আজ কেন জানি না অন্য দিনের চেয়ে সুস্থবোধ করছি।

সুভদ্রা বলল, আজ কিন্তু তোমার শরীর আর মন দুদিকেরই কষ্ট হয়েছে বেশী।

আমি তো কই কিছু বোধ করতে পারছি না সুভদ্রা !

মনের একটা অবস্থায় বোধকরি কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না।

হীরাবাই বললেন, বুঝি তাই।

এক প্লেট ফল এগিয়ে দিয়ে সুভদ্রা বলল, কুমারবাহাদুর আমাকে বড় একটা বিপদে ফেলেছেন।

বিস্মিত হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকালেন হীরাবাই।

হাঁ, খুবই বিপদে ফেলেছেন। আজ বাজারের পথে ঘরে গিয়েছিলাম। একটা চিঠি এসেছে বোম্বে থেকে। বেশ ক'দিন চিঠিখানা এসে পড়ে আছে, আর আমি নিশ্চিন্তে রয়েছি এখানে।

বিব্রত হয়ে হীরাবাই বললেন, কেন, কিসের চিঠি, কোথা থেকে এলো !

সে তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না আমার ঘরের মানুষটিকে তোমার মনের মানুষ ছলাকলা করে বিদেশবিভুঁয়ে পাঠালেন। এখন আমার মানুষটি যে পরবাসে জ্বরে পড়ে কাতর হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন তার কি হবে।

পাশের ঘরে বসে সব কথাই শুনছিলেন কুমার অভিরাম। শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, কি হল সুজনের, কি লিখেছে চিঠিতে?

সুভদ্রা হেসে বলল, লেখা আছে জ্বর, কিন্তু জ্বরের ধরনটা কি রকম তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অভিরাম বললেন, তোমার সবকিছুতেই রসিকতা! হয়ত সত্যিই সে জ্বরে কাতর হয়ে পড়েছে।

সুভদ্রার কৌতুক বেড়ে গেল। সে বলল, আপনার বন্ধুর আর যা থাক বা না থাক একটা বড় গুণ কিন্তু আছে। সেটি হল জ্বরে পড়লেই প্রেমপত্র লেখেন।

এবার কুমার অভিরামও হেসে উঠলেন।

না, না, হাসির কথা নয়, বলল সুভদ্রা, ওর চিঠিখানা এসেছে কয়েকদিন আগে, আর আমি তার কোন উত্তরই দিতে পারিনি আজও। দেখুন দেখি ও যদি ভেবে বসে ওর গৃহিণীকে আর কেউ ঘরছাড়া করে নিয়ে গেছে তাহলে অন্ততঃ দোষ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া আর একটি ভয়ও আছে। এতকাল কোন চিঠি না পেয়ে বিরহে কাতর হয়ে যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে তার স্ত্রী বেচারার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি?

সে ভাবনা তোমার নেই সুভদ্রা। ওকে এমন কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ সুযোগ মুহূর্তের জন্যেও সুজন হাতছাড়া করবে না।

একটু থেমে বললেন, তবে যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন সারাটি রাত জেগে লিখে ফেল একটা প্রেমপত্র। আমি একেবারে ভোরবেলা স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার দিয়ে দেরাদুনে পোস্ট করতে পাঠিয়ে দেব।

সুভদ্রা বলল, জাঁহাপনা, এ কাজটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?

তাহলে আর এক কাজ কর। চিঠির অক্ষরগুলোকে দাও কাঁপিয়ে।

তাতে কি সুবিধে হবে?

তুমিই জ্বরে কাতর হয়ে আছ। তাই পত্রপাঠ পত্র দিতে পারনি।

এতে উলটো ফলও তো ফলতে পারে?

কি রকম?

যদি সত্যি সত্যি পত্নীপ্রেমের পরিচয় দিতে ও স্বয়ং এসে হাজির হয়।

তাহলে চিঠির ভেতর লিখে দাও যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ তবে দুর্বলতা সম্পূর্ণ কাটেনি।

সুভদ্রা জয়তিলকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা আপনার বন্ধুপ্রেম আর বন্ধুপত্নীপ্রেম এ দুটোর ভেতর কোন্‌টা বেশী বলুন তো?

দুটিই সমান।

আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হচ্ছে না। পক্ষপাতিত্ব যেন বন্ধুপত্নীতেই বেশী।

অভিরাম হেসে বললেন, আগে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু এখন

তোমার ভেতর দিয়ে সুজন আমার আরও কাছে এসে গেছে। তাই বন্ধুপত্নীর মন রাখতে বন্ধুকে কাছে না টেনে পারি কি করে!

বন্ধুপত্নীর মন রাখতে না মান রাখতে?

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিছু কিছু বোঝা না বোঝার আলো আঁধারের ভেতর প্রসন্ন মুখটি তুলে তাকিয়ে রইলেন হীরাবাই।

আরও কয়েকটি দিন কেটে গেছে। নতুন পরিবেশে নতুন এক নারী যেন জেগে উঠছে হীরাবাইএর ভেতর।

আবাল্য যে পরিবেশে কেটেছে তার দিন, সেই পুরুষের সঙ্গছাড়া জীবন তাকে যে অপার্থিব লোকের ইশারা দিয়েছে সে জীবন আজ ফেলে এসেছে সে বিস্মৃতির পারে।

এখানে অন্য জগৎ, অন্য মানুষ। তাব অভ্যস্ত জীবনেব কোন স্পর্শ নেই এখানে। যৌবনে যোগিনী সাজার আয়োজন এখানে কেউ করে দেয় না। বসন্তের এলোমেলো মন-কেমনের হাওয়া যখন অজস্র ফুলের রেণু মেখে ধর্মযাজিকাদের আবাসে বয়ে আসত তখন অভিজ্ঞ সিস্টার বা মাদার স্বয়ং এসে তাকে ঈশ্বরের প্রসাদ বলে ব্যাখ্যা করতেন। আনমনা হলেই তা হওয়া চাই একমাত্র প্রভুর চিন্তা। অন্য কোন চিন্তার স্থান বা অবকাশ এখানে নেই।

বাদলের রাতে নিশ্চয়ই ধর্মযাজিকাদের আবাস-গৃহের ওপরের আকাশ ছেয়ে মেঘ ঘনিয়ে উঠত। ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় খুলে যেত কোন কোন ঘরের জানালা। বিদ্যুতের আলোয়, বর্ষাধারার শব্দে ভেঙে যেত ঘুম। কি এক অজানা বঞ্চিত যৌবনের কান্না উঠে আসতে চাইত বুক ঠেলে। আকাশের ধারার সঙ্গে সমানে ঝরত চোখের ধারা।

কিন্তু বর্ষণ যখন থেমে যেত, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত চাঁদের আলো তখন অপরাধী নান নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাত ঈশ্বরের কাছে, প্রভু ক্ষমা কর আমার অপরাধ। আমাকে পাপের অন্ধকার থেকে নিয়ে চল তোমার পবিত্র আলোর জগতে। ঘুচিয়ে দাও আমার পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়া।

কিন্তু এখানে নেই সে প্রার্থনা। জন্মান্তরে এক তরুণী নান প্রবেশ করেছে পার্থিব ভোগের জগতে। তার পূর্ব জীবনের সংস্কার রয়েছে অবচেতন মনে। কিন্তু নতুন এক জগৎ তার কাছে এনেছে এক অনাস্বাদিত আনন্দ সংবাদ। তাকে কেমন করে গ্রহণ করতে হয় তা সে জানে না, কিন্তু কেমন যেন এক মৃদু সৌরভের মত তার চারদিকে কামনা বাসনার মৌমাছিগুলি গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

হীরাবাই আশ্চর্য এই অনুভূতির জগতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে রইলেন।

আজ কয়েকদিন হল, বেলা পড়ে এলেই সুভদ্রা সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যায় হীরাবাইকে। তারা বাজারের দিকে না গিয়ে এদিক ওদিক পাহাড়ী পথে ঘুরে বেড়ায়। রাশি রাশি বুনো গোলাপ ফুটে থাকে পথের ধারে, কোন

বাড়ির পাঁচিলে। ওরা ফুল তোলে। এ ওর হাত ভরে দেয়, মাথায় গোঁজে। কখনো পথের ধারে পাইন গাছের তলায় বসে বসে গল্প করে। টুকরো কথা, টুকরো হাসি। দূরে কখনো বা মেঘে ঢাকা থাকে তুষার পাহাড়, কখনো বা ঝলমল করে ওঠে বেলাশেষের আলোয়!

হীরাবাই বললেন, ঐ পাহাড়ের দিকে শুধু তাকিয়ে বসে থাকতে আমার কি যে ভাল লাগে।

সুভদ্রা কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বলল, আমি তোমার কাছে না থাকলেও?

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে হীরাবাই বললেন, তুমি তো আমার কাছেই থাক সুভদ্রা। তোমাকে ছেড়ে আমার একার থাকার কোন কথাই ওঠে না।

বটে, আসুক আমার ঘরের মানুষ, তখন তোমার কাছে আমায় কেমন করে রাখতে পার তাই দেখব।

তোমার স্বামী কি রকম লোক সুভদ্রা?

আমার কাছে খুব শান্ত, অন্যের কাছে দুর্দান্ত।

আমি তাকে সবার ওপর শান্ত ব্যবহার করতে বলব।

সে যদি তোমার কথা না শোনে?

হীরাবাই বললেন, আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। একবার না বুঝলে আবার বোঝাব।

সুভদ্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরাবাইএর দিকে, শুনতে লাগল তাঁর প্রতিটি কথা। সুভদ্রা বুঝল, এ মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। হীরাবাই তার কাছে বসে থাকেন, কিন্তু তবুও থাকেন মনের জগতে বহুদূরে। আমাদের সংসার জীবন, তার সুখদুঃখ, পরিহাস রসিকতা এই নারীর মনের সীমানার ভেতর তার সবটুকু ছায়া ফেলতে পারে না।

সুভদ্রার মনে হয়, যে মেয়ে এতদিন ধর্মযাজিকা হয়ে কাটিয়েছে, তার হৃদয়, মন অনেক সুন্দর, অনেক বেশী পবিত্র। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আর এক চিন্তার উদয় হয়। কুমারবাহাদুরের জননীকে এক সাধু নাকি বলেছিলেন, যদি এমন রমণী এ বংশের বধূ হয়ে আসেন, যিনি কোনদিন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা করেন নি, তবে তিনিই এ বংশকে মুক্ত করতে পারবেন ভয়াবহ অভিশাপের হাত থেকে।

হীবাবাই কি হতে পারে না সেই শুদ্ধা নারী।

সুভদ্রা তাকিয়ে থাকে হীরাবাইএর দিকে। কি সুন্দর মুখশ্রী! চোখে লেগে আছে করুণার স্পর্শ। একটি ফুটন্ত ফুলের মত কমনীয়, লাবণ্যময়।

সেদিন রোজকার মত বেড়াতে বেরিয়ে ওরা এসে পড়ল এমন এক জায়গায়, যেখানে দুটি পাহাড়ের গিরিশিরার মাঝে ওরা দেখতে পেল একটি জীর্ণ গৃহ।

ওরা দুজনে দরজার কাছে এসে দেখল কাঠের দুটি জীর্ণ কপাট খোলা হয়ে আছে।

উঁকি দিতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিবাহিতা মেয়ে। সাধারণ

পাহাড়ী মেয়েদের মত তার সাজপোশাক। মনে হল, মেয়েটি অত্যন্ত অসুস্থ।

কোন কথা না বলে মেয়েটি দরজায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর থেকে এক শতছিন্ন আসন এনে বিছিয়ে দিল দরজার পাশে।

বসুন।

সুভদ্রা বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব সুস্থ নও।

ম্লান হেসে মেয়েটি বলল, আমি আজ ক'দিন জ্বরে ভুগছি।

হীরাবাই বললেন, তোমার বাড়িতে তোমাকে সেবা করার জন্যে আর কোন লোক নেই ?

আবার অতি ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে। বলল, আমার স্বামী রিক্শা চালাতেন। আজ এক মাস হল পড়ে গিয়ে বুকে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। ক'দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে নিজেই আবার পড়েছিলাম বিছানায়। ওকে আর দেখতে যেতে পারিনি। আজ মনটা কেমন করে উঠল। তাই বেরিয়েছিলাম হাসপাতালের পথে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সামনের চড়াইটুকু ভাঙতে না পেরে ফিরে এসেছি।

মেয়েটির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

হীরাবাই তার গায়ে হাত রেখে বললেন, কোন চিন্তা নেই তোমার বোন, আমরা হাসপাতাল থেকে তোমার স্বামীর খোঁজ নিয়ে আসব।

সুভদ্রা হীরাবাইকে বলল, তুমি ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা কর, আমি খবর নিয়ে ফিরে আসছি।

সুভদ্রা চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুটো শুকনা কমলালেবু হাতে করে এনে বলল, ওর কাছে যাব বলে কিনে এনে রেখেছিলাম, এ দুটি ওকে দয়া করে যদি দিয়ে আসেন।

সুভদ্রা বলল, ও দুটো তুমি রেখে দাও ঘরে, আমি কিছু টাটকা ফল ওর জন্য কিনে নিয়ে যাব।

মেয়েটি কেমন সংকুচিত হল। বলল, আপনি তাহলে একটু দাঁড়ান।

এই বলে মেয়েটি ঘরের ভেতর গিয়ে এক জোড়া রুপোর মোটা বালা নিয়ে এল। সুভদ্রার হাতে দিতে গিয়ে বলল, বহিনজী, আমার তো অন্য কিছু সম্বল নেই। আপনারা যখন এতই দয়া করলেন, তখন এই বালা জোড়াটা বাজারে বেচে যা হয়, তাই দিয়ে কিছু ফল কিনে নিয়ে যাবেন।

সুভদ্রা বালা জোড়া হাতে না নিয়ে বলল, এখন ওকথা ভাববার তোমার দরকার নেই। তুমি ও দুটো তুলে রেখে দাও, পরে তোমার কাজে লাগবে।

মেয়েটি বলল, আপনাদের কি বলব বহিনজী, এই দুটো বালা ও শখ করে আমাকে গড়িয়ে দিয়েছিল। আমি রাগ করে বলেছিলাম, এ গয়না আমি পরব না। তোমার এত কষ্টের পয়সায় কেনা গয়না আমার পরতে গেলে গায়ে বাজবে। ও কিন্তু শুনল না। একদিন পরিয়ে ছাড়ল।

একটু থেমে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর চেপে নিয়ে বলল, কি হবে বহিনজী এ গয়না। আমার মানুষটার চেয়ে কি গয়নাটা বড় হল। ও ভাল হয়ে গেলে আমার আর গয়নার দরকার কি।

সুভদ্রা ক্ষিপ্রগতিতে চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল, আর মেয়েটির হাত ধরে হীরাবাই ঢুকল ঘরের ভেতর।

অতি জীর্ণ দরিদ্রের সংসার। তাবই ভেতর মেয়েটি পরিষ্কার করে রেখেছে ঘরখানা।

এতক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছিল মেয়েটি, হীরাবাই তাকে বিছানায় বসিয়ে তার পাশে ঐ ছিন্ন আসনটার ওপর বসল।

তারপর একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি খেয়েছ তুমি আজ?

বড় দুঃখের হাসি হাসল মেয়েটি। ঘরে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হীরাবাই বলল, এখানে তোমার এমন কোন চেনাজানা লোক নেই, যাকে দিয়ে তুমি কিছু খাবার আনাতে পারতে?

না, বহিনজী। আর তাছাড়া ওর কাজ নেই, আমিও বিছানায় পড়ে, খাবার কেনার পয়সা কোথায় পাব। অনেক দুঃখেও ওব দেওয়া এ বালা দুটো বেচতে পারিনি। আজ ভাবলাম, কি হবে এ দুটো বালার মায়া করে।

হীরাবাই নিজের হাতের থেকে অভিরামের দেওয়া একটি বহু দামী আংটি খুলে নিয়ে বলল, দেখ একটা কথা বলব তোমাকে, রাখবে তমি সে কথা?

মেয়েটি নত হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, ভগবান আপনাদের আজ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনাদের সব কথাই আমাকে শুনতে হবে।

বলল হীরাবাই, এ বালাজোড়া তুমি কোনদিন বেচবে না, যত কষ্ট হোক তোমার। তার বদলে এই নাও আমার আংটি। এটি বেচলে অনেক টাকা পাবে তুমি। সৎভাবে থাকলে ঐ টাকায় তোমার অনেক দিন চলে যাবে।

প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চাইল না মেয়েটি। বলল, আমি আপনার কথা রাখব, বালাজোড়া না খেতে পেলেও বেচব না। তবে আপনার অত দামের আংটি নিয়ে কি করব আমি। আমাকে দয়া করেছেন আপনারা। প্রার্থনা করুন, যেন আমার ঘরের মানুষ ভাল হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তাহলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

হীরাবাই বললেন, আমি ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা জানাব, তবে তোমাকে এই আংটিটা দিতে পারলে আমার তৃপ্তির আর শেষ থাকবে না।

এই বলে মেয়েটির শীর্ণ আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিলেন।

মেয়েটি চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। তার বুকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে লাগল।

রাতে ঘুম আসছিল না হীরাবাইএর চোখে। একটা ছবি বার বার ভেসে আসছিল তাঁর চোখের সামনে। সে দরিদ্র মেয়েটির কি ভালবাসা। স্বামীর জন্যে নিজে অভুক্ত থেকেও দুটি কমলা সে সঞ্চয় করে রেখেছে। আবার তার

কতখানি আত্মমর্যাদাবোধ। আংটি নিতে চায় না সে। মানুষ দরিদ্র হলেই লোভী হয়ে যায় না।

কিন্তু আজ তার বিপদের দিনে তার হাতে সামান্য একটা আংটি তুলে দিতে পেরে নিজেকে বড় বেশী তৃপ্ত মনে হল হীরাবাইএর।

হীরাবাই কল্পনার রাজ্যে ভেসে গেলেন। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন, হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে এসেছে ঐ রিকশাওয়ালা। মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে তাকে তার স্ত্রী ঘরের ভেতর ধরে ধরে আনছে। কত সুখদুঃখের কথা বলছে তারা। শেষে লোকটি তার স্ত্রীকে বালাজোড়া আনতে বলল। বালা দুটি এলে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, কতদিন ভেবেছি, ঐ বালাজোড়াটা বুঝি বেচে ফেলেছিস্, আজ মনে হচ্ছে, তুই সত্যিই আমাকে ভালবাসিস বউ।

হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল হীরাবাইএর। যেন কি একটা কথা তাঁর সহসা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, অভিরামও তো একদিন তাকে একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন খুশী হয়েছিল তার মন, কিন্তু তার ভেতর যে কোন গুরুত্ব থাকতে পারে তা সে ভেবে উঠতে পারেনি সেদিন।

আজ তার চোখে সবকিছু কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাহলে অভিরাম কি ঐ রিক্শাচালক যেমন করে তার স্ত্রীর হাতে বালাজোড়া পরিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে ওর হাতেও আংটি পরিয়ে দিয়েছে।

কথাটা ভেবেই প্রথমে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন হীরাবাই। তারপর তাঁর মনে হল, কেমন যেন এক অজানা শিহরন তাঁর দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতি হীরাবাইএর জীবনে এই প্রথম। একটি ফুলের গন্ধে যে আবেশ, একটি উজ্জ্বল তুষারশৃঙ্গ দেখে যে মুগ্ধতা, তার সঙ্গে এই অনুভূতির কোন মিল নেই।

সেই অচেনা শিহরন বারবার ঢেউ তুলতে লাগল হীরাবাইএর দেহে মনে।

হীরাবাই বিছানায় উঠে বসলেন। আঙুলে, যেখানে অভিরাম আংটিটি পরম যত্নে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে অধীর আবেগে চুম্বন করলেন।

সহসা শ্রাবণধারার মত ঝরতে লাগল তাঁর চোখের জল। মনে হল, কত ভালবেসে অভিরাম তাঁকে ঐ আংটিটি সেদিন দিয়েছিলেন। তিনি তার কোন মর্যাদাই দেননি সেদিন, শুধু শুভানুধ্যায়ীর উপহার বলে খুশিতে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ সেদিনের ঐ সামান্য দান হীরাবাইয়ের কাছে অসামান্য হয়ে দেখা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হীরাবাই নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলেন। ঐ দরিদ্র মেয়েটি যদি তার স্বামীর দানকে শত দুঃখেও আগলে রাখতে পারে তাহলে তিনি কেন অভিরামের দেওয়া আংটি হাতছাড়া করলেন। দান করে তিনি দুঃখ পাননি ঠিক, বরং নিজের আত্মাকে তৃপ্ত মনে করেছিলেন, কিন্তু আংটির পরিবর্তে অন্যকিছু দিলেই এ দুঃখবোধের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেতে পারতেন।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হীরাবাই। পাশেই অভিরামের লাইব্রেরী ঘর। তার ওপারে শয়নকক্ষ।

ক্ষীণ একটা আলোর রেখা অভিরামের শোবার ঘর থেকে এসে পড়েছিল লাইব্রেরী ঘরের মেঝের ওপর। নীলাভ সেই আলোকচিহ্নকে হীরাবাইএর মনে হল পথ-রেখা। তিনি কি এক অদৃশ্য শক্তির অনিবার্য আকর্ষণে এগিয়ে চললেন পায়ে পায়ে। তিনি কি করছেন, তা তিনি সজ্ঞানে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তিনি এটুকু অনুভব করলেন, যাওয়ার গতি রোধ করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়।

শোবার ঘরে নীলাভ একটু আলো জ্বলছিল। অভিরাম জানালা খুলে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে।

নিস্তব্ধে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন হীরাবাই। অভিরাম মগ্ন হয়েই কিছু ভাবছিলেন, তিনি কারো উপস্থিতি জানতে পারলেন না।

জানালার বাইরে রাত নিঝুম। বহু দূরে, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অন্ধকার কোন সমতলের বুকে দেখা যাচ্ছিল এক আশ্চর্য ছবি। যেন একটি দীর্ঘ জমিনে কেউ লাল, হলুদ, নীল বিন্দু দিয়ে নকশার কাজ করেছে। অথবা ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকীরা লাল, নীল, হলুদ রঙের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ঝিকমিক করছে আলোর বিন্দুগুলো।

ঐ দিকে আনমনে তাকিয়েছিলেন অভিরাম। হয়ত ভাবছিলেন, জীবনের এমনি কোন একটি রোশনাইএর রাতের কথা। কাঁধের ওপর কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠে দাঁড়ালেন।

কে! হীরাবাই!

বিস্ময়ের অন্ত ছিল না অভিরামের।

আবেগজড়িত একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমি শুধু হীরাবাই নই, আমি তোমার হীরাবাই।

অভিরাম বললেন, আজ এই নিদ্রাহীন রাতে তুমি শুধু আমার হীরাবাই হয়ে এলে। বল, কি দিয়ে তোমাকে আমি বরণ করব?

জলভরা চোখে মাথা নেড়ে হীরাবাই বললেন, কিছু নয় অভিরাম, আমি কিছু চাই না, শুধু তুমি কাছে থাক।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। এক সময় অভিরাম বললেন, হীরাবাই, তোমার ঐ হাতখানা স্পর্শ করতে দেবে কি?

অভিরাম দুটি হাত প্রসারিত করলেন।

মনে মনে আমি আজ তোমাকে সবকিছুই দিয়েছি কুমার।

রাতের নীরব অন্ধকার দুটি হৃদয়ের নিবিড়তার সাক্ষী হয়ে রইল। ঐ দূরের আলোক চিত্রপট মনে হল অনেক কাছে সরে এসেছে।

বাতাস কি বয়ে আনল অজানা কোন ফুলের গন্ধ!

ভোরে উঠে সুভদ্রা দেখল ছোট্ট একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে।

এ বাড়িতে সুভদ্রারই হত প্রথম জাগরণ। এ তার হাসপাতালে থাকাকালীন অভ্যেস। এতদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে উঠে একে একে সবাইকে

জাগাত। ফুলে তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দিত সাজিয়ে। তারপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে ডাক দিয়ে জড়ো করত সবাইকে।

আজ একি হল! সুভদ্রা উঠে দেখল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় সব ওলটপালট হয়ে গেছে। তার বদলে কে যেন নতুন ফুল এনে সাজিয়ে রেখেছে ফুলদানি। চারদিক ঝকঝক তকতক করছে। সুভদ্রা দেখল চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলের ওপর রাখলেন হীরাবাই। একটি কাপে চা ঢেলে সুভদ্রার কাছে এনে বললেন, আজ সকালবেলার প্রথম চা তোমার।

সুভদ্রা বিস্ময়মেশা হাসি হেসে কাপটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে বলল, কি ব্যাপার বল তো, আজ সব উলটো ব্যবস্থা।

হেসে বললেন হীরাবাই, অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, এখন সামান্য কিছু কাজ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

তার মানে আমার হাতের অধিকারগুলো তুমি ছিনিয়ে নিতে চাও।

কপট ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিল সুভদ্রা।

বিব্রত হয়ে পড়লেন হীরাবাই। বললেন, আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি সুভদ্রা। তাহলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সুভদ্রা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ক্ষমা নয়, দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে। আর সে শাস্তি নিতে হবে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে দিয়ে হীরাবাইএর হাত ধরে কুমারবাহাদুরের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল সুভদ্রা।

এই দেখুন, দোষীকে ধরে এনেছি। শাস্তি দিন একে।

কি করেছে ও?

হেসে জিজ্ঞেস করলেন অভিরাম।

কি করেনি বলুন, আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে জাঁহাপনা।

কান্নার সুরে কথাগুলো বলল সুভদ্রা।

ও বুঝেছি, বললেন কুমার, এবার তাহলে তোমাকে সব কাজের ভার থেকে রেহাই দিয়ে ওর ওপর বেশী করে কাজের ভার চাপিয়ে দিতে হবে। তবেই শাস্তি ওর পুরোপুরি হবে।

হায়, মহারাজ, এতদিন পরে আপনার এই বিচার!

সুভদ্রার কথার ধরন দেখে হেসে উঠল সকলে।

এবার হীরাবাইএর হাত ধরে টানতে টানতে বাগানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল সুভদ্রা। মুখচোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হুঁ, যা ধরেছি ঠিক তাই। কাল রাতে তুমি নিশ্চয়ই রুটিনমাফিক কাজ কর নি।

কি করে জানলে তুমি?

তোমার চোখই বলছে।

আমার চোখ বলছে!

হাঁ, মহারানী, চোখে রঙ লাগলে আর কেউ না পারুক আমরা ঠিক ধরতে পারি।

সুভদ্রার কাছে কোন কিছু লুকোনো আর সম্ভব নয় জেনে হীরাবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুভদ্রা হীরাবাইএর হাত ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, খুব খুশী, তাই না ?

এ যে কি সুখ তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না সুভদ্রা।

বলতে বলতেই দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল হীরাবাইএর।

তা কাঁদো ভাই, এত খুশী ধরে রাখা কি যায়, কিছুটা উপচে তো পড়বেই।

ডাক এলো ঘরের ভেতর থেকে, বলি কি মন্ত্রণা চলছে ? এদিকে যে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

খুব গরম চা শরীরের পক্ষে হিতকর নয় বলেই ডাক্তারেরা অনেক সময় মন্তব্য করেন।

হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে হীরাবাইএর হাত ধরে আবার ঘরে এসে ঢুকলো সুভদ্রা !

চায়ের টেবিলেই কথা উঠল। কথাটা ওঠাল সুভদ্রা।

ক'দিন মুসৌরীর বাইরে হানিমুনে বেড়িয়ে আসা দরকার।

বিয়ের অনুষ্ঠান ? বললেন অভিরাম।

আপনি কি ঝামেলা বাড়াতে চান কুমারবাহাদুর। চিঠি দিয়ে ঘোষণা করে দিন আপনার প্রতিষ্ঠানের সব জায়গায় যে, আপনি ও লালসিয়া এস্টেটের বর্তমান মহারানী সবার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেন।

সেই ভাল সুভদ্রা। তুমি বুদ্ধিমতী। সুজন আর লক্ষ্মীবাইকে নিয়েই আমার যত ঝামেলা।

অমনি সুভদ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই আমি চললুম। পতি আর ননদিনীর নিন্দে শোনা কোন নারীর ধর্ম নয়।

হীরাবাই পরিস্থিতির লঘুত্ব বুঝতে না পেরে বললেন, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না সুভদ্রা। ওর হয়ে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

হুঁ, এখুনি এত টান।

হেসে অভিরামের দিকে ফিরে বলল, লালসিয়ার রানী সাহেবার পতিভক্তি অনুকরণযোগ্য।

প্রথমে কিছুতেই যেতে চায়নি সুভদ্রা হীরাবাই আর অভিরামের সঙ্গে, কিন্তু যখন সুভদ্রা না গেলে ওঁরাও যাবেন না বললেন, তখন বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল সুভদ্রাকে।

ওঁরা অতি সাধারণভাবে প্রায় কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হরিদ্বারের পথে।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। অবিরল তার প্রবাহ। কত যুগ আগে নেমে এসেছিল প্রথম স্রোতোধারা, তারপর অনাদি অনন্ত কালের উদ্দেশ্যে সে বয়ে চলেছে।

তার তীরে জেগে আছে হরিৎ অরণ্যলোক। নিকটে দূরে ধূমল নীল শৈলরেখা।

খরস্রোতা সুনীল জলধারায় আঙুল দিয়ে হিজিবিজি আলপনা কাটছিলেন হীরাবাই। পাশে বসেছিলেন অভিরাম। সুভদ্রা ইচ্ছে করেই দূরে সরে গেছে। সে বেড়াচ্ছিল গঙ্গাব ধারে শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। লাল ফুলে ছেয়ে গেছে তরু বীথিকায। গুনগুনিয়ে গান করছিল সুভদ্রা। স্পষ্ট কোন গান নয়, অর্থবহ কোন কথা নয়, তবু প্রাণের গোপন অন্তঃপুর থেকে না বলা কোন বাণী আভাসে ইংগিতে ছড়িয়ে পড়ছিল সুরের পাখায় ভর করে।

সন্ধ্যা নামল। অদূরে মনসাপর্বতের মন্দিরপথে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। প্রবল স্রোতোপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হীরাবাই আর অভিরামের মনে হল তারা যেন গঙ্গার বাঁধান বেদীর ওপর বসে নেই। একটি নৌকায় ভেসে চলেছে দুজনে। কোথায়, কতদূরে যে ভেসে যাচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তারা যেন অন্তহীন দূরেব যাত্রী।

একটা কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ভরা ডাল পেছন থেকে সামনে এগিয়ে ধরতেই দুজনে অনেক স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলো।

কি হচ্ছে তোমাদের, এমন করেও লোকে ভালবাসার স্রোতে ভাসে। কতক্ষণ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছি তা খেয়ালই নেই।

হীরাবাই বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে, মাফ কর সুভদ্রা।

সুভদ্রা অমনি বলল, এবার নিজের জন্যেই শুধু মাফ চাইলে! আর কারো জন্যে না?

হাসলেন অভিরাম। হীরাবাই বললেন, এখন যে আমরা আর দু'জন নেই সুভদ্রা, এক হয়ে গেছি।

সুভদ্রা অমনি হীরাবাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, এরই ভেতর এত বুদ্ধি হয়েছে তোমার।

ওরা ব্রীজটা পেরিয়ে এপারে এলো।

সন্ধ্যার আঁধারে এপারে বাঁধান ঘাটের ধাবে ধাবে চলেছে অন্য এক খেলা। ফুলে ভরা ছোট ছোট পাতার নৌকোয় দীপ জ্বলে ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার স্রোতে। ভাসতে ভাসতে এমনি শত শত আলোর নৌকো চলে যাচ্ছে বহুদূরে। সন্ধ্যার গঙ্গাবক্ষে যেন যাত্রীরা পরিয়ে দিচ্ছে গ্রন্থিবিহীন এক আলোর মালা।

ওরা তিনজনে তিনটি ফুলের নৌকো হাতে নিয়ে নেমে এলো গঙ্গার ঘাটে। সাদা লাল ফুলের মাঝখানে জ্বালিয়ে দিল প্রদীপ। তারপর একে একে এসে দাঁড়াল গঙ্গার জলে।

প্রথমে ভাসালেন অভিরাম। মনে মনে বললেন, হে আমার পূর্বপুরুষগণ, তোমাদের প্রাণধারা আমি বহন করে নিয়ে চলেছি। এই গঙ্গার প্রবাহের মত সে ধারা সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে। তোমরা তৃপ্ত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ কর। এই গঙ্গার প্রবাহের মত যেন আমার মধ্যে বহমান প্রাণধারাকে পবিত্র রাখতে পারি।

অভিরামের নৌকোকে অনুসরণ করল হীরাবাইএর আলোর নৌকো।

হীরাবাই মনে মনে বললেন, হে প্রভু, আমার ভালবাসা যেন গঙ্গার ধারার মত বেগবতী হয়। আমার ভালবাসা যেন সংসারের অন্ধকারের ভেতর ঐ আলোর মত পথ দেখিয়ে চলতে পারে।

সবশেষে ভাসাল সুভদ্রা। সে দুটি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল, হে শঙ্কর, অভিরাম আর হীরাবাইকে সুখী কর। আমার মন যেন কোনদিন ওদের সুখে ব্যথা না পায়।

সুভদ্রা নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়েই গঙ্গায় ঢেউ তুলল। অমনি তার ফুলের নৌকো জলের ঘূর্ণির ভেতর পড়ে তলিয়ে গেল। ততক্ষণে ওদের দুটি নৌকো পাশাপাশি বহুদূর চলে গেছে।

কি হল সুভদ্রা, নৌকো ডোবালে কেন ?

অবাক হয়ে বললেন অভিরাম।

ভাগ্য, বলল সুভদ্রা, জল পান করে কেউ শীতল হয়, আবার জলের তলায় আশ্রয় নিয়েও কেউ শীতল হয়। দ্বিতীয় পথটাই না হয় বেছে নিলাম।

তারপর হাসিতে ভরে দিয়ে হীরাবাইএর হাত ধরে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, এখন কথার মালা না গেঁথে চল যাই রাতের আস্তানায়। আমার এমন ক্ষিদে পেয়েছে, হয়তো কিছু না পেলে তোমাকেই খেয়ে ফেলব।

এখানে সপ্তধারা। গঙ্গা সাতটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে সাতটি তপোবনের সৃষ্টি করেছে। তারপর নীলধারা হরিদ্বারের পথে একস্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। বড় প্রশান্ত আর নির্জন স্থান এটি। অগস্ত্য প্রভৃতি সপ্ত ঋষি এক একটি তপোবনে বসে তপস্যা করতেন। তাঁরা তাঁদের পাশেই পেতেন গঙ্গার স্বচ্ছ প্রবাহিত ধারা।

মন্দির রয়েছে সপ্ত ঋষির। পুষ্পিত বৃক্ষে ঘেরা আশ্রম। ওরা আশ্রম প্রদক্ষিণ করে এসে দাঁড়াল গঙ্গার কূলে। এখন গঙ্গা বহুদূর প্রসারিত চর ফেলে শীর্ণ কায়ায় বয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা সাদা পলির ওপর ঘুরে বেড়াল কতক্ষণ।

সুভদ্রা বলল, আচ্ছা, কুমারবাহাদুর, সত্যিই কি সপ্তঋষি কোনদিন এখানে বর্তমান ছিলেন ?

অভিরাম বললেন, অনেক প্রশ্নের জবাব মন থেকে পেতে হয় সুভদ্রা। সন তারিখ মেলান ইতিহাসের পাতায় তার হদিস পাওয়া যায় না।

একটু থেমে আবার বললেন, কালে কালে কত যাত্রী এসেছেন এখানে। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করেছেন এই সপ্তঋষির অস্তিত্বে। আজ আমরা কেমন করে অবিশ্বাস করি বল।

হীরাবাই অভিরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বলতে চাইছ, বিজ্ঞানের, ইতিহাসের সত্যমিথ্যার হিসেব এখানে না করে শুধু বিশ্বাস করে যেতে।

হাঁ, ঠিক তাই। সব বিষয়ে বিশ্বাস আর নির্ভরতা থাকলে, অনেক দুঃখ, অনেক সংশয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়।

হীরাবাই একবার তাকালেন ঐ ঋষিশূন্য সপ্তধারা বেষ্টিত সাতটি তপোবনের দিকে। তারপর বললেন, আমি ওঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি অভিরাম।

এর পরদিন গাড়ি এসে দাঁড়াল হৃষিকেশের ঝুলন্ত সেতু লছমনঝোলার কাছে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে সেতুর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হতে লাগল। নীচে খরস্রোতা গঙ্গার ধারা। বিরাট আকারের পাথরের স্তূপ জেগে আছে গঙ্গার বুকে। তাদের পাশ কাটিয়ে বয়ে আসছে গঙ্গা। শিলাস্তূপের সঙ্গে আঘাত লেগে সৃষ্টি হচ্ছে অজস্র ফেনার ফুল।

ঐ দেখ দেখ, নীচে জলের ওপর শত শত মাছের ঝাঁক ভেসে উঠেছে।

হীরাবাই সোল্লাসে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন। অমনি কাছে এসে দাঁড়াল একটি ছেলে। সে আটার গোলা বিক্রি করে। ওরা তার কাছ থেকে কিছু কিছু খাবার কিনে ছুড়ে ফেলতে লাগল ব্রীজের তলায় গঙ্গার জলে।

বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গেল। মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়ে এসে খাবার খেতে লাগল। খাবার শেষ হলে ওরা জলের খানিকটা তলায় কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে, তারপর আবার ওপর থেকে খাবার পড়লে ছুটোছুটি লুফোলুফি শুরু হয়ে যায়।

যতক্ষণ না ঐ ছেলেটার কাছে খাবারগুলো ফুরোলো ততক্ষণ ওরা কেউই নড়ল না ব্রীজের ওপর থেকে।

তারপর আবার শুরু হল যাত্রা। ব্রীজ পেরিয়ে পাহাড়ের কোলের রাস্তা ধরে ওরা চলতে লাগল গীতাভবনের দিকে। ছায়াচ্ছন্ন পথ। গঙ্গা বয়ে চলেছে। পথের ধারে ধারে মন্দির।

কুমার অভিরাম ভুলে গেছেন তাঁর ঐশ্বর্যের কথা। অতি সাধারণ একটি মানুষ জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে। পায়ে চলার পথে পথে ছড়িয়ে আছে কত আনন্দ। পাখি একটা ডেকে উঠল। সুভদ্রা আর হীরাবাই গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

ঐ যে লেজটা দুলছে !

কই, কোথায় কোথায় ?

তোমাদের চেঁচামেচিতে না পাখিটা উড়ে যায়।

এমনি অজস্র কথায় ভরে গেল প্রভাত বেলা।

কে বলল, ঐ পথ বদরীনারায়ণের পথ।

কত ছবি ভেসে উঠল ওদের মনে।

ওরা একটা গাছের তলায় বসে আগামী কোন এক সময় কেদারনাথ, বদরীনাথ যাত্রার প্ল্যান করতে লেগে গেল।

যদি যেতে হয় পায়ে হেঁটেই যাওয়া ভাল, বললেন হীরাবাই।

অভিরাম বললেন, একেবারে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী পর্যন্ত যাত্রা।

হীরাবাই বললেন, পিঠের ওপর বোঝা ফেলে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে

চলেছি আমরা। রাতে বিশ্রাম করছি চটিতে। এ সুখের কি তুলনা আছে!

অভিরাম অমনি বললেন, আমাদের যাত্রাপথে দেখতে দেখতে যাচ্ছি কত পর্বত, কত স্বচ্ছ স্রোতোধারা। লোকে বলে, যাত্রাপথে থেমে থাকতে নেই। আমরা কিন্তু থামব, দেখব, আবার চলব।

নীরবে বসেছিল সুভদ্রা। এতক্ষণ অন্য দুজনের লক্ষ্য পড়ল তার দিকে।

অভিরাম বললেন, তুমি যে বড় চুপচাপ বসে আছ, তোমার মতামত কিছু বল?

হীরাবাই বললেন, যে শেষে কথা বলে অনেক সময় সে-ই বলে সেরা কথা।

সুভদ্রা বলল, তোমরা কেন কথা বন্ধ করলে হীরাবাই। এতক্ষণ কি মধুর স্বপ্নই না আমি দেখছিলাম! তোমরা চলেছ, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে। চলেছ তুষার রাজ্যে। দুঃখের যাত্রা শেষে তোমাদের চোখের সামনে খুলে গেল তীর্থমন্দিরের দ্বার। প্রদীপ জ্বলছে। বদরীবিশালের পূত পবিত্র প্রদীপ-শিখা।

অভিরাম বললেন, আমি দেখছি, তোমরা দুজনে নত হয়ে নমস্কার করছ তীর্থদেবতাকে।

সুভদ্রার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, দূর থেকেই আমাকে নমস্কার জানাতে হবে কুমারবাহাদুর।

হীরাবাই অমনি বলে উঠলেন, তুমি তীর্থযাত্রায় যাবে না আমাদের সঙ্গে?

সুভদ্রার হাসি আরও ম্লান, কেন আর আমার দুঃখকে বাড়াচ্ছ বোন। খাঁচার পাখি ওড়ার সুযোগ কতটুকু পায় বল? যেটুকু পায় সেটুকু শুধু বাড়িয়ে তোলে তার ব্যথা।

অভিরাম বুঝলেন, এ আনন্দের প্রসঙ্গটি সুখের চেয়ে দুঃখই আনল বেশী করে।

তিনি বললেন, দূরের চিন্তা না করে চল এখন কাছের চিন্তা করা যাক্। বেলা ক্রমেই বাড়ছে। গীতাভবন দেখে আমাদের ফিরতে হবে হরিদ্বারে।

গীতাভবনে ঢোকার আগে ওরা দেখল কালিকমলীবাবার আশ্রমে সাধুরা ভাণ্ডারা নিয়ে যাচ্ছেন।

সাধুসন্তেরা ঈশ্বরচিন্তা করেন, তাই কালিকমলীবাবার মাধ্যমে ঈশ্বরও তাঁর ভক্তদের আহার জুগিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যবস্থা বহুকাল থেকে চলে আসছে।

ওরা ঢুকল গীতাভবনে। মহাভারতের বহু ঘটনা চিত্রিত হয়ে আছে গীতাভবনের প্রাচীর-পটে।

অভিরাম এক এক করে সব কটি ঘটনা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন হীরাবাইকে।

তারপর তারা এসে দাঁড়াল মন্দিরের ভেতর। ঘণ্টা দুলছে। যাত্রীরা এসে দুলিয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা। ঢং ঢং আওয়াজ উঠছে তার থেকে।

ওরা মনে মনে শুভ কামনা জানিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

বাতাস বইছে। মন্দিরের উদ্যান-বাটিকা থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। পূজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। স্তোত্রপাঠ চলেছে। যাত্রীরা আসা

যাওয়া করছে। ভেতরেই যাত্রীনিবাস। সেখানে দু'দিনের আস্তানা বেঁধেছে দূরদূরান্তের যাত্রীরা !

ওরা মন্দিরের সামনে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। মনে মনে মগ্ন হয়ে রইল প্রার্থনায়।

সুভদ্রা মনে মনে বলল, প্রভু, মঙ্গল কর সকলের। দুঃখতাপে কাতর হৃদয়ে দুঃখ সহ্য করার শক্তি দাও।

এরপর গঙ্গা পার হয়ে ওরা এসে উঠল যাত্রিবাহী বাসে। অনভ্যাসের ফলে, অভিরামের পদে পদে ঘটল বিঘ্ন, কিন্তু হীরাবাই আর সুভদ্রার সঙ্গে তাকে যেন নবজন্ম দান করল।

অবশেষে ফুরিয়ে এল আনন্দের কটি দিন।

ফেরার আগের দিন সন্ধ্যায় হর-কি-পেড়ির পাশ দিয়ে ওরা চলে এলো গঙ্গার নির্জন এক প্রান্তে। এখানে কতকগুলো গাছ জটলা করে আছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা।

চেঁচিয়ে উঠল সুভদ্রা, আরে শীগ্‌গির এসো এদিকে। দেখে যাও কত নুড়ি পড়ে আছে এখানে।

হীরাবাইএর হাত ধরে ছুটলেন অভিরাম।

রাশি রাশি ছোট বড় নানা আকারের মসৃণ নুড়ি। কোনটি নীল, কোনটি বেগুনী, সাদা, লাল, সবুজ, বিচিত্র সব রঙের বাহার।

হীরাবাই কুড়ুতে যাচ্ছিল। সুভদ্রা বাধা দিয়ে বলল, আমি আবিষ্কার করেছি, সুতরাং জিনিসগুলো আমার দখলে। এক পা এগিয়েছ কি হাতাহাতি হয়ে যাবে।

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলেন অভিরাম আর হীরাবাই। সুভদ্রা কুড়িয়ে চলল নুড়ি।

এক সময় কোঁচড় ভরে নিয়ে এসে বলল, দয়া করে দীন দাসীর এই ক্ষুদ্র কটি উপহার গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন মহারানী।

হীরাবাই হেসে বললেন, তোমার এই দানের সবটুকু ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যে কটি না নিলে তুমি দুঃখ পাবে তাই নিলাম।

এই বলে ভাল ভাল কটি নুড়ি সুভদ্রার আঁচল থেকে বেছে নিল।

অভিরাম বললেন, দেখ, দেখ ঈশ্বরের কি আশ্চর্য সৃষ্টি। পাহাড়কে চূর্ণ করে প্রবাহিত হচ্ছে যে নদী, তারই তরঙ্গে আবর্তিত শিলাখণ্ডের কি বিচিত্র পরিণতি। এরা কোথায় পেল এত বিভিন্ন রং, এমন বিভিন্ন আকার।

ওরা এসে বসল গঙ্গার কূলে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। দূরে নীল পাহাড়ের আভাস আবছা হয়ে আসছে। বনের পাতা কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে গেল। গঙ্গা ছলছল কলকল শব্দে বয়ে চলেছে।

হীরাবাই বললেন, সুভদ্রা ভালবেসে আমাকে যা দিলে, তাই আমি তোমাকে দিতে চাই।

এই বলে নুড়িগুলো তুলে দিল অভিরামের হাতে।

ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিছু সময় টুকরো টুকরো কথা বলল। গুনগুন করে গান গাইল সুভদ্রা। ওরা তাকে অনুরোধ করলো গলা ছেড়ে গাইবার। সুভদ্রা গাইল, ওরা শুনলো। হীরাবাইএর হাতখানা কখন নিজের হাতের ভেতর তুলে নিল অভিরাম। হাতের অন্ধকারে সুভদ্রার গান শরতের সন্ধ্যায় ঝরা-শিশিরের কান্না বলে মনে হল।

তুমি!

কেন, এত তাড়াতাড়ি আমাকে বুঝি আশা করনি?

সুভদ্রা ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, তা করব না কেন। তবে অভ্যর্থনাটা উলটো হয়ে গেল আর কি! আমার জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালে।

শোন!

সুজনের গলার স্বরে কোন রকম ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল বলে মনে হল না সুভদ্রার। তবু মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে সে ফিরে দাঁড়াল।

কুমারমহলে গিয়ে শুনলাম, অভিরাম ক'দিন হল কোথায় গেছে কেউ জানে না। তোমার হদিসও কেউ দিতে পারল না। ভাবলাম, অসুখের কথা তুমি চিঠিতে লিখেছিলে, হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে হাসপাতালে গেছ।

সুভদ্রা বলল, হাসপাতালে যাওনি আমার খোঁজে?

আমার ভাগ্য ভাল তার আগেই তুমি এসে গেলে।

হাসতে লাগল সুজন সিং। হাসিটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হল। হাসি থামলে যেন অতি ব্যস্ত হয়েছে এমনি ভাবে বলে উঠল, আরে চল চল, তোমার অর্ডারমত কত রকমের বোম্বে প্রিণ্ট এনেছি দেখবে চল।

ঘরের ভেতর রাশীকৃত কিউরিও, প্রিণ্ট শাড়ি প্রভৃতি এলোমেলো ছড়ান পড়ে আছে। সুভদ্রাকে নিয়ে সুজন সিং ঢুকল সেই ঘরে।

সারা বোম্বে কিনে আনলে নাকি? সুভদ্রা বলে উঠল।

যাইনি তো কম দিন। আর সঙ্গে যিনি গেছেন তিনি তাঁর ভাবীজীর জন্যে দোকান উজাড় করে সওদা করেছেন।

লক্ষ্মীবাই কোথায়?

এতক্ষণ লক্ষ্মীবাইএর খোঁজ নিতে পারেনি সুভদ্রা মনের উত্তেজনায়।

সুজন উত্তর করল, ওর কথা আর বল না। বায়না ধরল প্লেন ছেড়ে ট্রেনে ফিরবে। এখন এত গরমের জার্নি সইবে কেন। শয্যা নিয়েছে।

সুভদ্রা ত্রস্ত পায়ে যাচ্ছিল সেদিকে। হাতখানা তার ধরে ফেলল সুজন সিং।

অত ব্যস্ত হয়ো না। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। ওকে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে দাও।

একটু থেমেই বলল, আচ্ছা সুভদ্রা, কেম্‌টি ফল্‌স্‌-এ স্নানের জন্যে গেলে কেমন হয়? এ কদিনে গায়ে যে ময়লা জমেছে ঐ ওপর থেকে ঝরে পড়া জল

ছাড়া ওকে দূর করা যাবে না।

এতদূর যাবে কি করে? তাছাড়া অবেলায়।

একবার কুমারমহলে ফোন করে দিলওয়ারকে গাড়ি নিয়ে আসতে বললে হয়। এখন লোকজন থাকবে না ঝরনার ধারে, সেই তো ভাল।

সুভদ্রা ভাবল এখুনি সুজন ফোন করলেই অভিরাম এসে ফোন ধরবেন। তখন সুজনের সন্দেহটা আরও ঘনিয়ে উঠবে। তাই সে বলল, তুমি ক্লান্ত, এখন জল দাও চোখেমুখে, আমিই ফোন করে ডেকে নিচ্ছি।

সুজন সিং গৃহান্তরে যাবার ছলনা করে দাঁড়িয়ে রইল আড়ালে। সুভদ্রা তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে লেগে গেল।

আমি কথা বলছি।

ওপার থেকে ভেসে এল, কি ব্যাপার?

ও এসে গেছে। দিলওয়ারকে দিয়ে গাড়িখানা এখুনি পাঠিয়ে দিন। কেমটি যাবার ইচ্ছে হয়েছে।

ওপারের জিজ্ঞাসা, ওর আসার তো কোন খবর ছিল না?

সে পরের কথা। এখন যা বলছি দয়া করে দেরি না করে তাই করুন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু হাসল সুজন সিং। কঠিন আর হিংস্র হয়ে উঠল তার মুখখানা।

কেমটি ফলস্ থেকে শেষ বাসখানা চলে গেছে যাত্রী নিয়ে। এখন বাস স্ট্যাণ্ড সম্পূর্ণ নির্জন। দুটি পাশাপাশি চালাঘর শুধু দাঁড়িয়ে আছে। এ দুটিতে থাকে শরবত আর চায়ের ব্যবস্থা। সারাদিন যাত্রীরা এখান থেকে প্রয়োজন মত চা আর শরবত কেনে। শেষ বাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারেরাও জিনিসপত্র ঘাড়ে করে দূর গাঁয়ের উদ্দেশ্যে চলে যায়। তখন চালাঘর দুটি রাতের কোন কোন জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

সুজন সিংএর কার-খানা এসে থামল নির্জন বাস স্ট্যাণ্ডে।

দিলওয়ার সিং খুলে দিল দরজা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সুভদ্রা আর সুজন সিং। ওরা এবার চালাঘর দুটোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। ড্রাইভার দিলওয়ার সিং বসে রইল পাথরের মূর্তির মত গাড়ির ভেতরে। ওরা দুজনে সাবধানে নেমে চলল নীচের উপত্যকায়।

পাকদণ্ডীর সংকীর্ণ পথ। নীচে নানা ধরনের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ওপরের বাস স্ট্যাণ্ড থেকে অনেক নীচে নেমে এসে একেবারে প্রপাতের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট বিরাট কয়েকটি শিলাস্তূপ এলোমেলো-ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর তারই ওপর বহু উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝরনার জলধারা।

বেলা পড়ে এসেছিল। তার ওপর এত নীচে নেমে এসে সুভদ্রার মনে হল যেন সে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারের রাজ্যে নেমে এসেছে।

উপত্যকার ভেতর ঝোপঝাড়, গাছগাছালির মাথা থেকে মুছে গেছে শেষ

আলোর রেশ। একটা থমথমে অন্ধকার শুধু রাতের জন্যে বাসা তৈরি করছিল।

ছমছম করে উঠল সুভদ্রার সারা দেহ। সে তাকিয়েছিল ঝর্ণার দিকে। সুজন সিংয়ের গলা শোনা গেল, এসো এখানে।

সুজন বসেছিল একটা শিলার ওপর। সুভদ্রা মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল সেইদিকে।

বস।

অতি দূর থেকে ভেসে আসা অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে মনে হল সুভদ্রার।

সে ধীরে ধীরে বসল শিলাস্তূপের ওপর, সুজনের পাশে।

একটা প্রশ্নের জবাব দেবে আমার ?

সুভদ্রা সুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানতে চাও বল।

তুমি কি আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে ?

এ কথা কেন ? পালটা প্রশ্ন করল সুভদ্রা।

হিংস্র একটা জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সুজন সিং, জবাব দাও।

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল সুজন সিংএর ক্রুদ্ধ গলার স্বর।

সুভদ্রা তাকাল সুজন সিংএর দিকে। স্পষ্ট করে বলল, কি বললে খুশী হবে তুমি ?

আমি খুশী হতে চাই না, সত্যকে জানতে চাই।

তাহলে জেনে রেখ, ভালবেসে তোমার কাছে আমি আমার সবকিছু সমর্পণ করিনি।

তা আমি জানতাম, আর এও জানতাম অভিরাম তোমাকে গ্রাস করেছে।

চুপ কর মিথ্যাবাদী।

ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেল সুভদ্রার সারা দেহ।

হা হা হা হা করে অট্টহাসি হাসল সুজন সিং।

ভয়াবহ একটা প্রতিধ্বনি সন্ধ্যার পাহাড়ে লেগে কত বিচিত্র বিকট আওয়াজ তুলে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

হাসি থামলে সুজন সিং উচ্চারণ করল কথাটা, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী। আমি মিথ্যাবাদী! বিয়ের আগে সেবা করতে এসে অভিরামের হাতের ভেতর হাত রেখে কে বসে থাকত ? স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়ে কে কাটায় সারা দিনরাত রাজকুমারের বাড়িতে ? কে ঘুরে বেড়ায় পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ লুটবার জন্য। দাও এর উত্তর, দাও আমার কথার জবাব।

উন্মাদের মত চেঁচাতে লাগল সুজন সিং।

সুভদ্রা বলল, আমি তোমার সব কথারই জবাব দিতে পারতাম, কিন্তু একটি কথারও জবাব আর বের করতে পারবে না আমার মুখ থেকে।

এগিয়ে আসছে সুজন সিংএর দুটো হাত। সাঁড়াশীর মত ঐ হাত দুটো চেপে ধরল সুভদ্রার গলা।

হয় তুমি জবাব দেবে, নাহলে চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব তোমার স্বর।

দম বন্ধ হয়ে আসছে সুভদ্রার। চোখের সামনে বহু ওপর থেকে ঝরে পড়া ঝরনাটাকে মনে হচ্ছে, একটা অতি হিংস্র চলমান অজগর। সে যেন ছুটে আসছে তাকে গ্রাস করতে।

চীৎকার করতে গিয়েও কোন আওয়াজ বেরোল না সুভদ্রার গলা দিয়ে।

সহসা অতি উজ্জ্বল একটা আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। চমকে ছিটকে দাঁড়াল সুজন সিং। অচৈতন্য অবস্থায় শিলাস্তূপের ওপর গড়িয়ে পড়ল সুভদ্রা।

আলো যে ফেলেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তীব্র আলোর একটা বৃত্ত শুধু রচিত হয়েছে চোখের সামনে। সুজন সিংএর সমস্ত পাপ ঐ আলোর সামনে যেন স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। সে শুধু অসহায়ের মত এই অভাবনীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে রইল। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সমস্ত শরীর।

বজ্রগম্ভীর গলা শোনা গেল ড্রাইভার দিলওয়ার সিংএর, সাহাব, টর্চটা হাতে নাও, মাইজীকে আগে দেখতে দাও আমাকে।

মন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এলো সুজন সিং। দিলওয়ারের হাত থেকে টর্চটা নিজের হাতে নিয়ে তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দিলওয়ার সিং ঝরনার থেকে জল তুলে ছিটিয়ে দিতে লাগল সুভদ্রার মুখে চোখে। কিছুক্ষণের ভেতর জ্ঞান ফিরে এল। উঠে বসার চেষ্টা করতেই দিলওয়ার তাকে তেমনি শুইয়ে রেখে দিল। ঠিক করে দিতে লাগল অসংবৃত বেশবাস?

এবার চেঁচিয়ে উঠল সুজন সিং, বেল্লিক কোথাকার, জেনানার গায়ে হাত দিতে সরম হচ্ছে না?

কথার উত্তর দিতে ফিরে তাকাল না দিলওয়ার সিং। তেমনি মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিতে দিতেই বলল, মায়ের গায়ে হাত দিলে ইজ্জৎ যায় না সাব।

এরপর সুজন সিং চলল আগে আগে টর্চ হাতে নিয়ে। সুভদ্রাকে বহন করে দিলওয়ার সিং দুর্গম চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

গাড়ি চলছে। পেছনের সিটে অতি ক্লান্ত অবস্থায় এলিয়ে পড়ে আছে সুভদ্রা। তারই পাশে বসে আছে সুজন সিং। কারো মুখে কোন কথা নেই। সুভদ্রা আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। সুজন সিং অস্থির মানসিকতার ভেতর কত কথা ভেবে চলেছে।

দিলওয়ারের গলা শোনা গেল, মাইজীর মত জেনানাকে আপনি চিনতে পারলেন না সাব। এ তল্লাটে এমন জেনানা মিলবে না।

খেঁকিয়ে উঠল সুজন সিং, তোমাদের কুমারসাব যাকে নিয়ে খুশী থাকেন, তোমরা তো তার ওপর খুশী থাকবেই।

এমন কথা বলবেন না সাব। মাইজীকে আমাদের কুমারসাব বহিনের মত নজর করেন।

চুপ কর দিলওয়ার।

একটু থেমে আবার বলল, আমিই তোমাকে কুমারবাহাদুরের চাকরিতে বহাল করেছিলাম, মনে আছে ?

আছে সাব। আর তাইতো দিলওয়ারের হাত থেকে আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। দোসরা আদমী হলে এই কেমুটি ফলস্এ তাকে রেখে দিয়ে যেতাম।

সুজন সিং কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। সে জানে, দিলওয়ার কম কথা বলে, কিন্তু যেটুকু বলে সম্পূর্ণ দেহ আর মনের জোর নিয়েই বলে।

সুজন সিং এবার হতাশার সুর গলায় ঢেলে বলল, আচ্ছা দিলওয়ার, তুমি শুধু অন্যের দিকটাই দেখছ, একবার ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা। স্বামী বিদেশে গেলে তার জেনানা যদি অন্য পুরুষের কাছে রোজ যাওয়া আসা করে তাহলে তাকে কি সতী বলব ? আর যদি এটা তোমার নিজের বাড়ির ব্যাপার হত, তাহলে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তুমি কি পারতে তাকে নিয়ে ঘর করতে ?

গাড়িটা একটা বাঁক নিল। হেড লাইটটা ঘুরে এসে পড়ল নতুন রাস্তার ওপর। অন্ধকার দূরে সরে গেল।

দিলওয়ার বলল, বাবুজী আপনার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী। আমি দুনিয়ার মানুষকে অনেক দেখেছি। একটা কথা বলি শুনুন।

আমার গুরুজী একসময় একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। কতকগুলো পহেলবান লোক কোদাল আর ঝাড়ু নিয়ে অন্ধকারকে সাফ করে ফেলবে বলে মনস্থ করল। তারা যত কোদাল দিয়ে অন্ধকারকে দূরে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, যত ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে ফেলার চেষ্টা করে তত অন্ধকার জমে যায়। শেষে একটি লোক তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাণ্ড দেখে বলল, ওরে মূর্খ, একটা আলো জেবলে দে, এখুনি অন্ধকারটা সাফ হয়ে যাবে।

একটু থেমে বলল দিলওয়ার, সন্দেহের হাতিয়ার দিয়ে মনের আঁধারকে দূর করা যায় না বাবুসাব, একটু বিশ্বাস, একটু ভরসার আলো জেবলে দেখতে হয়।

চুপ করে বসে রইল সুজন সিং। মুখে তার কথা নেই। মনে হল হয়ত কোথাও তার ভুল হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে এলো, দুটি যুবকযুবতী যদি একই সঙ্গে বাইরে বাইরে পরস্পরের সান্নিধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কি তারা ঠিক থাকতে পারে। তার ওপর যদি তারা কোন এক সময় প্রেমসূত্রে আবদ্ধ থাকে।

সুজনকে চুপ করে থাকতে দেখে দিলওয়ার সিংই এবার কথা বলল, জানি সাব, এ ড্রাইভারের কথায় আপনার বিশ্বাস হবে না। তবে শুনে রাখুন, মাইজী কুমারবাহাদুরের কোঠীতে এক মেমসাবের সেবা করতে যেতেন, আর তাঁকে সুস্থ করে তাঁর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

মেমসাব। সুজন সিং যেন আকাশ থেকে পড়ল।

হাঁ, কুমারবাহাদুর আর মাইজী ছাড়া সেকথা অন্য কেউ জানে না। আমি গাড়ি চালাই, তাই আমিও জানি কথাটা। এই যে কিছুদিন আগে ট্রেন

অ্যাকসিডেণ্ট হল দেরাদুন ইস্টিশানে, সেই ট্রেনে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে এক নান দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যান। আমি তাঁদের গাড়িতে করে গোপনে নিয়ে আসি কুমারবাহাদুরের আস্তানায়। আমার সাহেবের কোন চোট না লাগলেও খ্রীষ্টান নানটি মাথায় আঘাত লেগে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। ডাক্তার গর্গ তাঁর অপারেশন করেন। এখন সুস্থ হয়েছেন তিনি, তবে কোথা থেকে এসেছেন, কি নাম তাঁর, সব ভুলে গেছেন। কিছু আর মনে করতে পারেন না।

একটু থেমে বলল, আপনাকে সাব এত কথা বলতাম না, তবে মাইজীর ওপর আপনার মিছে সন্দেহটা দূর করবার জন্য আমাকে এসব কথা বলতে হল।

সুজন চঞ্চল হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য একটা উজ্জ্বল আলো এসে সুভদ্রা সম্বন্ধে তার সন্দেহের অন্ধকারটুকু মুছে দিয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ঘনিয়ে উঠল মেঘ।

এই নতুন খ্রীষ্টান মেয়েটি তার কাল হয়ে এল। নানটি যে তার পূর্বস্মৃতি হারিয়েছে এ কথা বুঝতে তার বাকী রইল না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে কিইবা করতে পারে। রাগ হল তার লক্ষ্মীবাইএর ওপর। এত দিনের ভেতর এই মেয়েটা পারল না অভিরামের মত একটা চঞ্চল মনের মানুষকে জয় করে নিতে। সব মাটি, সব মাটি। এই মুহূর্তে তার নিজের মাথার চুলগুলো দুঃখে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। না, ম্যানেজার হবার কোন আশাভরসাই আর তাব রইল না। যেখানে লক্ষ্মীবাইএর আকর্ষণ থাকবে না, সেখানে সুজন সিং তো নো হোয়ার।

মনে মনে হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করল। তারপর হতাশার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সুজন সিংএর বুক ঠেলে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সুজন সিংএর আস্তানায়। সুভদ্রা ততক্ষণে একটু সুস্থ বোধ করছিল। সুজন তাকে ধরে ঘরেব ভেতর নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, দিলওয়ার, দেখো কথাটা যেন রাষ্ট্র না হয়।

দিলওয়ার সিং হেসে বলল, হুজৌর, এ কথা রাষ্ট্র করে দিলে যে আমার মাইজীর অপমান, দিলওয়ার এমন বুড়বক বনবে না।

সুজন ক্ষমা চেয়ে নিল সুভদ্রার কাছে। অনুতপ্ত স্বামী যেমন করে করুণ আবেদন জানায়। সুভদ্রা বলল, সবই যখন জেনেছ, তখন আমার দিক থেকে আর কোন ক্ষোভ নেই। শুধু জেনে রেখ, সুভদ্রা বেঁচে থাকতে এমন কাজ করবে না যাতে তার স্বামীর মাথা নীচু হয়ে যায় পাঁচজনের কাছে।

সুজন মনে মনে ভাবল, প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। নিজের সৌভাগ্যের পথে যখন কাঁটা পড়েছে তখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে অভিরামের পথেও কাঁটা ছড়িয়ে দিতে। যদি সে ছলে বলে কৌশলে ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়েটার সন্ধান পায় একবার, তাহলে অভিরামের এই মধুচক্র হয়ত ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবে। তখন সাধু সেজে লক্ষ্মীবাইকে দিয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা

করে দেখবে ভাঙা ভাগ্যের মোড়টা আবার ফেরাতে পারে কিনা।

অবশ্য এ সংকল্প মনেই রইল সুজন সিংএর। বাইরে তার কোন প্রকাশই দেখা গেল না। লক্ষ্মীবাইকে সে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবার অজুহাতে পাঠিয়ে দিল পাঞ্জাবে। গোপনে বলে দিল, হয় অভিরামকে তুমি পাবে, নয় অভিরাম কাউকে পাবে না। এখন আমাকে একা একা আমার পরিকল্পনাগুলো কাজে লাগাতে দাও।

এদিকে সুজন সিং নীরব রইল সুভদ্রার কাছে। অভিরামের সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগল পুরাতন বন্ধুর মত।

কিছুদিন এমনি করে কেটে যাবার পর সুজন একদিন কুমার অভিরামকে বলল, দেখ অভিরাম, বহুদিন থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও সেই সব ধর্মস্থানের ইতিহাস, পুরাণ, লোককাহিনী প্রভৃতি জানার ইচ্ছে আমার প্রবল। তোমার সঙ্গে বিলেত থেকে আসা অবধি সে সুযোগ আমার হয়ে ওঠেনি, কেবল কাজের ভেতরেই তুমি আমাকে রেখে দিয়েছ। এখন কিছুদিন আমাকে ছুটি দাও দেখি। সারা ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে মনের ইচ্ছেটা মেটাই।

হেসে বললেন অভিরাম, এমন স্ত্রী ঘরে থাকতে বিবাগী হবার ইচ্ছেটা হল কেন জানতে পারি কি?

সুজন সিংও হেসে জবাব দিল, দূরে থাকলে পরস্পরের আকর্ষণ বাড়ে হে। কোনদিন তো এ চক্রে পড়লে না, পড়বে যখন বুঝতে বিলম্ব হবে না।

এবার কুমার বললেন, যাচ্ছ যাও, প্রয়োজন হলেই ম্যানেজারকে টাকার জন্যে লিখতে সংকোচ কর না।

সুজন বলল, তোমার ঋণ শোধ দেব এমন ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা আমার নেই, তবে এ যাত্রায় হয়তো নিজের জন্যে টাকা পয়সার দরকার আমার হবে না। শুধু একটি অনুরোধ করে যাব, প্রয়োজন হলে সুভদ্রার আর্থিক দিকটা তুমি একটু দেখো।

কিছুসময় চুপচাপ থেকে বলল, অবশ্য তুমি জান, শত অসুবিধে থাকলেও সুভদ্রা মুখ ফুটে কিছু চায় না কারো কাছে।

অভিরাম বললেন, সে ভার আমার রইল, তুমি নিশ্চিন্তে তীর্থভ্রমণে যেতে পার।

সুভদ্রার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুজন সিংএর।

সুভদ্রা বলল, এবার আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

সুজন সিং হেসে বলল, ক্ষেপেছ সুভদ্রা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব ভাবতে যত মজা, কাজে কিন্তু তত সোজা নয়। আর তোমাকে তো বলেছি, আমার এই পরিকল্পনাটা যদি ঠিকমত করে উঠতে পারি তাহলে হয়ত সরকারের কাছ থেকে একটা পুরস্কারও পেতে পারি।

কিন্তু সে তো এক আধদিনের কাজ নয়।

কাজটা অবশ্য তাড়াতাড়ি হবার নয় বলেই মনে হয়, তবে ঠিক ঠিক কাজে

না নামলে কতদিন লাগবে তা আন্দাজে বলা শক্ত।

এবার সুভদ্রা একটু গম্ভীর হল, এর ভেতর তুমি কি একটিবারও আসবে না?

হাসল সুজন। বলল, এমন কথাই বা ভাবছ কেন, মন না টিকলে সেই দণ্ডেই টিকিট কেটে তোমার কাছে চলে আসতে পারি।

সুভদ্রা বলল, আমি আর কিছু চাই না. শুধু তুমি ভাল থেকো এই প্রার্থনা জানাই আমার ভগবানের কাছে।

প্রথম যাত্রা করল সুজন সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে। মোটামুটি ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টের তারিখ বা সময় তার অজানা ছিল না। সে পুরোনো কাগজগুলো নেড়েচেড়ে ঠিক ঠিক খবরটা বের করল। অ্যাকসিডেণ্টের পরদিন ছবি ছাপা হয়ে খবর বেরিয়েছিল।

তারপর দু'একদিন বেরিয়েছিল আহতদের তালিকা। এরপর সুজন সিং দেখল, সংবাদপত্র নীরব।

কিন্তু সুজন সিং ব্যারিস্টার। তাই কেসটার নাড়িনক্ষত্র জেনে নেবার ইচ্ছেটা সে দমন করতে পারল না। সংবাদপত্রের অফিসে বসে আবার দেখতে শুরু করল বিভিন্ন তারিখের কাগজগুলো।

অতি ছোট্ট একটি খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ব্যক্তিগত কলমে এক জায়গায় লেখা আছে, 'এ্যান বার্ণাদেৎ, তুমি যেখানে থাক চলে এসো। আমরা তোমার ফিরে আসার জন্যে প্রভুর কাছে রোজ প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মদার ইউজিনিয়া ও উপাসিকা সম্প্রদায়।'

অনেকক্ষণ এই ছোট্ট একটুখানি খবরের ওপর থেকে চোখ তুলে নিতে পারল না সুজন সিং। তারপর ডায়েরীতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখে নিল এই মূল্যবান খবরটুকু।

এরপর শুরু হল খোঁজা। এক একটি গীর্জা আর তৎসংলগ্ন হোমে মাদার ইউজিনিয়ার খোঁজ করতে লাগল সুজন সিং।

ইতিমধ্যে একদিন সে একটি খবর পেল। ঐ খবরটি তার কাছে মোটেই সুখকর ছিল না, কিন্তু তার থেকে কিছু পরিমাণে তার লাভই হল।

সে তার এই ভ্রমণের কালে একদিন দিল্লীতে কুমারবাহাদুরের কোন একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জানতে পারল, কুমার অভিরাম সম্প্রতি হীরাবাই নামের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হয়েছেন।

হীরাবাই নামটা শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠেছিল সুজন সিং। তারপর নিজের মনেই হেসে নিয়ে ভাবল, বার্ণাদেতের হীরাবাই সাজতে কতক্ষণ।

অবশ্য এই বিবাহে তার মর্মাহত হবারই কথা, কিন্তু সে নিজেকে আশ্চর্যভাবে সামলে নিয়ে ভাবল, এখন কোনকিছু প্রাপ্তির আশা ছেড়েই শেষ গরলটুকু ঢালতে হবে।

সুজন সিং ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি কার্ডও দেখল। নব-দম্পতির ছবি ছাপা

রয়েছে তাতে। সে সেই ছবিখানা সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখল। তারপর আবার যাত্রা শুরু। প্রায় দুটি বছর পরে সারা ভারত ঘুরে রাঁচির এক আশ্রমে কিছুকাল অপেক্ষার পর পেল মাদার ইউজিনিয়ার সন্ধান। মাদার কার্যোপলক্ষে ইওরোপ গিয়েছিলেন, তাই এ বিলম্ব।

মাদার ইউজিনিয়া অতিথিদের অভ্যর্থনার জায়গায় দেখা করলেন সুজন সিংএর সঙ্গে। বর্ষীয়সী ব্যক্তিত্বসম্পন্না ধর্মযাজিকার মূর্তি।

বলুন আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

অতি ধীরে কথাগুলি বললেন মাদার ইউজিনিয়া।

দীর্ঘদিন আপনার সন্ধান করেছি মাদার, তারপর এখানে অপেক্ষা করেছি প্রায় একটি বছর। আপনার ইওরোপ থেকে ফিরে আসারই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

মাদার ইউজিনিয়া কিছু পরিমাণে বিস্মিত হলেন, এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুজন সিংএর দিকে।

এবার সুজন সিং বলল, আপনিই কি সিস্টার বার্ণাদেতের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

বহুদিনের কথা। ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টের পর কোন সন্ধান না পেয়ে সংবাদ-পত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন মাদার ইউজিনিয়া। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। মাদার ইউজিনিয়া বার্ণাদেতের আশা ছেড়েই দিয়েছেন। সিস্টার বার্ণাদেৎ যে জীবিত নেই এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হয়েছে তাঁদের সকলেরই মনে। আর তা ছাড়া জীবিত থাকলে এতদিনে সে যেখানেই থাকুক অবশ্যই ফিরে আসত তাদের মাঝে।

মাদার ইউজিনিয়া বললেন, হাঁ, আমি তাঁর জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

নিশ্চয়ই আপনি তাঁর কোন সংবাদই পাননি।

না মহাশয়।

আচ্ছা মাদার, সিস্টার বার্ণাদেৎ কি কোন ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন?

হাঁ, তিনি যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন, সেই ট্রেন দেরাদুন স্টেশানের মুখেই অ্যাকসিডেণ্টে পড়ে।

যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

করুন।

সিস্টার বার্ণাদেৎ কোথাও কি কাজে যাচ্ছিলেন?

মুসৌরীর কনভেণ্টে আমরা তাঁকে কিণ্ডারগার্টেন বিভাগের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। নতুন খোলা হচ্ছিল ঐ বিভাগটি।

সুজন সিং বলল, সিস্টার বার্ণাদেৎ মুসৌরীতেই আছেন মাদার, তবে কনভেণ্টে নয় লালসিয়ার কুমারবাহাদুরের মহলে।

চমকে উঠলেন মাদার ইউজিনিয়া।

অসম্ভব, অসম্ভব, যদি কোন দুর্ঘটনার ফলে তিনি সেখানে গিয়ে থাকেন তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের খবর পাঠাতেন। আর তাছাড়া মুসৌরীতে আমাদের কনভেণ্টে সহজেই গিয়ে উঠতে পারতেন। আপনি ভুল করেছেন মহাশয়।

ভুল আমার সহজে হয় না মাদার। সিস্টার বার্ণাদেৎ বর্তমানে বিবাহিতা, আর তিনি বিবাহ করেছেন লালসিয়া এস্টেটের বর্তমান রাজা অভিরাম সিংকে।

হেসে আবার বলল সুজন সিং, তাঁর বিবাহোত্তর নাম হয়েছে হীরাবাই।

মনে হল মাদার ইউজিনিয়া থরথর করে কেঁপে উঠলেন। কম্পিত গলায় বললেন, কোন কিছুতে বিচলিত হওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ, তবু সত্যের খাতিরে বলব, আমি বিচলিত বোধ করছি মহাশয়।

পকেট থেকে একটি ফটো বের করে মাদার ইউজিনিয়ার হাতে দিয়ে বলল সুজন সিং, চিনতে পারেন এই মহিলাকে! যদিও আমাদের দেশীয় পোশাক রয়েছে তাঁর গায়ে।

মাদার ইউজিনিয়া অনেকক্ষণ দেখলেন। চোখ মুছলেন বার বার। আবার দেখলেন।

সিস্টার বার্ণাদেতেরই ছবি। একটু থেমে আবার বললেন, সত্যকে বিশ্বাস করা, স্বীকার করাই আমাদের ধর্ম, কিন্তু এ ঘটনা যে আমার বিশ্বাসের বাইরে মহাশয়।

সুজন সিং গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ সত্য, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর সত্য মাদার।

মাদার ইউজিনিয়া বড়ই অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এ ঘটনা আমার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত সাধনার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনাকে আমি সংক্ষেপে বার্ণাদেৎ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললে আপনিও হয়ত আমার মতই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না।

সুজন সিং আগ্রহী শ্রোতার মত তাকিয়ে রইল মাদার ইউজিনিয়ার মুখের দিকে।

ফাদার পিটার ইউরোপের একটি চার্চ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিভিন্ন জায়গায় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। একসময় তিনি কোন এক পার্বত্য জনবিরল তীর্থপথে এক পরমাসুন্দরী হিন্দু রমণীর সাক্ষাৎ পান। তাঁদের মধ্যে পথ পরিভ্রমণ কালেই প্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁরা তীর্থপথের থেকে কিছু দূরে একটি গুপ্ত স্থানে কালযাপন করতে থাকেন। অচিরে সেই রমণীর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিল। কিন্তু যথাকালে একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ঈশ্বরের করুণা লাভ করলেন।

অতঃপর সেই শিশুকন্যাকে বহন করে ফাদার পিটার একদিন আমার আশ্রমে এসে দাঁড়ালেন। অকপটে স্বীকার করলেন ধর্মজীবন থেকে তাঁর

স্খলনের কথা। পরে সেই শিশুকন্যাকে এই আশ্রমের করুণার উপর সমর্পণ করে তিনি ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

সেই মাতৃহীন শিশুর আমি হলাম জননী। তাকে শৈশব থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশটি বছর শিক্ষা দিয়াছি সর্বপ্রকার সংযত জীবন-যাপনের। সে ছিল আমার আশ্রমের প্রাণ আর আদর্শস্বরূপিণী। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মহাশয়, কি করে এমন অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে পারে!

সুজন সিং বলল, সিস্টার বার্ণাদেতের কাহিনী যথার্থই বিচিত্র। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যেও এর তুলনা বিরল নয়। ঋষি বিশ্বামিত্র স্বর্গনটী মেনকার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তাঁকে সঙ্গদান করেন, ফলে জন্ম হয় শকুন্তলার। তারপর পিতামাতা উভয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সে আসে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে। সেখানে জননী গৌতমী প্রভৃতির স্নেহচ্ছায়ায় তিনি সংবর্ধিত হতে থাকেন। অবশেষে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ, গোপন প্রণয় ও গান্ধর্ব বিবাহের অনুষ্ঠান হয়।

একটু থেমে বলল সুজন সিং, সিস্টার বার্ণাদেতের কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর সাদৃশ্য আপনি আশা করি অনুধাবন করতে পেরেছেন। সুতরাং অবিশ্বাস্য বলে কিছু উড়িয়ে দেবার উপায় কোথা বলুন মাদার।

না, সবই সত্য, সবই সম্ভব। তবু আমার মনে হয়, একবার ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি, আমার সব শিক্ষাই কি ভুল। একবার জীবনের পথ পরিবর্তনের সময় মনে কি পড়ল না আমার কথা। এ যদি অন্য কোন নামের বিষয় হত তাহলে হয়তো আমি অবিশ্বাস করতে পারতাম না মহাশয়। তারা অনেক সময় আসে সংসারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। তারপর এই পরিবেশে কিছুকাল কাটিয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে ফিরে যেতে পারে পূর্বাশ্রমে। তাদের পক্ষে হয়ত এটা কোনদিন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বার্ণাদেতের পক্ষে এ তো সম্ভব ছিল না মহাশয়। তার ব্যবহার, তার প্রার্থনার নিবিষ্টতা, তার পবিত্র দেহ আমাকে এই রূঢ় সত্যকে স্বপ্ন বলে ভাবতেই প্ররোচিত করছে।

সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়লেন মাদার ইউজিনিয়া। তিনি প্রার্থনার ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বে তাকিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে লাগলেন।

মাদার, আপনি বড় বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এই ঘটনায় একমাত্র রাজা অভিরাম সিংই অপরাধী, বার্ণাদেৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অতি করুণ হাসি ফুটে উঠল মাদার ইউজিনিয়ার মুখে। তিনি বললেন, উভয়ের সম্মতি, উভয়ের মিলিত চেষ্টা ছাড়া বিবাহের প্রকাশ্য ঘোষণা কি করে সম্ভব বলুন?

সুজন সিং বলল, এর মধ্যে একটি রহস্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে মাদার।

সবিস্ময়ে মাদার ইউজিনিয়া তাকালেন সুজন সিংএর দিকে।

সিস্টার বার্ণাদেৎ ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি। তাঁর সেই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়েছে লালসিয়া ইস্টেটের রাজাবাহাদুর।

এ কি সত্য।

সম্পূর্ণ সত্য মাদার। এখনও কি আপনি ওকে পেতে চান আপনার কাছে?

আমি তাকে সব সময়েই চাই মহাশয়। তার এই অসহায় অবস্থার কথা শুনে আমি আরও বিচলিত হয়ে পড়েছি।

ডাক্তারেরা বলেন, আবার কোন উত্তেজনার কারণ যদি ঘটে তাহলে ফিরে আসতে পারে রোগীর পূর্বস্মৃতি। হয়ত এমনও ঘটতে পারে, আপনাকে দেখলেই তাঁর মনে পড়ে যাবে সমস্ত ঘটনা।

মাদার ইউজিনিয়া বললেন, এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন মহাশয়।

আমি বলি, এমন একটি পবিত্র আত্মাকে অসহায়ভাবে সংসারে নিষ্ঠুর বন্ধনের মাঝে পীড়িত হতে দেওয়া কোনমতেই উচিত হবে না। শেষ চেষ্টা করে দেখাই আপনার কর্তব্য, নাহলে এই ধর্মাশ্রমের পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুতির জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনি অপরাধী হবেন। এ বিষয়ে যদি আপনি আমার সাহায্য চান আমি পবিত্র কর্তব্যবোধে আপনাকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সাহায্য দিতে পারব।

পরামর্শ শেষে মাদার ইউজিনিয়া সুজন সিংএর সঙ্গে মুসৌরী যাত্রা করলেন।

এদিকে কুমারমহল কিঞ্চিদধিক দু'বছরের এক শিশুর কলধ্বনিতে মুখর। যে দরিদ্র রিকশাচালকের স্ত্রীকে একদিন হীরাবাই নিজের হাতের আংটি খুলে দিয়েছিলেন, তারা স্বামী স্ত্রীতে এখন কুমারমহলের কাজে নিযুক্ত। প্যারামবুলেটারের যুগ অতিক্রম করে অভিরামের শিশুপুত্র অভিজিৎ সিং এখন রিকশাচালক হাম্বীর ভাইএর হাত ধরে ছোট ছোট পা ফেলে ঘুরে বেড়ায়। কাঁধে চেপে লাল লাল কুরুশের ফুল পাড়ে।

হাম্বীর যখন বলে উঁহু বড্ড লেগেছে, তখন শিশু অভিজিৎ মজা পেয়ে আরও জোরে চেপে ধরে হাম্বীর ভাইএর চুলের মুঠি। তারপর কাঁধের ওপর বসে ঘোড়সওয়ারের মত নাচতে থাকে।

এতে দু'জনের মজার তার অন্ত থাকে না।

এখন কুমারবাহাদুরের গুপ্তগৃহের দ্বার খুলে গেছে। যে লীলারঙ্গের পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছিল এই গুপ্তগৃহ, আজ তার আর কোন প্রয়োজনই নেই। এখন লালসিয়া ইস্টেটের মহারানী হীরাবাইএর পাঠ ও নিভৃত বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ঐ গৃহ।

সুভদ্রার কাছে এই দীর্ঘ আড়াই বছরে দু'বার মাত্র এসেছিল সুজন সিং। সুভদ্রা তাকে বলে তার নিঃসঙ্গ অবসর সময়টুকু কাটাবার জন্য পুনরায় নার্সের কাজ গ্রহণ করেছে। প্রথমে সামান্য মৌখিক বাধা দিলেও মনে মনে খুশীই হয়েছে সুজন। অন্ততঃ অলস সময়গুলো সে অভিরামের সঙ্গে গল্প করে কাটাবে না।

ঘরে ফিরে এসেছে সুজন। বন্ধুবৎসল সে, স্ত্রীর প্রতি অগাধ ভালবাসা তার। বহু তথ্য নাকি তার সংগ্রহে হয়েছে পুঞ্জীভূত। এ যেন অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ সহজ সরল। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যে যেন মুছে গেছে তার সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি।

কয়েক দিন হল কি যেন হয়েছে হীরাবাইএর। কেউ কিছু ধরতে পারে না, স্পষ্ট করে তিনিও বলতে পারেন না কিছু। রোজকার কাজের ফাঁকে এক এক সময় কেমন যেন চমকে ওঠেন। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। কি যেন ভাবেন তিনি, তারপর চোখেমুখে কেমন এক যন্ত্রণা বা অসুস্থতার ছবি ফুটে ওঠে। অন্য কেউ না জানলেও হীরাবাই জানেন এই অসুস্থতার শুরু কোথায়। তিনি রোজকারমত তাঁর পাঠগৃহে একদিন বসেছিলেন, এমন সময় সুজন সিং ঢুকল সেখানে সুভদ্রাকে নিয়ে।

নানা বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা আর পরিহাস রসিকতার পর এক সময় হঠাৎ সুজন সিং খুলে দিল পূর্বদিকের একটা জানালা।

এই জানালাটা চিরকালই বন্ধ থাকতে দেখে এসেছে হীরাবাই। তাই সেও বোধ করেনি খোলার কোন প্রয়োজন।

কিন্তু এ জানালাটি বন্ধের একটা সামান্য কারণ ছিল। তা জানতো একমাত্র সুজন সিং। যখন কুমার অভিরামের লীলাগৃহ ছিল এই গুপ্ত স্থানটি তখন থেকেই বন্ধ করে রাখা হত এ জানালা। কারণ এই জানালাটি খুললেই দেখা যেত ল্যান্ডোর ক্যান্টের চার্চের শীর্ষদেশ। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ধর্মস্থানের আভাস মানুষের মনকে ভীত করবে বলেই জানালা বন্ধের এই ব্যবস্থা হয়েছিল। এইভাবে ধর্মের পৃথিবীকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল দূরে।

সুজন সিং জানালাটি খুলে দিয়ে চলে গেল। আর সেইদিন থেকেই কৌতূহলী হীরাবাইএর চোখে ফুটে উঠতে লাগল অন্য এক জগতের ছবি।

সে ঐ জানালার কাছে বসে দেখতে পেত দেওদার বনের আড়ালে জেগে ওঠা চার্চের শুভ্র শীর্ষদেশ। সে তাকিয়ে থাকত সেদিকে সবকিছু ভুলে।

একদিন তার চোখে পড়ল শুভ্র পোশাকপরা নানের দল চলেছে দেওদার বনের পথ ধরে। হাতে তাদের ধর্মগ্রন্থ। তারা আঁকাবাঁকা পথ ধরে কখনো ওপরে উঠতে লাগল, কখনো বা নীচে নামতে লাগল।

হীরাবাই দেখতে লাগলেন সে দৃশ্য। ঐ তো নানেরা আড়াল হয়ে গেল গভীর বনের মধ্যে। আবার দেখা যাচ্ছে। একে একে বেরিয়ে আসছে বনের ভেতর থেকে। এবার তারা চলে গেল পাহাড়ের ওপারে। স্তব্ধ হয়ে গেছে পারিপার্শ্বিক। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। দেওদার বনের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কখন কাঁপন শুরু হয়ে গেছে হীরাবাইএর মনে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তাঁর শুধু মনে হল এ ছবি যেন তাঁর বহুদিনের চেনা। যেন কোন জন্মান্তরের পথ পেরিয়ে তিনি চলে এসেছেন এখানে। একটা গভীর যোগসূত্র

যেন সহসা ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বহু পরিচিত কোন জীবনের ছবি, কিন্তু কেমন করে তিনি সেখানে ফিরে যাবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। একটি বহমান নদীর ওপরে যে সেতুটি ছিল সেই সংযোগসূত্রটি কে যেন ভেঙে দিয়েছে। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন হীরাবাই, কিন্তু ওপারের ঐ নানেরা তাঁর সে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে, কোথায় যেন এক ঝাঁক দূরাগত মৌমাছির গুঞ্জনের মত প্রার্থনার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

হীরাবাইএর মাথার ভেতর সে ধ্বনি-গুঞ্জন প্রবল হয়ে বাজতে লাগল। হীরাবাই চীৎকার করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মুখে চোখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন তিনি। কিন্তু ঐ দিন থেকেই মাঝে মাঝে কেমন যেন মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তাঁর। কেমন আচ্ছন্নের মত আবিষ্ট হয়ে থাকেন কতক্ষণ।

সুভদ্রার মুখ থেকে হীরাবাইএর পরিবর্তনের খবর স্বাভাবিকভাবেই কানে এসে পৌঁছয় সুজন সিংএর। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সব রোগী অনুকূল পূর্ব-পরিবেশের স্পর্শ পেলেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

সুজন সিং ভাবল, তার এই জানালাটা খুলে দিয়ে আসার পরিকল্পনা তার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এবার আসল আঘাত দেবার জন্যে তৈরী হল সুজন সিং।

কুমার অভিরামের সঙ্গে এ বিষয়ে একদিন কথা হচ্ছিল সুজন সিংএর।

সুজন বলল, সুভদ্রার কাছে শুনলাম রানীসাহেবা নাকি দৈহিক দুর্বলতায় ভুগছেন?

সঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না সুজন। ডাক্তার গর্গকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, নার্ভের কোন দুর্বলতা বলেই মনে হচ্ছে।

সুজন জোর দিয়ে বলল, আমি তাই আধুনিক কতকগুলো টনিকে গভীর বিশ্বাসী নই। আমার মনে হয় কোলাহলের বাইরে আলো হাওয়ার ভেতর যদি মনের খুশীতে ঘুরে বেড়াতে পান কয়েকদিন, তাহলে রোগের লেশ থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

কুমার অভিরাম বললেন, আমিও যে সে কথা ভাবিনি তা নয়। আর কি যে পড়ার বাতিক হয়েছে, ঐ গুপ্তগৃহটি বন্ধ করে আজকাল প্রায় সবটুকু সময়ই মনে হয় ওখানে ও পড়াশোনা করে।

পড়াশোনা করা ভাল কথা ঠিক, কিন্তু অতিরিক্ত পড়াশোনাতে অনেক সময় মানসিক গোলমাল ঘটতে পারে। তুমি বরং সকাল সন্ধ্যে ওঁকে ঐ ল্যাণ্ডোর ক্যাণ্টের দেওদার বনের দিকে বেড়াতে যাবার পরামর্শ দিতে পার। যত বেশী সময় বাইরে থাকবেন, তত বেশী হবে মানসিক উপকার।

কুমার অভিরামের মনে ধরল বন্ধু সুজন সিংএর পরামর্শ।

এরপর অভিরাম হীরাবাইকে পাঠাতে লাগলেন সন্ধ্যা সকাল কোন নির্জন স্থানে ভ্রমণের জন্য।

প্রথম প্রথম নিজে সঙ্গে যেতেন। পরে হীরাবাই একাকী যেতে লাগলেন। মনে হল কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছে তাঁর। কাজের মধ্যে আজকাল কখনো অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে তাঁর কাছে আনা হয় শিশু অভিজিৎকে। অমনি সহসা তাকে নিয়ে শুরু হয়ে যায় তার খেলা। যেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। একটু আগে যে শুরু হয়েছিল তাঁর ভাবান্তর তা তাঁর মনেই থাকে না।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব শুরু হয়েছে। শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় সান্তাক্লজের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। কোথাও রথের ওপর সান্তাক্লজ; শিং তোলা হরিণ সামনের দুটি পা তুলে ছুটে চলার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ পাইন, ফারের গাছ। রঙ-বেরঙের লাল নীল হলদে আলোর বাহার। শহর মুসৌরী প্রমোদে হয়ে উঠেছে প্রমত্ত।

অভ্যেস মত হীরাবাই একাই আজ সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। লালটিব্বার পথ ধরে কিছুদূর ওপরে উঠে আসতেই দেখা হয়ে গেল তাঁর সুজন সিংএর সঙ্গে।

অভিবাদন জানিয়ে সুজন সিং বলল, শুভসন্ধ্যা রানীসাহেবা।

হীরাবাই সহাস্যে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

তারপর একই সঙ্গে উঠতে লাগলেন ওপরে।

সুজন বলল, আজ পিতা যীশুর জন্মদিন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি বেথেলহামের আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঐ দেখুন, তাই মনে হয় না কি?

হীরাবাই তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে গেছে। উজ্জ্বল নীল একটি তারা যেন নেমে এসেছে বহু নীচে। ঐ দেওদার বনের ওপারে গীর্জার মাথার ওপর জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হীরাবাই। সুজন সিংএর ডাকে তাঁর চমক ভাঙল।

চলুন, আজ গীর্জার দিকে যাওয়া যাক্।

হীরাবাই কেমন এক অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি চলতে লাগলেন সুজন সিংকে অনুসরণ করে।

ওরা এসে পৌঁছল গীর্জার কম্পাউণ্ডের ভেতর। সান্তাক্লজ রথে করে নিয়ে আসছেন শিশুদের জন্য উপহার।

হীরাবাইএর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, তিনি যেন নানের পোশাক পরে হাতে অজস্র উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে নেচে চলেছে ফুলের মত সুসজ্জিত ছেলেমেয়েরা। নাচের শেষে তারা হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, আর হীরাবাই তাদের হাত ভরে দিচ্ছেন খেলনা, বই আর চকোলেট।

সুজন সিং ডাকল, রানীসাহেবা।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন হীরাবাই, কখনো বা ঘুরতে লাগলেন করতালি দিয়ে। সুজন সিংএর ডাক শুনতে পেলেন না।

রানীসাহেবা, রানীসাহেবা। বারবার ডাকতে লাগল সুজন সিং। শেষে হাত ধরে টান দিতেই সম্বিত ফিরে এলো।

আসুন, গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে।

হীরাবাই এগিয়ে চললেন। প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। কাছে এসেই ওরা দাঁড়াল দরজার একটু ভেতরে। মঞ্চে মাতা মেরী রয়েছেন। কি অপূর্ব স্নিগ্ধতা তাঁর চোখেমুখে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ভরে জল এল হীরাবাইএর।

প্রার্থনার সুর কান্নার মত ভেসে আসতে লাগল তাঁর কানে। কত পরিচিত এ সুর তাঁর কাছে। হীরাবাইএর গলা কাঁপতে লাগল। কখন তাঁর কন্ঠ থেকে বেরোতে লাগল প্রার্থনার কথা, প্রার্থনার সুর।

সরে গেছে সুজন সিং হীরাবাইএর কাছ থেকে। হীরাবাই তন্ময় হয়ে গাইছেন প্রার্থনার গান।

প্রার্থনা শেষ হল। হীরাবাই সামনের বেদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রার্পিতার মত। একে একে সকলে চলে গেল হীরাবাইকে অতিক্রম করে। হলঘর শূন্য হয়ে গেল। হীরাবাই যেমন তাকিয়েছিলেন তেমনি তাকিয়ে রইলেন।

সহসা কে যেন মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন। তারপর পায়ে পায়ে নেমে আসতে লাগলেন সোপান বেয়ে।

হীরাবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।

কে, কে আসছেন তাঁর দিকে এগিয়ে! কত চেনা, কত পরিচিত। হীরাবাই দৌড়তে লাগলেন। দৌড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন কে যেন তাঁর কানের কাছে অতি মধুর সুরে ডাক দিলেন, বার্ণাদেৎ, এ্যান বার্ণাদেৎ।

চোখ মেলে তাকাল বার্ণাদেৎ। বলল, মাদার এখানে আমি শুয়ে কেন?

তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে বার্ণাদেৎ।

মাদার ইউজিনিয়া বার্ণাদেৎকে নিয়ে চললেন গীর্জার ভেতর মহলে।

মাদার বড় ঘুম পাচ্ছে, কেন যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে আমার চোখ!

চল, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কুমারবাহাদুর আদালতে লড়েছিলেন। লালসিয়া ইস্টেটের এক বছরের প্রায় অর্ধেক রাজস্ব তিনি ব্যয় করেছিলেন এই কেসে, কিন্তু সুরাহা কিছুই করতে পারেন নি।

বড় বড় ব্যারিস্টারেরা আদালতে প্রমাণ করেছিলেন যে বার্ণাদেৎ স্বেচ্ছায় কুমার অভিরামকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর তিন বছরের সন্তানই তার প্রমাণ। কিন্তু আসামী বার্ণাদেৎ চিনতে পারেন নি কাউকেই।

শেষে ডাক্তার গর্গ এসেছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। তিনি সবিস্তারে ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছিলেন, অ্যাকসিডেন্টের ফলে পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত

হয়েছিল বার্ণাদেতের। তার ফলে তিনি ন্যায়সংগতভাবেই নতুন জীবনে প্রবেশ করে সংসার রচনার অধিকারী হয়েছিলেন।

কিন্তু টিকল না ডাক্তার গর্গের যুক্তি। অনুরূপভাবে বার্ণাদেৎ যখন তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, এবং ফিরে যেতে চাইছেন তাঁর পূর্বাশ্রামে, তখন তাঁকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতাও আইনের থাকবার কথা নয়। নতুন জীবনে প্রবেশ যদি সম্ভব হয় কোন অ্যাকসিডেণ্টের ফলে, তাহলে মানসিক সংঘাতের ফলে তার নিষ্ক্রমণকেও নিতে হবে স্বীকার করে।

রায় বের হল, মাদার ইউজিনিয়ার স্বপক্ষে। বার্ণাদেৎ নিযুক্ত হলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কিণ্ডারগার্টেনের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকারূপে।

কিছুদিন পরে ঘটনায় যথার্থ যবনিকাপাত ঘটল। সুভদ্রা কুমার অভিরামের শিশুপুত্র অভিজিৎকে ভর্তি করে দিয়ে এল কনভেণ্টের অন্তর্ভুক্ত কিণ্ডারগার্টেনে।

পড়া আর খেলার শেষে যখন ছুটির ঘণ্টা পড়ল তখন দেখা গেল সবাই চলে গেলেও একটি ছেলে যেতে চাইছে না।

বার্ণাদেৎ তাকে আদর করে ঘরের বাইরে যেতে বললেই সে মা মা বলে জড়িয়ে ধরতে চায়।

শেষে বিব্রত হয়ে এক সময় বার্ণাদেৎ একটু ধমকের সুরে সেখান থেকে ছেলেটিকে চলে যেতে বললেন। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বাইরের দিকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

বার্ণাদেৎ পেছনের দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু বার্ণাদেতের আর যাওয়া হল না। তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল কিণ্ডারগার্টেন হলের পেছনের দেয়ালে রক্ষিত একটি মূর্তির ওপর।

শিশু যীশু খ্রীষ্টকে কোলে নিয়ে পরম স্নেহে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন মাদার মেরী।

কতক্ষণ বার্ণাদেৎ তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তাঁর দুচোখ ভরে উঠল অশ্রুতে।

উন্মাদিনীর মত ঘরের বাইরে ছুটে এসে অভিজিৎকে তুলে নিলেন বুকের মধ্যে। এবার দুচোখ বেয়ে তাঁর শ্রাবণের ধারা ঝরতে লাগল।

পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরাতন রিকশাওয়ালা বেল বাজিয়ে চলল আনন্দে। অভিজিৎকে বুকে জড়িয়ে হীরাবাই বার্ণাদেতের পোশাকেই রিকশাতে গিয়ে উঠে বসলেন।

———

ফেরা

জানালাটা এখন বন্ধ করে দিতে হবে,—বেজে উঠল জয়তিলকের গলা।

অন্তরা জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

এতক্ষণ যে দুরন্ত কালবৈশাখী মিহি বালির ঘাগরা উড়িয়ে ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নেচে বেড়াচ্ছিল সেদিকেই তাকিয়েছিল অন্তরা। নিজের জীবনটার সঙ্গে হয়তো বা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল সে। তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। জানালাটা বন্ধ হবার শব্দ শুনল সে।

জয়তিলক ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে তার রুম স্লিপারের শব্দটা বাজছিল। সামনের উঠোনে টিনের চালে বৃষ্টি চড়বড়িয়ে উঠল।

অন্তরা গাইল, 'বরষা আইল ঐ ঘন ঘোর মেঘে দশদিশি তিমিরে আঁধারি।'

সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দটা থেমে গেল।

এখন অন্তরার ঘরে উঠে আসছে জয়তিলক। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, গান গাওয়া চলবে না আপনার। কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না সে। সিঁড়ি ভেঙে চলে গেল তার একতলার ঘরে। একঝলক কান্না বুক ঠেলে উঠে এল অন্তরার। গানের একটা ভাঙা টুকরোও কি আর সে গাইতে পারবে না!

জয়তিলক নাচের ঘরে তার সোফায় বসে তাকিয়েছিল। জানালার বাইরে ঢেউ-খেলানো বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো জায়গা জুড়ে বনঝাউয়ের সংসার। আর ঠিক তার পরেই উঁচু সী-ডাইক। নীচের থেকে সমুদ্রটা চোখে পড়ে না। আওয়াজটা শোনা যায়। ওপর থেকে কিন্তু এই বালিয়াড়ি বনঝাউ আর সামনের সমুদ্র চোখ দুটোকে টেনে রাখে।

জয়তিলক মাসখানেক আগে যখন এখানে এসেছিল তখন সে ওপরের ঘরটাই দখল করেছিল। ক'দিন আগে অসুস্থ অন্তরা এসে পড়ায় তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে দোতলার ঘরখানা। অবশ্য তাতে কোন রকম অসুবিধেই মনে হচ্ছে না জয়তিলকের। আঙ্কল মিত্র কলকাতা থেকে চিঠি দিয়ে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি ফিরে না আসা অবধি যেন জয়তিলক অন্তরাকে লক্ষ্য রাখে। আঙ্কল মিত্র তাঁর এখানকার হাউস ফিজিসিয়ানকেও চিঠি দিয়েছেন। ভদ্রলোক রোজ একবার করে এসে দেখে যান, ইনজেকশনও দিচ্ছেন। এখানকার ডাক্তার ভদ্রলোক জানেন না যে জয়তিলক বোস ভেলোরের একজন নামকরা সার্জেন। অত্যন্ত শক্ত হার্ট অপারেশনের সঙ্গে জয়তিলকের নামটা অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এ খবর তামাম হিন্দুস্থানের সার্জেন মহলে সুবিদিত হলেও জনপুটের এই নির্জন সমুদ্রতীরে অন্তরা নামের অসুস্থ মেয়েটি, কিংবা পাঁচ মাইল দূর থেকে রোজ আসা ডাক্তারবাবুটি রাখেন না। জয়তিলককে ডাক্তারবাবু চলে যাবার সময় নানারকম নির্দেশ দিয়ে যান। বাধ্য ছেলের মত জয়তিলক মাথা নেড়ে সায় দেয়। কোনদিন তার ডাক্তারী বিদ্যের সামান্যতম ছায়াও সে মুখে-চোখে ফুটিয়ে তোলে না।

একদিন ডাক্তার চক্রবর্তী রোগী দেখে চলে যাবার সময় জয়তিলককে বললেন, চলুন আমার সঙ্গে, আপনারও একটু বেড়িয়ে বেড়ানো উচিত।

সারাদিন ঘরে কন্‌ফাইন্ড হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। বাধ্য ছেলের মত জয়তিলক বেরিয়ে এল ডাক্তারের সঙ্গে। একথা সেকথা এবং অনেক কথার পর ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, ইয়ংম্যানদের ক্ষেত্রে এসব রোগ চট করে সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে।

কথাটা বলেই একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন ডাক্তার চক্রবর্তী।

জয়তিলক কোন কথা না বলে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

ডাক্তার চক্রবর্তী গলার স্বর হঠাৎ গম্ভীর করে ফেললেন। অত্যন্ত গোপনীয় সিরিয়াস কোন উপদেশ দিতে গেলে মানুষের গলা ঠিক যেমনটি হয়ে ওঠে।

জানেন মিঃ বোস, এ সময় ঐসব টি. বি. পেসেণ্টদের মনে হতে পারে ওরা সুস্থ মানুষদের সঙ্গে সমান। মেলামেশা খাওয়া-দাওয়াতে বাধা কি। আর এদিকে আপনি যুবক। এসব সময়ে শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিপদের ঝুঁকি নেওয়াতেই আনন্দ। সেণ্টিমেণ্টে ভরা মনের কাছে বিপদ আগুনের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আর তাছাড়া মিস মজুমদারও, কিছু মনে করবেন না, একটু বেশী রকমের এ্যাট্রাকটিভ। শেষের দিকের বাক্যটি ডাক্তার চক্রবর্তী যেন সমুদ্র, বালিয়াড়ি আর বনঝাউগুলোর কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বললেন।

জয়তিলকের ঠিক এই সময় ডাক্তার চক্রবর্তীকে দারুণ রকম ধমকে দেবার কথা, কিন্তু তা সে করল না। যে যার মত চলা কিংবা কথা বলার অধিকারে সে বিশ্বাসী। আর প্রত্যেকের বিশ্বাসে তার ব্যক্তিগত আস্থা না থাকলেও তা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে তার রুচিতে বাধে। সে পড়াশোনাতে যেমন মগ্নতা দেখিয়েছে, কাজের বেলাতেও তার সেই নিষ্ঠা দেখা গেছে। তাই অল্প কথা বলাই তার স্বভাব। নিজের ভেতর ডুবে থাকাই যেন জয়তিলকের স্বভাবের ধর্ম।

ডাক্তার চক্রবর্তী কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। শহর থেকে যে পীচের রাস্তাটা সমুদ্রতীরের ফিশারী ডিপার্টমেণ্টের কোয়ার্টারগুলোর পাশ বরাবর এসে বালিতে সেঁধিয়েছে, সেই অবধি মফঃস্বল টাউনের একটা বাস রান করে। দিনে বার ছয়েক ফেরি দেয়। তাতেই আসেন ডাক্তার চক্রবর্তী। নেমেই সমুদ্র-তীর ধরে বালির ভেতর পা ডুবিয়ে মাইল খানেক হেঁটে আসতে হয়। এখানে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ভবানন্দ মিত্র তাঁর বাংলো বাড়িটি তৈরী করেছেন। কলকাতা থেকে একটুখানি সুযোগ পেলেই চলে আসেন এখানে। তাছাড়া নিজের কোন সংসার না থাকলেও অগুণতি অনাত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ। পথ চলতে তিনি প্রিয়জন কুড়িয়ে পান। সে সংযোগ অন্যপক্ষ না ছিঁড়ে ফেললে তাঁর দিক থেকে অটুটই থেকে যায়। জয়তিলক বোস যখন মেডিকেল স্টুডেণ্ট তখন একটা অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে এমারজেন্সিতে ওদের দেখা। জয়তিলকের সেদিনের ব্যবহার ভবানন্দ মিত্রের মনে দারুণ দাগ টেনেছিল। আর অনাত্মীয় এক পথচারীকে অ্যাকসিডেণ্টের জায়গা থেকে তুলে এনে যে ভাবে দিনের পর দিন তিনি সেবা করলেন, তাতে জয়তিলক

ভবানন্দকে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি। সেই থেকে দুজন অ-সমবয়সীর যোগ। সে যোগ দিনে দিনে নিবিড় হয়েছে। জয়তিলক ভবানন্দ মিত্রকে আঙ্কল বলে ডাকে। অন্তরাও অবশ্য ডাকে কাকু বলে। কিন্তু অন্তরার সঙ্গে ভবানন্দ মিত্রের সংযোগের সূত্র একটু ভিন্ন। অন্তরার বাবার সঙ্গে গায়ক ভবানন্দ নাড়া বেঁধেছিলেন একই গুরুর সঙ্গীত আসরে। সেই সুবাদে অন্তরা ভবানন্দকে কাকু বলে ডাকার একটা স্বাভাবিক অধিকার পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে জয়তিলক আর অন্তরা দুজনের কাছে অপরিচিত।

ভেলোর থেকে দীর্ঘ চার মাস ছুটি নিয়ে এসেছে জয়তিলক। অতি নির্জন কোন জায়গায় সময়টাকে খুশিমত খরচ করবে এই ইচ্ছা মনে আসতেই আঙ্কল মিত্রকে লিখেছিল তার অভিপ্রায়ের কথা। ভবানন্দ মিত্রের জবাব পেতে ফেরত ডাকের বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি। জয়তিলক এই বাড়িতে এসে আঙ্কল ভবানন্দ মিত্রকে পেয়েছিল। ক'দিন তাদের কেটেছিল কথায় গানে। ভোরবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে বেড়াত দুজনে। বেলা বাড়লেই ফিরে আসত তারা বাংলোতে। সমুদ্রতীরের অল্প দূরবর্তী গাঁ থেকে আসত একটি চাষীর কুমারী মেয়ে। সে সারাদিন রান্নাবান্না করে খাইয়ে দিয়ে সন্ধ্যায় চলে যেত। রাতে আসত তার বাবা। সে এই বাংলো-বাড়ির পাহারাদার। কদিন কাটানোর পর আঙ্কল মিত্র কোন কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য কলকাতা চলে গেলেন। একা রইল জয়তিলক। কিন্তু স্বল্পভাষী সার্জেনের তাতে বিশেষ কোন অসুবিধে হল না। আর তাছাড়া এই নির্জনে বসে সে একটি মেডিকেল জার্নালের জন্য আর্টিকেল লিখতে আরম্ভ করে দিল। অপারেশনের নতুন একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার নিজস্ব পরিকল্পনার কথা।

যখন সে প্রায় ডুবে আছে তার আর্টিকেল লেখার কাজে, এমন একদিনে সম্পূর্ণ একাকী অন্তরা এলো এই বাংলোয়। একেবারে অচেনা মেয়েটিকে বাংলোর বারান্দায় বসে থাকতে দেখল জয়তিলক। পড়ন্তবেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখতে পেল অন্তরাকে। আর ঠিক সেই দিনটিতেই কাজের মেয়েটি চলে গিয়েছিল আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে। জয়তিলক বাংলোয় ঢুকেই একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় মেয়েটিকে দেখছিল। অন্তরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাকু নেই এখানে ?

জয়তিলক এগিয়ে এল দরজার কাছে। ভেতরের ঘরের তালা খুলতে খুলতে বলল, তিনি তো বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতা গেছেন। গানের কনফারেন্স রয়েছে।

ঘর খুলে আনাড়ী হাতে আলো জ্বালতে চেষ্টা করছিল জয়তিলক। মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, সরুন আপনি, আমি জেলে দিচ্ছি। কোথায় কি থাকে আমার জানা। জয়তিলক বুঝতে পেরেছিল, এ বাড়িতে এই মেয়েটির অধিকার অনেক আগে থেকেই সাব্যস্ত হয়ে আছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এল দূর গাঁয়ের পাহারাদার লোকটি। হাতে তার সেদিনের ডাক। পিয়নের কাছ থেকে সে-ই নিয়ে রাখে চিঠিপত্র।

খামে বেশ ভারী ওজনের একখানা চিঠি এসেছে জয়তিলকের নামে। ভবানন্দ লিখেছেন। জয়তিলক চিঠি পড়ে জানল অন্তরার কথা। সে অসুস্থ। বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্য এখানে থাকতে চায়।

চিঠিতে অসুখের উল্লেখ না থাকলেও অন্তবার কাশি থেকে আর তার চেহারার দিকে তাকিয়ে জয়তিলকের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল অসুখটা কোন জাতের। টিউবারকুলোসিসের অনেকগুলো লক্ষণই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল অন্তরার মধ্যে।

জয়তিলক সে রাতে বিশেষ কোন কথা না বলে নিজের বিছানাটা নামিয়ে আনল নীচের ঘরে। ওপরের ঘরটা অন্তরার জন্য ছেড়ে দিলে। পাহারার লোকটির সাহায্যে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে অন্তরাকে পাঠিয়ে দিলে সেখানে। রাতে নিজের দুধটা অন্তরার খাবারের সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দিলে।

ভোরবেলা ডাক্তার চক্রবর্তী এলেন। ভবানন্দ মিত্রের বহুদিনের বন্ধু তিনি। শহরের নাম-করা চিকিৎসক।

এসে অন্তরার এক্সরেগুলো পরীক্ষা করলেন। আগেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। এখন চিকিৎসার শেষপর্বে ওষুধপথ্য ও পূর্ণ বিশ্রাম। তাই অন্তরা ভবানন্দ মিত্রের কাছে চিঠি লিখে সমুদ্রতীরের এই আস্তানাটা তার রোগমুক্তির জন্য চেয়ে নিয়েছিল। ভবানন্দ মিত্রকে চিঠি লিখেই সে সোজা লক্ষ্ণৌ থেকে চলে এসেছে এই সমুদ্রতীরের বাংলোয়। উত্তরপ্রাপ্তির অপেক্ষাও করেনি।

ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, রোগ এখনও নির্মূল হয়নি। কিছু সময় তো লাগবেই। ভয় নেই, আমি রোজ আসব। ওষুধ এখানে তো পাওয়া যাবে না, টাউন থেকেই আনতে হবে। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

অন্তরা মাথা নাড়ল। জয়তিলক বুঝেছিল অন্তরা ডাক্তার চক্রবর্তীর পূর্বপরিচিত। চলে যাবার সময় ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছিলেন, আপনাকে তো এর আগে দেখিনি মিঃ

জয়তিলক বলল, আমি জয়তিলক বোস। এখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।

কাজকর্ম কলকাতায় ?

না, দক্ষিণ ভারত আমার কর্মস্থল।

আর কোন কথা ডাক্তার চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেননি জয়তিলককে। সুতরাং অযথা উত্তর দেবার হাত থেকে সে রেহাই পেয়েছে।

শুধু যাবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন ডাক্তার চক্রবর্তী।

ক'দিনের ভেতর জয়তিলক বুঝতে পারল মেয়েটি দারুণ মুডি।

প্রথম দিকে জয়তিলককে তার ঘরে ঢুকতে দিতেই চাইত না। শেষে জয়তিলক তাকে অনেক বুঝিয়ে তবেই গৃহপ্রবেশের অনুমতি পেয়েছে।

এখন অন্তরার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। বরং সন্ধ্যা পার করে জয়তিলক বেড়িয়ে ফিরলে তাকে কেমন যেন একাকীত্বের শূন্যতায় পেয়ে বসে।

আবার কোনদিন সমুদ্রে স্নান সেরে ফিরতে দেরী করলে উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। অকারণ কান্নার একটা ঢেউ উঠে আসে তার বুক ঠেলে। যেদিন অন্তরা এমনি কোন কারণে দুঃখ পায় সেদিন সে তার বাঁধা রুটিনে নিয়মভঙ্গের ঢেউ তোলে। কাজের মেয়েটি জয়তিলকের কানে খবরটা পেঁছে দিলেই জয়তিলক ওপরে উঠে যায়। অতি শান্ত অথচ কমান্ডিং গলায় সে দরকারী কাজগুলো করতে বলে। অন্তরা তখন একেবারে বাধ্য মেয়ের মত সব কিছুই করে যায়। কোথায় চলে যায় তার শূন্যতাবোধ, তার জমে ওঠে অভিমান।

দুজনের ভেতর কথা হয় কম, তাও শুধুমাত্র অন্তরার প্রয়োজনগুলোকে কেন্দ্র করে।

চিঠি না দিয়েই এক অপরাহ্ণে এসে পেঁছলেন আংকল মিত্র। দীর্ঘ চেহারার মানুষটি যখন অন্তরার ঘরে ঢুকলেন তখন বাড়িতে ছিল না জয়তিলক। সন্ধ্যার সমুদ্রকে নির্জনে উপভোগ করার জন্য সে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে বসেছিল কতকগুলো বনঝাউয়ের আড়ালে।

ভবানন্দ মিত্র অনেকদিন পরে দেখলেন অন্তরাকে। বিছানার পাশে বসে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। অন্তরা উঠে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল। চোখের জল তার গড়িয়ে পড়ছিল দুচোখ উপচে।

ভবানন্দ নিজের আবেগকে সংযত করে নিয়ে বললেন, কত যুগ তোকে দেখিনি বেটি, একবারও কি মনে পড়ে না কাকুকে?

এবার নিজের হাঁটুর ভেতর মুখ লুকোল অন্তরা। সে তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ভবানন্দ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুই এসেছিস এতেই আমি খুশী। সুখের দিনে না হোক, অন্ততঃ কষ্টের সময় কাকুকে মনে পড়েছে এতেই আমার সব রাগ উবে গেছে পাগলী। কান্নাকাটি রাখ, অসুখের সময় কান্নাকাটি ভাল নয়।

তারপর চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ডাক্তারের সাড়া পাচ্ছি না তো, গেল কোথায় সে?

অন্তরা কান্নাভেজা চোখ মুছতে মুছতে বলল, ডাক্তারবাবু তো এবেলা আসেন না, সকালে এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে যান।

ভবানন্দ ওর ভুল চিন্তাটার সংশোধন করে উঠলেন, না না, আমি ডাক্তার চক্রবর্তীর কথা বলছি না, আমাদের ফেমাস সার্জেন জয়তিলকের কথা বলছি।

অন্তরা হঠাৎ বুঝতে পারল না কথাটা, ভবানন্দ কোনরকম কৌতুক করে বলছেন কিনা। সে বলল, মিঃ বোস অনেক সময় একটু বেশী সন্ধ্যে করেই বাংলোয় ফেরেন।

ভবানন্দ বললেন, ভাগ্য ভাল তোর, জয়তিলক এসে পড়েছে এ-সময়। ডাক্তার চক্রবর্তী নিশ্চয় ওর সঙ্গে কনসাল্ট করেই কাজ করছেন।

অন্তরা বলল, আমার সামনে কোন কথাই হয় না ওঁদের। তবে উনি প্রতি কাজে যেভাবে খবরদারী করেন তাতে মনে হয় আড়ালে ওঁদের ভেতর কিছু পরামর্শ হয়ে থাকবে।

হঠাৎ আবার বলে উঠল অন্তরা, জান কাকু, আমাকে একটুও গান গাইতে দেন না মিঃ বোস। আমি কতদিন গান গাইনি। আমার কান্না পেয়ে যায়। আমি যে গান কোনদিন শিখেছিলাম, সে কথাও ভুলে যেতে বসেছি।

ভবানন্দ বললেন, দুঃখ কোর না, ডাক্তারের কাজ ডাক্তার করছে, আমার কাজ এবার শুরু হবে। একশোর ওপর বাছাই রেকর্ড এনেছি মাদার, রাতদিন চুটিয়ে শোন। গানও গাইতে পারবে, তবে শরীরটাকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে কিছুটা সময় দিতে হবে বইকি! শরীরের তোয়াজ না করে রাতদিন গলার রেওয়াজ করে গেছ, তার শোধ তুলছে সে এখন। যত শ্রম হয়েছে তার ডবল বিশ্রাম চাই।

অন্তরা শুনতে শুনতে ভবানন্দের মুখের ওপর থেকে তার চোখ সরিয়ে দরজার দিকে ফেলতেই ভবানন্দ ফিরে তাকালেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে এসো এসো ডাক্তার। এতক্ষণ তোমার বিরুদ্ধে নালিশের পাহাড় মাথা তুলে উঠেছে।

অন্তরা অমনি বলে উঠল, মোটেও না কাকু। আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাইনি।

ভবানন্দ হেসে উঠে বললেন, ডাক্তারকে যে রোগীরা বিশেষ সুনজরে দেখে না, এটা অবধারিত সত্য। ডাক্তারকে ভালবাসলেই অসুখকেও ভালবাসতে হবে। ডাক্তার আর অসুখ হল ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত। রাশভারী স্বামী যেমন জেদী বউকে রাতদিন সজারুর কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে চলেছে—তেমনি সেই বউকে নইলে তার একদণ্ডও চলে না।

জয়তিলক হেসে উঠে বলল, বিয়ে তো করেননি আঙ্কল, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে এমন অভিজ্ঞের মত কথা বলছেন কি করে?

ভবানন্দ অমনি বলে উঠলেন, ইউ নটি বয়, কে বললে তোমাকে যে ভবানন্দ মিত্রের জীবনসঙ্গিনী নেই?

অন্তরা বলল, আমি সাক্ষী জয়তিলকবাবু, কাকু কোনদিনই বিয়ে করেননি।

ভবানন্দ বললেন, বটে! এখন রোগী বদ্যিতে দেখছি হোলি প্যাক্ট হয়ে গেছে। দুধে আমে মিশে গেল, আঁটি রইল পড়ে।

জয়তিলক বলল, আঁটি থেকেই তো আবার গাছ বেরুবে, তাই জীবনধর্মে আঁটিটাই খাঁটি বা আসল বস্তু।

ভবানন্দ বললেন, এখন ওসব কথা থাক, আজ রাতে খাবার কি ব্যবস্থা হয়েছে তাই বল।

অন্তরা জয়তিলকের মুখের দিকে তাকাল। কারণ হেঁসেলের ব্যাপারে সে এখন অচ্ছুৎ।

জয়তিলক বলল, আপনার চলে যাবার পর এখানে ছোটখাট একটা পোলট্রি গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ আমিষের ব্যবস্থা আছে।

ভবানন্দ মুখ সিঁটকে বললেন, ও নিরিমিষেরও বাড়া। রোগীর পথ্য মাংসের চেয়ে ডালভাত অনেক রুচিকর।

অন্তরা বলল, না, না, আপনি তা খাবেন কেন কাকু, আপনাদের জন্যে লহনা আলাদা করে রেঁধে দেবে।

ভবানন্দ বললেন, তার স্বাদ তাহলে রোগীর ঝোলের ওপর উঠবে না। নিজেকেই দেখছি পাচক বৃকোদর সাজতে হবে।

ঘরের অসুস্থ আবহাওয়াটা তিনজনের হাসিতে লঘু হয়ে মিলিয়ে গেল।

সম্ভ্রম বোধ এসেছে অন্তরার মনে। সে জানতে পারেনি এতদিন, নিঃশব্দে এত বড় এক সার্জেন নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রেখেছিল। এ কথাটা যখনই তার মনে হচ্ছে, নিজের প্রতিদিনের আচরণগুলোকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাব চেষ্টা করছে। কোনদিন সে অবাধ্য আচরণ করেছে জয়তিলকের কাছে, কোনদিন তাকে উপেক্ষার চোখে দেখেছে, এসব ভুলে যাওয়া ঘটনা মনের অতল থেকে উঠে এসে তাকে প্রায়ই চমকে দিয়ে যাচ্ছে। জয়তিলক এক দারুণ প্রতিভা এ কথা তার মনে এলেই হঠাৎ বেজে ওঠে সারা মন জুড়ে আলি আকবরের সরোদ।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে সে তাকিয়েছিল সমুদ্র আর ঐ ঝাউবনের দিকে। ঝাউয়ের পাতার সবুজ তারগুলো তখন বাজাচ্ছিল কি এক রাগিনী। চাঁদটা রাত জাগবে বলে যেন আকাশের নীল আসরে এসে বসেছিল। হঠাৎ জয়-তিলকের ভাবনা তার মনে উড়ে এল একটা রাতজাগা পাখির মত। সে তাকে ঘিরে অনেক অনেকক্ষণ উড়ে বেড়াল। ভারী সুন্দরী এলোমেলো ভঙ্গীতে উড়ে ফিরল পাখিটা। অঢেল জ্যোৎস্নায় ডুব সাঁতার কাটল। শেষে যখন চাঁদটা তলিয়ে গেল পশ্চিম সাগরে, তখন হঠাৎ আর একটা বিরাট পাখি কালো দুটো ডানা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। অন্ধকার সমুদ্রটা ক্ষ্যাপার মত আছড়ে পড়তে লাগল বালুর জমিনে। একটা বিভীষিকার ভেতর যেন কুঁকড়ে যেতে লাগল অন্তরা। ঐ কালো পাখিটা এসে বসল তার জানালার ওপর। আজম খাঁ। লক্ষ্মৌয়ের শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক মহম্মদ খাঁর ছেলে। আজমের কথা মনে আসতেই কলকাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের হল-ঘরটা আলোয় ঝলমল করে উঠল।

পর্দাটা সরে যেতেই দেখা গেল সারেঙ্গী, তানপুরাওয়ালা আর তবলচীর মাঝখানে বসে রয়েছে আজম খাঁ। ঝকঝকে চেহারার এক যুবক হাত তুলে নমস্কার জানাল শ্রোতাদের। অভিনন্দিত হল করতালিতে। শুরু হল গান। অন্তরার মনে হল যেন এক আকাশ জ্যোৎস্নার জল ঝরে পড়ল তার ওপর। সে স্নান করতে লাগল। সুরের ধারায় স্নান সেরে সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন শিল্পী গান শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, আর ছোট হলটা করতালিতে ফেটে পড়ছে।

কে তাকে টেনে নিয়ে গেল মঞ্চের ওপারে, যেখানে পর্দার আড়ালে সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পী আজম খাঁ।

প্রথমে কথা বলতে পারল না। নমস্কার করল হাত তুলে।

আজম খাঁ প্রতিনমস্কার করে তাকাল তার দিকে। তরুণ আজমের চোখে সেই মুহূর্তে ঘোর লেগেছিল। অন্তরা তখন সত্যিই জ্বলছিল তার রূপের আগুনে। অসাধারণ আপনার গান, এতক্ষণে কথা বলল অন্তরা।

হেসে বলল আজম খাঁ, আমি একেবারে সাধারণ, আপনার প্রশংসাই আমাকে অসাধারণ করেছে।

সুন্দর মুখ থেকে যে কথা বেরোয় তার জবাব দিতে জানে আজম খাঁ।

হেসে বলল অন্তরা, আপনি কিন্তু আমাদের প্রাণের গান কেড়ে নিয়ে গেয়েছেন।

অন্তরার কথা শুনে বিস্ময়ের চমক লাগল আজম খাঁর চোখে।

অন্তরা আজম খাঁর গাওয়া গানটা আবৃত্তি করল ঃ

বাজে বাজেরে মুরলিয়া
পাশ ক্যায়সে যাঁউ তোরে মিতোবা।
মুরলীকা ধুন শুনি কলন পরত হ্যায়
ক্যায়সে কাটে দিন রাতিয়া।

হাসল আজম খাঁ। সত্যিই তো সে মেয়েদের মুখের গানই গেয়েছে।

বলল, আপনি সঙ্গীতরসিক, মনে হচ্ছে আপনি সুগায়িকাও।

অন্তরা বলল, কি করে বুঝলেন আমি গান গাই ?

আজম বলল, গানের কথাগুলো যখন বলে যাচ্ছিলেন তখনই সুরে বাজছিল আপনার গলা।

অন্তরা মিষ্টি হেসে বলেছিল, গান হয়তো গাইবার চেষ্টা করি কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভালবাসি গান শুনতে।

এরপর একাডেমীর ছোট্ট হলটা ওদের আলাপ ধরে রাখতে পারেনি। আজমের বন্ধুর বাড়ি, ভবানন্দ মিত্রের বাড়ি হয়ে ওদের আলাপ লক্ষ্ণৌতে গিয়ে শেষ হয়েছিল।

আজমের বাবা মহম্মদ খাঁ অন্তরাকে ছেলের সঙ্গে বসিয়ে তালিম দিয়েছিলেন। তারিফ করেছিলেন অন্তরার গলার আর নিষ্ঠার। শেষে ছেলে আজমের সঙ্গে অন্তরার সাদী দিয়েছিলেন খুব ঘটা করে।

কলকাতার পরিচিত মহলে খবরটা কেউ জানল না। বাবা মা ছিল না অন্তরার, ভবানন্দ মিত্রের আশ্রয়েই কাটছিল তার দিন। বিয়ের পরে সে শুধু একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিল ভবানন্দকে তার বিয়ের খবরটা।

ভবানন্দের কাছ থেকে সে কোন উত্তর পায়নি। হয়তো ভবানন্দ উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবেছিলেন। চলে যাবার সময় যেমন অন্তরা তাঁকে বলে যায়নি, তেমনি জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে ভবানন্দ হয়তো কোন মন্তব্য করতে চাননি। কাকুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে অন্তরা বিষণ্ণ হয়েছিল ঠিক,

কিন্তু ভবানন্দ উত্তর না দিয়ে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন ও কথা তার মনে হয়নি। গোপনে আজমের সঙ্গে চলে আসায়, ভবানন্দের কাছে যে অপরাধ করেছে সে সম্বন্ধে সে সচেতনই ছিল।

ভবানন্দ মানুষটি গান-পাগল। নিজে উঁচুদরের শিল্পীই শুধু নন, প্রতিভার দেখা পেলে তাকে ফুটিয়ে তুলতে জানেন। তাঁর আশ্রয়ে অন্তরা বাবা মাকে হারিয়ে যে নিঃসঙ্গ ছিল না, একথা সুখ দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তেই সে অনুভব করেছে।

আজমকে ভালবেসেছিল অন্তরা। একটা গানের প্রতিভাকে যেমন ভালবাসে মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু আজম চেয়েছিল অন্তরার দেহের কুলভাঙা জোয়ারের স্রোতে ভেসে যেতে। ভোগও সে করেছিল। কিন্তু শুধু ভোগে তৃপ্তি কই! তীব্র বিতৃষ্ণা তাকে অল্প সময়ের ভেতরেই বিরূপ করে তুলেছিল অন্তরার ওপর। আজমের মনের সুতোয় গাঁথা ভালবাসার ফুলগুলো মালার থেকে একদিন খসে পড়ে গেল। অন্তরা যেমন ভেসে এসেছিল স্রোতে, তেমনি ভেসে চলে গেল।

লক্ষ্ণৌয়ের নানা মহলে ধাক্কা খেতে খেতে একদিন নিঃস্ব অবস্থায় তার মনে পড়ল আশ্রয়দাতা ভবানন্দের কথা। তখন যে রোগে তাকে ধরেছে তার থেকে পরিত্রাণের কড়ি তার ছিল না। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পরই সে ভবানন্দকে চিঠি লিখে চলে এল সমুদ্র-সৈকতের এই নির্জন নিবাসে। সে জানত, সংসারে তাকে সবাই ঘৃণা করলেও একটি মানুষের কাছে সব অপরাধ নিয়ে আশ্রয়ের আশায় দাঁড়ানো যায়। ভুল হয়নি অন্তরার ভাবনায়। ভবানন্দ এতদিন পরে অন্তরাকে দেখে কোন রকম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। ফিরে পাবার খুশীতে অতীতের বিরাট অন্যায়টাকে মুছে দিলেন।

ভবানন্দ অন্তরার প্রতিটি খবরই পেতেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি গান শিখেছিলেন প্রথম জীবনে। সেখানকার পরিচিত মহল মাঝে মাঝে তাঁকে অন্তরার খবর জানিয়ে চিঠি লিখত। তিনি দুঃখ পেলেও কারো চলার পথে বাধা দিতে বা উপদেশ ছড়াতে চাইতেন না।

সন্ধ্যায় অন্তরা নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল তার সদ্য ফেলে আসা অতীত জীবনটার কথা। হঠাৎ একটা সুর কানে এল। পাশের ছোট ঘরে টেপ রেকর্ডারে বাজছে তারই গাওয়া একটা গানের সুর। অন্তরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

ভবানন্দ তাকে অনেক যত্ন করে গান শিখিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা গান, রাগপ্রধান, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায়, আরও কত নামী সঙ্গীতস্রষ্টার গান। তাকিয়ে দেখ, বিধাতাপুরুষ কত যত্নে রঙ ঢেলে, গন্ধ ঢেলে, ফুলটিকে ফুটিয়ে তুলছেন, তবেই তো 'আহা আহা' বলে বাহবা দিচ্ছে মানুষ। গায়ককে স্রষ্টার মত সুরে সুরে ফুটিয়ে তুলতে হবে গান, তবে পাবে সমঝদারের স্বীকৃতি।

কত দিন কত রাত গান-পাগল এই মানুষটি তাকে কাছে বসিয়ে গান শিখিয়েছেন। গাইতে গাইতে থেমে গিয়ে বলতেন, গান শুনতে হয়। যত

শুনবে, সুর তত মনের মধ্যে বসতে থাকবে। একসময় সুরে সুরে ভরে যাবে যখন তোমার মন তখন কণ্ঠ দিয়ে সে সুর আপনি উপচে ছড়িয়ে পড়বে।

সামান্য শুনেই গলার খেলা খেলতে নেই। তাতে বাইরে থেকে পাওয়া সুর বাইরের ঘর থেকেই ফিরে যায়, একান্ত অন্দরমহলের অন্তরঙ্গতা কখনো পায় না।

ভবানন্দ তাকে গান শিখিয়েছিলেন। টেপও করে রেখেছিলেন তার গান। কত দিন পরে অন্তরা আজ শুনতে পেল নিজের গাওয়া গান। তার মনে হল, এ যেন অন্য এক জীবনের লীলা। কোন জন্মান্তরে এই সুর, এই গান তার গলায় গুঞ্জন করে ফিরেছিল সোনালী এক ঝাঁক মৌমাছির মত। পর পর অনেক ক'টি গান বাজল। সব ক'টিই ভবানন্দের কাছে শেখা অন্তরার গলার গান।

এক একটি গান শেষ হচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে জয়তিলক তারিফ করে উঠছিল সে গানের। অন্তরার মনে হচ্ছিল কে যেন একটি একটি করে গোলাপ, চাঁপা, গন্ধরাজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাকে লক্ষ্য করে।

একসময় টেপ করা গান বাজানো শেষ হল। অন্তরা বুঝতে পারল ভবানন্দ আর জয়তিলক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওরা নীচে নেমে গেল। সিঁড়িতে পায়ের সাড়া অনেক মৃদু মনে হল। অন্তরা বুঝল, ওরা ওকে বিশ্রাম থেকে জাগিয়ে কিছু বলতে চায়নি, তাই প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা একা বেড়িয়ে ফিরল জয়তিলক। ভবানন্দ কাজে গেলেন টাউনে। জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল লহনা। অন্তরা চুপি চুপি বলল, গোরাবাবু কোথায় রে ?

লহনা ফর্সা রঙের লোককে বলে গোরাবাবু। জয়তিলক লহনার কাছ থেকে গোরাবাবু সার্টিফিকেট পেয়েছিল। অন্তরার কথার জবাবে লহনা একটু হেসে বলল, গোরাবাবুকে পাঠিয়ে দেব দিদিমণি ?

লহনার ভাবনায় বুদ্ধির চমক আছে।

অন্তরা একটু ধমকের সুরে বলল, আমি কি তাই বলেছি তোকে ?

লহনা অনেক আগে, বেশ কিছুকাল ধরে অন্তরাকে এখানে দেখেছে। তার মেজাজ মর্জির সঙ্গে সে কিছুটা পরিচিত। তাই অন্তরার ধমকটা গায়ে মেখে নিয়ে সিঁড়িতে দ্রুত লয়ে যেন কত্থকের বোল বাজাতে বাজাতে নেমে গেল।

একটু পরে সিঁড়িতে আবার পায়ের সাড়া বেজে উঠতেই অন্তরা বুঝল, জয়তিলক ওপরে উঠে আসছে। অন্তরার মনে হল নিশ্চয়ই ঐ নির্বোধ মেয়েটা জয়তিলককে তার সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবে। সে সঙ্কোচে দরজার দিকে না তাকিয়ে চুমুক দিয়ে গরম দুধটুকু খেতে লাগল।

জয়তিলক ঘরে ঢুকে সোজাসুজি বলল, আমি কালই মনে করেছিলাম আপনাকে বলব কথাটা।

অন্তরা চমকে উঠল। কি বলতে চায় জয়তিলক ? তার কোন ত্রুটি বা অবাধ্যতার জন্য শাসন কি ?

সে অজ্ঞাত আশঙ্কা বুকে চেপে ম্লান চোখে তাকাল জয়তিলকের দিকে।

জয়তিলকের মুখে কিন্তু শাসনের ছবি ছিল না। একটা উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে।

জয়তিলক বলল, কাল সন্ধ্যেটা খুব সুন্দর কেটেছিল আমাদের।

অন্তরা কিছু যেন আন্দাজ করতে পারছিল। তবু সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। জয়তিলক বলল, আপনি যে এত ভাল গান করেন তা আমি জানতাম না।

অন্তরা চোখ নামিয়ে চামচটা অকারণে দুধের কাপে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আপনি খুব গান ভালবাসেন বুঝি?

জয়তিলক জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, গান কে না ভালবাসে বলুন? গানের মত গান হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই আসরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মেডিকেল পড়ার সময়ে হোল নাইট কনফারেন্স শোনার জন্যে বন্ধুরা সব হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

অন্তরা বলল, আপনি ক্লাসিক্যাল শুনতে ভালবাসেন বলে মনে হচ্ছে?

জয়তিলক বলল, শিল্পী যে গানই করুক, গলা ক্লাসিক্যালে সাধা না থাকলে গানের যথার্থ রূপটি ফুটে ওঠে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্তরার চোখে গভীর তৃপ্তির আলো। সে বলল, গান সত্যিই আপনি ভালোবাসেন দেখছি।

জয়তিলক বলল, আপনার গলার গান আঙ্কল টেপ করে নিয়েছিলেন। কাল সন্ধ্যায় সেই টেপ বাজিয়ে শোনালেন। অসাধারণ আপনার গলা।

প্রবল বেগে কে যেন একটা ধাক্কা দিল অন্তরার বুকে। সে অতি কষ্টে দুটো চোখ বন্ধ করে সে ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার সামনে জেগে উঠল একাডেমীর মঞ্চ। আজম খাঁ দাঁড়িয়ে পর্দার আড়ালে। সে আজম খাঁকে বলছে, অসাধারণ আপনার গান।

ঠিক তেমনি ভাষায় তার গানের তারিফ করে উঠল জয়তিলক। তাই কোন অশুভ আশঙ্কায় হঠাৎ দুলে উঠল তার মন।

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল অন্তরা, একদিন গান হয়তো ভালবাসতাম, কিন্তু সে এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে।

জয়তিলক বলল, এ কথা কেন বলছেন?

খুব কষ্টের একটা হাসি ফুটে উঠল অন্তরার মুখে। বলল, আপনিই তো বারণ করেছেন আমাকে গাইতে।

ও তাই বুঝি? কথাটা বলেই হাসতে লাগল জয়তিলক। বলল, আমার ভেতর দুটো মানুষ বাস করছে। একটা সমঝদার, আর একটা ডাক্তার। সমঝদার মানুষটা যখনই মাথা নেড়ে বলছে, 'গান চলুক, গান চলুক,' ঠিক তখনই ডাক্তার মানুষটা তেড়ে উঠে বলছে, 'চলবে না, চলবে না।'

অন্তরা আর জয়তিলক একই সঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামলে জয়তিলক বলল, আপনার নিজের গলাতেই গান শুনে যাব

আমি। এখন তো আপনি প্রায় সেরেই উঠেছেন।

অন্তরার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বলল, এ আপনার সান্ত্বনা। আমি জানি, আর কোনদিন তেমন করে গান গাওয়া আমার হবে না।

জয়তিলক বলল, আমি ডাক্তার হয়ে আপনাকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি, একেবারে সুস্থ হয়ে গেলে গান গাইবার বাধা আর আপনার থাকবে না।

অন্তরার চোখে জল টলমল করে উঠল। বলল, সত্যি আপনি আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন। আমি মনে মনে একরকম মরেই গিয়েছিলাম। গলা থেকে গান গেলে আমার আর রইল কি বলুন?

জয়তিলক হঠাৎ বলল, প্রশ্নটা সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে পারছি না, তবে একটা কথা জানার কৌতূহল জেগেছে মনে।

অন্তরা বলল, অসংকোচে বলতে পারেন।

জয়তিলক বলল, আপনার সংসারে কে আছেন?

ম্লান হেসে বলল অন্তরা, আপাততঃ নিজে ছাড়া কেউ নেই।

চুপচাপ জানালার বাইরে চেয়ে বসে রইল জয়তিলক।

এবার প্রশ্ন করল অন্তরা, কি দেখছেন?

জয়তিলক মুখ না ফিরিয়েই বলল, সি-গাল, সমুদ্র, ঝাউবন, দু'একটি নৌকোর ভেসে চলা।

অন্তরা বলল, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে দেখছেন। এতগুলো জিনিস একসঙ্গে কেউ দেখে না। সব কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে হবে মানুষ নিজের মন নিয়ে খেলা করছে।

জয়তিলক বলল, আমি মন-টনের কারবারী নই।

অন্তরা বলল, এই দিনের শুরুতেই মিছে কথাটা বলছেন কেন?

জয়তিলক তাকিয়ে রইল অন্তরার দিকে।

অন্তরা আবার বলল, যিনি হার্ট অপারেশন করেন তিনি হার্টের খবর রাখেন না, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

জয়তিলক হেসে বলল, কথায় আপনার কাছে হার মানলাম, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট জেনেছি, হার্টের খবর হার্ট অপারেশন করে পাওয়া যায় না।

অন্তরা বলল, এখন আমার একটা কৌতূহলের উত্তর পাব কি?

জয়তিলক চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে বলল, অবশ্যই।

আপনার সংসারে কে কে আছেন? প্রশ্ন করল অন্তরা।

জয়তিলক বলল, আমার সংসার ষোলকলায় পূর্ণ। মা বাবা, ছ'টি ভাই-বোন। দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ভাইয়েদের ভেতর ছোট। আমার দাদারা সকলেই কৃতী আর সংসারে প্রতিষ্ঠিত। একটি বোনের বিয়ে বাকী। আমার বাবা মা দারুণ রকম স্বাধীনচেতা। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বিশ্বাসী।

অন্তরা বলল, আমি বাবা-মাকে বেশী দিন কাছে পাইনি তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তাঁরা আমাকে কিভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লহনা। জয়তিলকের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ কি রান্না হবে?

জয়তিলক অন্তরার দিকে মুখ তুলে বলল, আজ থেকে এই দিদিমণির কাছে প্রতিদিনের রান্নার ব্যাপারটা জেনে নিও।

অন্তরা বলল, বেশ তো চলছিল। এর ভেতর আবার আমাকে টানাটানি কেন? আর তাছাড়া আমি অসুস্থ মানুষ।

জয়তিলক বলল, এখন থেকে আপনার আর নিজেকে অসুস্থ ভাবা চলবে না। আপনি সম্পূর্ণ না হলেও সুস্থ হয়ে গেছেন এ কথা আজ থেকেই আপনি ভাবতে পারেন।

অন্তরা হেসে বলল, আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না।

কেন? চোখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে অন্তরার দিকে তাকাল জয়তিলক।

অন্তরা বলল, একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি এতদিন, তবু বলছেন আমি নিজেকে সুস্থ বলে ভাবব?

জয়তিলক বলল, কাল সকাল থেকে আপনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোবেন।

অন্তরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা। বলল, সত্যি বলছেন, আমি বেড়াতে বেরোব? যদি ডাক্তার চক্রবর্তী অথবা কাকুর কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায়?

জয়তিলক বলল, সে দায়িত্ব আমার। ভরসা রাখুন আমার ওপর। প্রথম প্রথম আমার হাত ধরে হাঁটবেন। তারপর নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস জন্মালে নিজেই হাঁটতে পারবেন।

অন্তরা কিছু বলল না। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে একটা অসম্ভব সুখের ভাবনা ভাবতে লাগল। তার শরীরটা সহসা শিউরে উঠল। মনে হল সে যেন ভোরের কোমল রোদটুকু গায়ে মেখে জয়তিলকের হাত ধরে সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো বা হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলেছে করতালিতে সী-গালগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে, জয়তিলক তাকে ধরার চেষ্টা করছে, সে কিছুতেই ধরা না দেবার জন্যে ছুটছে আরও জোরে। কিন্তু একসময় জয়তিলকের কাছে তাকে হার মানতে হল। ততক্ষণে তার সবটুকু দম ফুরিয়েছে। জয়তিলক ছুটে এসে শক্ত করে জড়িয়ে না ধরলে সে নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয়ে লুটিয়ে পড়ত। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল অন্তরা, কখন তার ভাবনার ফাঁকে জয়তিলক নিঃশব্দে ঘর থেকে উঠে চলে গেছে।

ভবানন্দ মিত্রের সাগরবেলার বাড়িতে কাটল জয়তিলক ও অন্তরার আরও দুটি মাস।

ডাক্তারের হাত ধরে চলতে গিয়ে অন্তরা বুঝতে পারল এ হাত অনেক শক্ত আর নির্ভরযোগ্য। আপত্তি ছিল না জয়তিলকের দিক থেকেও। সে চিরদিনই গান ভালবাসে। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সে একজন উৎসাহী সমঝদার। অন্তরার সাধা গলার সঙ্গে কর্ণাটক সঙ্গীতের সুরের যোগ হলে অনেক সমৃদ্ধ

হবে সে গলা, এ ধারণা জয়তিলকের মনকে অধিকার করে বসল। কথাটা শুনে অন্তরারও উৎসাহের অন্ত রইল না।

একদিন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে জয়তিলক ভবানন্দ মিত্রের কাছে অন্তরাকে ভেলোরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখল। ভবানন্দ হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বললেন, নিয়ে যেতে চাও যাও। কিন্তু এ যাওয়া দু'রকমের হতে পারে। এক চিকিৎসার জন্যে, আর দ্বিতীয় সঙ্গিনী করে সঙ্গে নিয়ে। এখন এর ভেতর কোনটির কথা ভেবেছ আমাকে খুলে বল।

জয়তিলক বলল, আঙ্কল, আমি ডাক্তার কিন্তু গান আমার রক্তে ঢেউ তোলে। সেদিক থেকে ভেবে দেখেছি একটা প্রতিভাকে সুস্থ পরিবেশের ভেতর রাখতে পারলে সে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন অন্ততঃ শরীরের ব্যাপারে ও অন্য পাঁচজনের চেয়ে আমার ওপর বেশী ভরসা রাখতে পারে। আর তাছাড়া দক্ষিণী গানের জগৎ থেকে ওরও কিছু নেবার আছে।

জয়তিলকের কথায় বার্তায় কোন অস্পষ্টতা নেই, তাই ভবানন্দ ভালোবাসেন এই প্রতিভাধর যুবকটিকে। বললেন, উত্তম প্রস্তাব, আমার দিক থেকে কোন বাধার প্রশ্নই ওঠে না, তবে যাকে নিয়ে যেতে চাইছ, নিশ্চয়ই পেয়েছ তার সম্মতি?

জয়তিলক বলল, আমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাই, দিলেও আমাদের দুজনের মনের ইচ্ছাই যে এক তা আমরা বেশ অনুভব করেছি।

ভবানন্দ বললেন, তোমাদের দুজনকেই আমি ভালোবাসি, এমন স্পষ্ট প্রস্তাব না, তাই তোমাদের বোঝাপড়ার ভেতর কোন অস্পষ্টতা থাকে এ আমি চাই না।

একটু থেমে আবার বললেন, অন্তরা কি তার অতীত জীবনের কোন কথা তোমার কাছে বলেছে?

জয়তিলক বলল, কথায় কথায় সবই জেনেছি আমি ওর। এতে অন্তরার ওপর আমার আকর্ষণ আরো বেড়েছে।

ভবানন্দ বললেন, আমি তোমাদের মিলনে সবচেয়ে বেশী খুশী হব জানবে। তবু একটা কথা আজ তোমাকে বলতে চাই। এ কথার সবটুকু অন্তরা জানে না, কিন্তু তোমার জানা দরকার। কোন গোপনতা এই মুহূর্তে আমি রাখতে চাই না তোমার আর তার মিলনের মাঝখানে।

জয়তিলক তাকাল ভবানন্দের মুখের দিকে। ভবানন্দ বললেন, এসো ঐ ঝাউ-গাছগুলোর তলায় বসি। ওরা ঝাউয়ের তলায় গিয়ে বসল।

ভবানন্দ বললেন, তোমরা তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র মতে কি বলবে জানি না, কিন্তু আমরা উত্তরপুরুষের ওপর পূর্বপুরুষের রক্তের একটা প্রভাব অনেক সময় পড়তে দেখেছি। আর তাই স্বভাবের ভেতরেও আশ্চর্য রকম মিল দেখা গেছে ওদের।

জয়তিলক বলল, এটা অসম্ভব নয়।

ভবানন্দ বললেন, অন্তরার ইমিডিয়েট পূর্বপুরুষের ইতিহাসটা তোমার জেনে রাখা ভাল।

জয়তিলক তাকিয়ে রইল ভবানন্দের মুখের দিকে।

ভবানন্দ বললেন, ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলি। অন্তরার বাবা ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা, কিন্তু আমরা গান শিখতাম একই গুরুর কাছে।

অন্তরার বাবা স্বভাবে বড় চঞ্চল আর উচ্ছৃঙ্খল ছিল, দেহবিলাসে রুচির বালাই ছিল না তার। প্রতিবেশীর মেয়েরা সন্ত্রস্ত থাকত। একসময় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে পাড়ার বিশিষ্ট লোকেরা ওর বিরুদ্ধে একজোট হল। শেষে বেগতিক বুঝে ওকে আমরা ক'বন্ধু এনে তুললাম অন্য পাড়ায়। সেখানেও কিছুদিনের ভেতর শুরু হল অশান্তি আর ঝামেলা।

আমরা তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রায় জোর করেই ওর বিয়েটা দিয়ে দিলাম।

একটু থেমে ভবানন্দ বললেন, ভুলই করেছিলাম জয়তিলক। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে একটি নিরপরাধ মেয়ের সর্বনাশই করলাম।

জয়তিলক বিস্মিত। সে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে রইল ভবানন্দের মুখের দিকে।

ভবানন্দ বলতে লাগলেন, বিয়ের ক'টা দিন কাটতে না কাটতেই বুদ্ধিমতী মেয়েটি চিনতে পারল স্বামীর স্বরূপ। তারপর থেকে হাসিখুশি মেয়েটিকে ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখলাম। বিয়ের পর বোধকরি একটি বছরও কাটল না, অন্তরার জন্ম দিয়েই সে পৃথিবী থেকে সরে গেল।

জয়তিলক বলল, অন্তরার জন্ম দিতে গিয়ে কি ওর মা মারা যান?

ভবানন্দ বললেন, না; সে আত্মহত্যা করেছিল।

জয়তিলক আর কোন প্রশ্ন করল না দেখে ভবানন্দ বলে চললেন, স্ত্রী মারা যাবার পর আর বিয়ে করেনি অন্তরার বাবা, কিন্তু সেটা স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথার জন্য আদপেই নয়। মেয়েকে দেখাশোনা করার জন্য একটি আয়া দেখে শুনে নিযুক্ত করা হল। আয়াটি অচিরেই বাপ আর মেয়ে দুজনের সেবাতেই লেগে গেল। আমরা নানাভাবে ওর স্বভাব বদলের চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্বভাব নাকি মৃত্যুর পরেও অটুট থাকে, তাই হার মানতে হল ওর কাছে। আমরা আস্তে আস্তে সরে এলাম। ওর সঙ্গ আমাদের কাছে কেমন অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এই চঞ্চলতার ভেতর ওর মনের আর একটা দিক আমাকে অবাক করে দিত। ও যখন গান শিখত বা গাইত তখন ওর মুখের ওপর গভীর মগ্নতার একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম। ও তখন পারিপার্শ্বিক বেমালুম ভুলে ডুবে থাকত গানের ভেতর। ভদ্র পল্লী থেকে নিষিদ্ধ পল্লী সব জায়গাতেই শুধু গান শেখার জন্য সে যাতায়াত করত। মাঝে মধ্যে এক আধবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। সত্যি বলতে কি আমি নানাকাজের অছিলায় ওকে এড়িয়ে যেতাম।

আগের বন্ধুত্বে তখন আমাদের চলছিল ভাঁটার টান।

প্রায় এক যুগ পরে ওকে একদিন দেখলাম আমার সামনে এসে দাঁড়াতে। অন্তরা তখন সবে তেরো কি চোদ্দ বছরের কিশোরী। একপাশে দাঁড়িয়ে সে অবাক চোখে সব কিছু দেখছিল।

আমি ওদের ঘরের ভেতর এনে বসালাম। অনেকদিন পরে দেখা। মনে হল অন্তরার বাবার শরীরটা এরই ভেতর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়েছে।

একথা সেকথার পর আসল কথা উঠল। অন্তরাকে আমার কাছে রেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় আমার বন্ধু। ওর নাকি গানের গলা আছে, আর সে গলা আমার কাছে তালিম না পেলে কিছুতেই খুলবে না।

কৌতূহলী হয়ে কিশোরী অন্তরাকে দিয়ে গান গাওয়ালাম। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ ছাড়া এমন গান গাওয়া যায় না। দেখলাম বাবার কাছে অনেকদূর এগিয়ে গেছে ও। এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে মেয়েকে রেখে সেই যে ও চলে গেল, তার আর কোন হদিস পেলাম না। হঠাৎ একদিন এক অচেনা জায়গা থেকে চিঠি পেয়ে জানলাম, অন্তরার বাবা বাংলাদেশের বাইরে কোন এক পাহাড়ী জায়গায় আশ্রম খুলে বসেছে। সেখানে এক অসামান্য মহিলা নাকি তার উত্তর সাধিকা। আমাকে আশ্রম দেখার আমন্ত্রণও জানিয়েছে, অবশ্যই যাবার কোন বাসনাই জাগেনি আমার মনে।

তুমি জান, নিজের সংসার বলতে যা বোঝায় তা আমার নেই। আমি অন্তরাকে নিজের মেয়ে ভেবে নিয়ে গান শেখাতে লাগলাম। গান ও শিখত অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে। ভোর রাত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ও রেওয়াজ চালিয়ে যেত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, পরিবর্তন ঘটতে লাগল ওর মনের। গান শেখার নেশার সঙ্গে কি এক মাতাল হাওয়ায় উড়ে চলার নেশায় পেয়ে বসল ওকে। গুণগ্রাহী আর বন্ধুবান্ধবের দল ভীড় জমাল ওর চারিদিকে। তাদেরই তদ্বির আর চেষ্টায় ও গানের আসরে সুযোগ পেল বসার। নামও শোনা যেতে লাগল। আমার ঘর তখন ওর বন্ধুবান্ধবে সরগরম। একদিন কানে এল একটুকরো কথা। জানতে পারলাম, নামী কোন শিল্পীকে ডাউন করে ওর চেলারা ওকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। ওরা পর পর কয়েকটা আসরে দল বেঁধে যাবে। বিকৃত মন্তব্য ছুঁড়তে থাকবে বিখ্যাত শিল্পীটির গানের সময়, আর ঘন ঘন করতালিতে অভিনন্দিত করবে অন্তরাকে।

এ ব্যবস্থা হয়তো অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। কথাটা শোনার পর ওকে একসময় নিভৃতে ডেকে বললাম, অন্তরা, কাউকে ছোট করে নিজেকে বড় করা যায় না। আর ভাড়াটের হাততালির ওপর ভরসা না রাখাই ভাল। একদিন যারা তোমাকে তুলছে তারাই তোমাকে নামাবে।

সেদিন অন্তরা উত্তেজিত ছিল। বলল, তোমাদের যুগ চলে গেছে কাকু। ভাল গলা নিয়ে বসে থাকলে কেউ সেধে এসে ডেকে নিয়ে যাবে না।

একটি তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পীর নাম করে বলল, তুমি জান ও কি দরের গাইয়ে। কিন্তু টাকা উড়িয়ে, মেক আপ দিয়ে ও এখন হয়েছে প্রথম সারির

শিল্পী। ভাড়াটেদের হাততালির জোরে আজ ও উঠেছে তুঙ্গে। এখন ওর ডাক আসছে দূরে কাছে সব জায়গা থেকে।

আমি ওকে স্নেহ করি, তাই ওর স্বভাবের এই পরিবর্তনে দুঃখ পেলাম। আর কোন উপদেশ দিতে গেলাম না। আমি জানতাম, মানুষ আঘাত পেয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। উপদেশের চেয়ে তার দাম অনেক বেশী। তাই চুপ করে গেলাম।

এর অল্পদিন পরেই একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চে আজম খাঁর সঙ্গে ওব দেখা। তার পরের ঘটনাগুলো হয়তো তোমার অজানা নয়। আমি আজ তোমাদের নতুন জীবনে প্রবেশের মুহূর্তে এ কথাগুলো নিজের ভেতর গোপন করে রাখতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি বলেই সব বললাম। এখন তোমার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিলাম জয়তিলক। মেয়েটার ভেতরে বস্তু আছে। তাকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাও, তোমার কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।

জয়তিলক বলল, প্রার্থনা বলছেন কেন আঙ্কল, আশীর্বাদ করুন যেন গভীর দুঃখের দিনেও ওকে ভালবাসতে পারি।

ভবানন্দ মিত্রের ভাবান্তর হল। তিনি কতক্ষণ জয়তিলকের হাতখানা চেপে ধবে বসে রইলেন।

দক্ষিণ ভারত থেকে অন্তরার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার খবর নিয়ে চিঠি এল। জয়তিলকের চিঠিতেই অন্তরা ভবানন্দকে দু'ছত্র লিখে জানিয়েছে, সে দক্ষিণী গুরুর কাছে সঙ্গীতে তালিম নিচ্ছে।

খুশী হলেন ভবানন্দ। চিঠির উত্তরও দিলেন। তারপর পুরো দু'টি বছর নীরবতা। ভবানন্দ সাধ্যমত মানুষের উপকার করে যাওয়াতে বিশ্বাসী, তাই প্রত্যাশার দুঃখ তাঁকে পীড়া দিতে পারল না।

দু' বছর পরে চিঠি এল জয়তিলকের। সে পশ্চিম জার্মানীর কোন হসপিটালে ভিজিটিং সার্জেন হয়ে তিন বছরের জন্যে চলে যাচ্ছে। অন্তরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে গান ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এদিকে বিখ্যাত এক রেকর্ড কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টরের সঙ্গে জয়তিলকদের আলাপ হয়েছে। তিনি তাঁর বাংলাদেশের অফিস থেকে অন্তরার গানের রেকর্ড যাতে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানাবেন বলেছেন। অন্তরা নাকি বলে-ছিল, রেকর্ড কোম্পানী একটা দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ। ঢোকার পথ শক্ত, বেরোনোর পথ ততোধিক।

জয়তিলক শেষে লিখেছে, অন্তরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিনই আমি দাঁড়াইনি। ও বাংলাদেশে যেতে চাইছে, যাক। শুধু অনুরোধ, সম্ভব হলে আপনি ওকে লক্ষ্য রাখবেন। ও উন্মাদনার বশে কাজ করে। ওকে একটু সংযত হতে সাহায্য করবেন।

ভবানন্দ শুনলেন, অন্তরা কলকাতা এসেছে। উঠেছে এক নামী হোটেলে।

সেখানে দু'বেলা পার্টি দিচ্ছে রেকর্ড কোম্পানীর হর্তাকর্তাদের।

কিছুকাল পরে শুনলেন, রেকর্ড বেরিয়েছে অন্তরার। নিজে গিয়ে কিনে আনলেন। বাজিয়ে শুনলেন চোখ দুটি বন্ধ করে। খাসা হয়েছে অন্তরার গান। গলার কাজ হয়েছে পরিষ্কার। আনন্দ পেলেন ভবানন্দ। দক্ষিণে গিয়ে যে বসে থাকেনি অন্তরা তার প্রমাণ পেলেন এতদিনে। অভিমান যে না হচ্ছিল তাঁর তা নয়, তবে অন্তরার কৃতিত্বে তাঁর অন্তর এমন ভরে উঠেছিল যে অভিমান সব ঠেলে ওপরে উঠে আসতে পারছিল না।

কাগজে সমালোচনা বেরোল রেকর্ডের। প্রশংসায় ভরে উঠেছে পাতা। ভবানন্দ এক বড় বিক্রেতার কাছে জিজ্ঞেস করে জানলেন, রেকর্ডখানা বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর। কোন একদিনে নাকি দেড়শো খানা রেকর্ডও বিক্রি হয়েছে।

ভবানন্দ খুব খুশি হলেন। কিন্তু পথে আসতে আসতে তাঁর মনে হল, এ আবার অন্তরার সেই আগের খেলা নয় তো! টাকা ছড়িয়ে বাজার থেকে নিজের রেকর্ডগুলো কুড়িয়ে নেওয়া। চাহিদা সৃষ্টির সোজা পথ।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে একসময় নিজের মনকে শাসন করলেন। অন্তরার রেকর্ড বিক্রি হোক ওঁর অন্তরের ইচ্ছা, তাহলে এসব অশুভ ভাবনা কেন?

ভবানন্দ শেষে অন্তরার কৃতিত্বকে স্বাভাবিক আনন্দে স্বীকার করে নিলেন।

পর পর রেকর্ড বেরোতে লাগল অন্তরার। গান শুনতে শুনতে মনে হল ভবানন্দের, কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। প্রথম দিকের গানে শিল্পীর যে প্রাণঢালা আকুতি ছিল, এখনকার রেকর্ডে তা যেন আর নেই। এ যেন কোম্পানীর ফরমায়েসী গানে গলা দিতে হচ্ছে। অতি আধুনিক গানের এলোমেলো কথায় এলোপাতাড়ী সুরের খেলা চলেছে।

দুঃখ পেলেন ভবানন্দ। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। একজন নামজাদা ভাস্কর যখন জনতার হাতে তাঁর সৃষ্ট মূর্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক তেমন।

ইতিমধ্যে খবর আসতে লাগল হাওয়ায় উড়ে, অন্তরা ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। রোজ তাকে দেখা যাচ্ছে ম্যানেজার সাহেবের গাড়িতে। অন্তরা নাকি এখন সাহেবের খাস কামরার সঙ্গিনী।

ভবানন্দ মিত্র ভাবেন, কার অপরাধে এমন হল? জয়তিলকের মত এমন একটা প্রতিভাকে চিনতে পারল না অন্তরা। কি আশ্চর্য রক্তের প্রভাব। কি ভীষণ নামের নেশা।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল অন্তরার সঙ্গে। তানপুরার তার কিনতে এসেছিল একটা দোকানে। সেই পথে যাচ্ছিলেন ভবানন্দ। অন্তরাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। চোখাচোখি হতেই অন্তরা নেমে এল পথে। অনিচ্ছায় একটা প্রণামও করতে হল।

ভবানন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অন্তরা বলল,

কিছু মনে কোর না কাকু, আমি যে তোমার কাছে গান শিখেছি, একথা কাউকে না বললে আমার উপকার হবে। এখন সবাই জানে আমি দক্ষিণী গুরুর কাছ থেকে তালিম নিয়ে এসেছি। ওরা সেজন্যে আমাকে আলাদা চোখে দেখে।

ভবানন্দ বুঝলেন, অন্তরার অধঃপতন একেবারে শেষ অঙ্কে এসে পোঁছেছে।

তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আমি তো রেকর্ড-আর্টিস্ট অন্তরাকে গান শেখাইনি, আমি যাকে গান শেখাতাম সে গান শেখার তাগিদেই গাইত, নামের জন্যে গাইত না। সে যাই হোক, শরীর তোমার ভাল যাচ্ছে তো? জয়তিলকের খবর কি?

অন্তরা বলল, এত কথা বলবে জানলে ও কথা তোমাকে বলতাম না। আগেও বলেছি এখনও বলছি, নাম করতে গেলে চুপচাপ বসে থাকলে চলে না। কেউ কারো হয়ে কিছু করে দেবে না। নিজের পথ নিজেকেই কেটে চলতে হবে। হ্যাঁ, জয়তিলকের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? সে জার্মানী থেকে ফিরে কাজে যোগ দিয়েছে বলেই শুনেছি। অন্ততঃ হিসেব মত এতদিনে ওর ফিরে আসার কথা।

ভবানন্দ বুঝলেন, নামের পেছনে ছুটতে গিয়ে পেছন ফিরে তাকানোর অবকাশ আর নেই অন্তরার।

বললেন, অনেক দিন পরে দেখলাম তোমাকে। চেহারায় সে রুগ্নতা আর নেই দেখে খুশিই হলাম। জয়তিলক নিজে ডাক্তার। তার কাছে থেকে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

একটা দামী গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। অন্তরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করল।

ভবানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, ইনি আমাদের মজুমদার সাহেব। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ড কোম্পানীর প্রাণশক্তি।

হাসলেন মিঃ মজুমদার, বললেন, প্রাণ-ভোমরা। তোমাদের ছেড়ে দিলে রেকর্ড কোম্পানী শক্তিহীন। কি বলেন মশায়?

ভবানন্দের দিকে তাকিয়ে রসিকতায় তাঁকে সাক্ষী মানলেন।

ভবানন্দ কোন উত্তর করলেন না। একটুখানি ভদ্রতার হাসি হাসলেন।

জাস্ট এ মিনিট প্লীজ, অন্তরা প্রায় দৌড়ে তানপুরার দোকানে ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে ফিরে এসে বলল, চলুন মজুমদার সাহেব, আপনার হয়তো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রতার খাতিরে মিঃ মজুমদার বললেন, আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

অন্তরা বলল, ওঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের জানাশোনা।

একটু হেসে মজুমদার সাহেব অন্তরাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি ভবানন্দের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভবানন্দ দেখলেন, মজুমদার সাহেব কিংবা অন্তরা কারো চোখই তাঁর দিকে নেই। উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে দুজনে

পাশাপাশি বসে। সেই মুহূর্তে জয়তিলকের জন্যে দারুণ একটা দুঃখ অনুভব করলেন ভবানন্দ। সে দুঃখের অনুভূতি তাঁকে বেশ কয়েকটি দিন ধরে পীড়া দিতে লাগল।

মজুমদার সাহেব কঠিন কর্মকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিতে ভালোবাসেন। কাক-পক্ষীতেও টের পায় না কোথায় তিনি অবসর যাপন করছেন। মজুমদার সাহেব অবশ্য যথার্থ অর্থে অবসর বিনোদন করেন। সঙ্গে থাকে সঙ্গিনী। জীবন-সঙ্গিনীকে তিনি সংসার সঙ্গিনীর মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু অবকাশ-সঙ্গিনীর জন্য তাঁকে আর টানাটানি করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর। অবকাশ বিনোদনে চাই তেমন সঙ্গিনী, যিনি সঙ্গ দেবেন, আর হৃদয়ে বাজাবেন সঙ্গীতের সুর।

দু তিনটি দারুণ রকম উন্নতিকামী গায়িকার ভেতর থেকে তিনি মনে মনে নির্বাচন করেন একটিকে। প্রতিবারেই তাঁর স্বাদ বদলানো চাই। প্রতি বস্তুরই স্বাদ গন্ধের তফাত আছে। যিনি দক্ষ সমঝদার তিনি বস্তুতে বস্তুতে রকমারি স্বাদ সন্ধান করে বেড়ান। সেদিক থেকে মজুমদার সাহেব অসাধারণ সমঝদার।

এবার অন্তরা তাঁর অন্তরে ঠাঁই পেয়েছিল। স্থানটা আগে ভাগেই স্থির করে রেখেছিলেন। চাঁদিপুর-অন-সী। উড়িষ্যার এই নির্জনতম সাগরতীরের খবর বড় কেউ একটা রাখে না। তাই ট্যুরিস্ট বাংলোয় স্থান পেতে কোন অসুবিধাই ছিল না। তবু বালেশ্বরের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসারকে লিখে আগে-ভাগে ট্যুরিস্ট লজ বুক করে রেখেছিলেন।

যাত্রার দুদিন আগে মজুমদার সাহেব ডেকে পাঠালেন অন্তরাকে। বললেন, তৈরী হয়ে নাও, তরশু রওনা দিতে হবে।

অন্তরা বিস্ময়ে ভরা দুটো চোখকে ওপরে তুলে বলল, ওমা, কোথায়?

মজুমদার সাহেব বললেন, নিশ্চয় ভেলোরে নয়।

অন্তরা বলল, তা আমি জানি। তবে স্থানটার নাম শুনলে বুঝতে পারব দূরে না কাছে।

মজুমদার বলল, সে প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

অন্তরা বলল, মাসখানেকের ভেতর বিশাল ভারত মিলন মেলায় গান গাইবার ডাক পেয়েছি। তার জন্যে প্রস্তুতির দরকার, তাই বলছিলাম।

মজুমদার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, পাপিয়া নাগ সঙ্গে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি, তাকে এখনও কথা দিইনি। তোমার যখন অসুবিধে তাহলে থাক। পাপিয়া যাক আমার সঙ্গে।

অন্তরার এই মুহূর্তে নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্যে জিভটা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। সে হঠাৎ রুমাল বের করে কিছু বেশী সময় ধরে শুকনো চোখ দুটো মুছল। তারপর ধরা গলায় বলল, জানি, পাপিয়ার গান আপনার বেশী পছন্দ। সেদিন ই. পি. হয়েছে ওর। মুখের কথা বলতে হয়, তাই একবার

বললেন। নইলে মনে মনে তো ঠিকই করে ফেলেছিলেন পাপিয়াকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে।

মজুমদার সাহেব দেখলেন, এক চালেই বাজী মাৎ হয়েছে। এখন গলার স্বর নরম করে বললেন, ঐ নির্জন সমুদ্রতীরে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।

অন্তরা বলল, আপনি আগে-ভাগেই রাগ করে বসলেন। আমার গানের সুবিধে অসুবিধের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব বলুন?

একটু থেমে আবার বলল, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি যাব না, একথা আপনি ভাবলেন কি করে? যিনি আমাকে গানের জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, তাঁর কথার চেয়ে বড় কিছু আছে বলে যে আমি ভাবতেই পারি না।

খুশি হলেন মজুমদার সাহেব অন্তরার অন্তরিক টানটুকু দেখে।

এরপর রাতের ট্রেনে এলেন বালেশ্বর। স্টেশনে নেমেই দেখলেন ভোরের আয়োজন চলেছে। ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলেন। ট্যুরিস্ট লজে এসে পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল না।

রাতে ট্রেনে ঘুম নামেনি অন্তরার চোখে। সে বসে বসে ভাবছিল। কত পথ কত প্রান্তর পেরিয়ে এলো সে। জীবনের পথেও তার যাত্রা কম হল না। স্টেশনের পর স্টেশনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলার যেন বিরাম নেই। কখন কোথায় একেবারে শেষ হবে যাত্রা তা সে জানে না, কে যে তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে তা কোনদিন জানার চেষ্টাও করেনি সে। শুধু ভেসে চলার আনন্দেই সে ভেসে গেছে। ঘাটে ঘাটে তার বেচাকেনা। এক ঠাঁই কাজ শেষ হলে নতুন বন্দরে ভেসে চলা। বিশেষ কোন একটি বন্দরের বন্ধন-স্মৃতি তার কাছে উজ্জ্বল নয়। ট্যুরিস্ট লজের সামনেই ঝাউবন। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ছবির মত সাজানো বাংলো। বারান্দায় বসে সমুদ্রের ঢেউ গোনা যায়।

মজুমদার সাহেব আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন। হাতলের ওপর লীলাভরে বসে আছে অন্তরা। পাখি উড়ছে। অগুণতি পাখির ঝাঁক।

মজুমদার সাহেব বললেন, কেমন লাগছে অন্তরা?

অন্তরা বলল, এ ভাল লাগার তুলনা নেই।

মজুমদার সাহেব আবার বললেন, জায়গাটা কেমন নির্বাচন করেছি?

অন্তরার মুখে খুশির ঢেউ ভেঙে পড়ল, ওয়াণ্ডারফুল। এটা নির্বাচন কেন বলছেন, রীতিমত আবিষ্কার।

মজুমদার সাহেব অন্তরার হাতখানাতে নিজের হাতের আলতো চাপ দিয়ে বললেন, তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, এতেই আমার তৃপ্তি। তুমি আর্টিস্ট, তোমার ভাল লাগা না লাগার অনেক দাম।

অন্তরা বলল, এমন করে বলবেন না। আপনি গাইতে না জানলেও শিল্পীর সৃষ্টিতে আপনার দান কম নয়। আপনি আমাদের সঙ্গীত-সংসারের প্রধানপুরুষ।

মজুমদার সাহেব খুশি হলেন মনে মনে।

বিকেলে রোদের তেজ কমে এলে জায়গাটা ধীরে ধীরে নির্জন হয়ে এল। মাটি আর বালি মেশা শক্ত বেলাভূমিতে হাঁটছিল দুটি মূর্তি। অন্তরা মাঝে মাঝে অষ্টাদশী হয়ে যাচ্ছিল। চঞ্চল পায়ে পাখিদের কাছাকাছি ছুটে গিয়ে হাততালি দিয়ে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছিল। ফিরে এসে হাঁটছিল মজুমদার সাহেবের সঙ্গে। কখনো হাতে হাত রেখে, কখনো হাত ছেড়ে দিয়ে।

এক জায়গায় বনঝাউয়ের জটলা পার হয়ে আসার সময়ে মজুমদার সাহেব বললেন, অন্তরা এটি বোধহয় পৃথিবীর নির্জনতম স্থান।

অন্তরা বলল, আসুন এখানে একটু বসা যাক।

মজুমদার সাহেব তাই চাইছিলেন।

ওরা বালির ওপর বসে পড়ল। পেছনে বনঝাউয়ের সংসার, সামনে সমুদ্র। আকাশে তখন ধূসর আলোটুকু ধরে রাখার সকরুণ চেষ্টা। মজুমদার সাহেব মুঠো করে ধরলেন অন্তরার হাত। অন্তরা সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল।

একটা ঢেউ কিছু ভেজা হাওয়া পাঠিয়ে দিল। অন্তরার শ্যাম্পু-করা চুলগুলো উড়ছিল। হঠাৎ অন্তরার মনে হল, যে মানুষটি তার হাত ধরে আছে সে জয়তিলক। ভাবতে গিয়ে সারা শরীরে তার রোমাঞ্চ খেলে গেল। সেই অসুস্থ থাকার দিনগুলোতে কে তাকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

জয়তিলক বলল, কি ভাবছ অন্তরা ?

অন্তরা নরম গলায় বলল, আমার সব ভাবনা যার কাছে এসে শেষ হয়েছে তার কথাই ভাবছি।

হাতে আরও জোরে চাপ দিলেন মজুমদার সাহেব। অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগোলেন আরও এক ধাপ।

কাঁপা গলায় যেন বলল জয়তিলক, আমার চেয়ে এই মুহূর্তে আর কেউ বেশী সুখী আছে কিনা জানিনা অন্তরা। আমার সম্মান সম্ভ্রম আজ তোমার এই হাতের ভেতরেই বাঁধা।

অন্তরার মুখে রহস্যময় জ্যোৎস্নার হাসি। সে যেন অনেক দূরের কোন অন্ধকার জগতে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, আজ আমার যা কিছু আছে, সব তোমার। তুমি দস্যুর মত লুঠ করে নাও। আমি আমার একান্ত আপনার বলে কোন কিছু গোপন করে রাখব না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মজুমদার সাহেবের বুকের ওপর থেকে যখন বন্যার মত চুলের রাশ সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অন্তরা, তখন তার চোখ উপচে জল ঝরছে। জয়তিলক কোথাও নেই, একটা বুভুক্ষু প্রৌঢ় তার হাত ধরে বলছে, এ সুখের স্পর্শ অনেকদিন মনে থাকবে অন্তরা।

অন্ধকার সমুদ্রের হাহাকার শুনতে শুনতে অন্তরা মজুমদার সাহেবের হাত ধরে এসে ঢুকল টুরিস্ট বাংলোয়। খানসামা এগিয়ে এসে ডিনারের মেনুর কথা জানতে চাইলে মজুমদার সাহেব বললেন, মেমসাব কো পুছো।

অন্তরা বলল, রাতে আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমার জন্যে চিকেন তন্দুরীর অর্ডার দিচ্ছি।

খানসামা চলে গেল। মজুমদার সাহেব ঘরে ঢুকে একখানা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। অন্তরা আলো জেবলে আয়নায় নিজেকে দেখল। চিরুনি চালিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে ঠিক মত গুছিয়ে নিল। তারপর একটুখানি প্রসাধনের টাচ নিয়ে এসে বসল বিছানার ওপর।

মজুমদার সাহেব অন্তরার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আজ ইন্দ্রাণী।

অন্তরা খিল খিল করে হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। আমি ইন্দ্রাণী! আবার হাসি। আমি ইন্দ্রাণী! হাসির তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ঘরের ভেতরে।

হাসিটা সুখের কি রুদ্ধ কান্নার তা বোঝা গেল না।

মজুমদার সাহেব বললেন, এমন করে হাসছ কেন, আমি তো ভুল কিছু বলিনি। আমার চোখে এই মুহূর্তে তুমি যে ভাবে ধরা পড়েছ, তাই আমি স্পষ্ট করে বলেছি। আবার হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল অন্তরা, তাহলে আমার ইন্দ্র আজ রাতে আপনি মজুমদার সাহেব।

মজুমদার বললেন, বেশ তো 'তুমি' শুরু হয়েছিল, আবার 'আপনি' কেন?

অন্তরা হাসতে হাসতে বলল, জিভের ওপর ভরসা কি। সবার সামনে আপনি বলতে বলতে ফস্ করে যদি তুমিটা বেরিয়ে পড়ে কখনো, আর সে সময় যদি আপনার অনেক পেয়ারের সুচন্দ্রা সেন উপস্থিত থাকে তাহলে তার গলায় অমনি বেজে উঠবেঃ 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে'।

মজুমদার সাহেব অন্তরাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আর হুড়োহুড়ি কোর না, এখুনি গান গাইতে হবে। আমার সন্ধ্যাগুলো ভরিয়ে তুলতে চাই তোমার গানে।

অন্তরা বলল, আপনার দিকে তাকিয়ে যদি সব গান ভুলে যাই?

মজুমদার সাহেব এবার রসিকতা করলেন, ভয়ে না ভালোবাসায়?

অন্তরার হাসি যেন আর থামে না। তারি মাঝে বলল, দুটো মেশানো। কোম্পানীর কর্ণধারের সামনে ভয় আর নির্জন বাংলোর সঙ্গীর মুখোমুখি ভালোবাসা। মজুমদার সাহেব এবার বললেন, গান অনেক গলার কাছ থেকে উপহার পেয়েছি, কিন্তু কথা আর সুরের এমন সুস্পষ্ট মিলন একই গলা থেকে পাওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য।

অন্তরা এবার আত্মস্থ হল। তার চটুলতা দূর হয়ে গিয়ে একটা সুন্দর ভাবুকতার ছবি ফুটে উঠল মুখে।

সে ধীর গলায় বলল, আপনি গান শুনতে চান, কি গান শোনাব বলুন?

মজুমদার সাহেব বললেন, যে গান কখনো পুরানো হয় না।

অন্তরা বলল, তাহলে আমাকে ক্লাসিক্যাল গাইতে হয়। কিন্তু বিনা যন্ত্রে ওটা গাওয়া যাবে না।

মজুমদার বললেন, না, না, ওসব গলার কাজওয়ালা গান নয়, প্রাণ ঢেলে

দেওয়া গান। যাকে বলে প্রেম পর্বের গান ঐ গান মানুষের মনে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

অন্তরা বাঁকা চোখের চাহনি হেনে বলল, আর এই পর্যায়ের গানের চাহিদাও বেশী, কি বলেন ?

মজুমদার বললেন, প্রেমই তো কোম্পানীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অন্তরা হেসে বলল, তাই জেনেই কবি প্রেমভিখারীর হাহাকার নিয়ে গান বেঁধেছিলেন ঃ 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে'।

অন্তরা গানটি গাইল। গাইতে গাইতে ভাবের অনেক গভীরে চলে গেল। গান শেষ হলে তার মনে হল, যেন একটা শুচিতার ছোঁয়া লাগল তার গায়ে।

মজুমদার সাহেব বললেন, তুমি যে রবীন্দ্র সঙ্গীতেও কৃতী তা আমার জানা ছিল না। আধুনিক গাইয়েদের গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ঠিক তেমন করে বাজে না। অবশ্য দু'একটি শিল্পীর কথা বাদ দিলে।

অন্তরা বলল, এবার তাহলে আমাকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড করার সুযোগ দিন।

মজুমদার সাহেব বললেন, গানের প্রতিটি বিভাগে অগণিত শিল্পী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এক বিষয়ের শিল্পীর বিষয়ান্তরে না যাওয়াই ভাল।

অন্তরা বলল, কিন্তু দীপা মিত্র, সোমা চ্যাটার্জীর বেলা নিয়মভঙ্গ হল কেন ? তারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর থেকে মুখ বদলাতে বিষয়ান্তরে ঘুরছে না ?

মজুমদার বললেন, ওরা একদিন আমাদের ধরে উঠেছে, এখন গাছে ওঠা রপ্ত করে আমাদের ফল পেড়ে খাওয়াচ্ছে। ওদের খেয়াল-খুশিতে এখন আমাদের চলতে হয়। ওদের সঙ্গে তাল দিতে না পারলেই অন্য কোম্পানী আসরে ফল কুড়োতে নেমে যাবে।

অন্তরা বলল, যাকগে আদার ব্যাপারীর ওসব খবরে কাজ কি।

মজুমদার সাহেব কি যেন ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর বললেন, তোমার বেলা আমাদের কোন বাধাই নেই। তবে পয়সা চাও তো তোমার ঐ আধুনিক গানের আসর ছেড়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতে আসতে চেও না। এখানে নাম আর পয়সা দুটো করতেই সময় লাগবে।

অন্তবা বলল, আমি নিজের জায়গাতেই খুশি। বেঁচে থাক অরণ্যদেব চৌধুরীর সুর আর আমার গলা। তাতেই আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ।

মজুমদার সাহেব কি ভেবে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, জানো অরণ্যের সুর পছন্দ হল না একটি মেয়ের। প্রায় মুখের ওপর বলে গেল সেদিন।

অন্তরা তীক্ষ্ম বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি করে বলল, পছন্দ হল না। সেই সুধাকণ্ঠী গায়িকাটি কোন স্বর্গে বিচরণ করেন ?

মজুমদার সাহেব পঞ্চ'ম'কারে আসক্ত হলেও গুণী লোক। যথার্থ গলা চিনে নিতে কখনও ভুল হয় না তাঁর।

তিনি বললেন, সাধারণ একটি ফাংশনে আমি তার গান শুনেছিলাম। গলা একেবারে সাধা। শত্রুতেও প্রশংসা না করে পারবে না।

অন্তরা বলল, আপনি যখন প্রশংসা করছেন তখন নিশ্চয়ই অসাধারণ গলা।

মজুমদার সাহেব বললেন, অসাধারণ না হলেও কানে বাজার মত সুরেলা। তারপর ব্যাপারটা শোন, আমি ঠিকানা খোঁজ করে লোক মারফৎ অফিসে ডেকে পাঠালাম।

অন্তরা সরব মন্তব্য করে উঠল, কি সৌভাগ্য মেয়েটির।

মজুমদার সাহেব বললেন, নতুন প্রতিভাকে খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।

অন্তরা বলল, তারপরের ঘটনা বলুন। মেয়েটি পড়ি কি মরি করে রেকর্ড কোম্পানীর কর্ণধার সাহেবের খাস কামরায় এসে হাজির।

মজুমদার বললেন, ঠিক তা নয়। মেয়েটি আমার লোকের মুখে খবর পাঠাল, স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন যাব। অবশ্য যাবার আগে ফোনে জানিয়ে দেব।

অন্তরা বলল, সেই পতিব্রতার জন্যে কতদিন আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হল?

মজুমদার সাহেব বললেন, চার পাঁচদিন পরেই এল। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। স্বামী রত্নটিকে দেখলাম। একেবারে সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। মেয়েটিকে তো আগেই দেখেছি, অত্যন্ত সাদামাটা ধরনের।

অন্তরা বলল, বয়েস কত?

মজুমদার ভেবে বললেন, সাতাশ-আঠাশ হবে বোধকরি। তোমাদের বয়েস অনুমান করা আবার মুশকিলের ব্যাপার কি না।

অন্তরা অমনি বলল, বলুন তো আমার বয়েস কত?

হেসে বললেন মজুমদার সাহেব, তুমি উর্বশী, অনন্তযৌবনা। তোমার বয়স এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

অন্তরা আবার হেসে দেহখানাকে নামিয়ে আনল প্রায় বিছানার কাছাকাছি। হাসি থামলে বলল, আপনি না কিছুক্ষণ আগে আমাকে ইন্দ্রাণী বলেছিলেন? এখন ইন্দ্রসভায় সাধারণ নর্তকী হয়ে গেলাম যে।

মজুমদার সাহেবও হাসলেন। বললেন, সাধারণ নর্তকী বলছ কেন, উর্বশী অসাধারণ। মানুষের রক্তের প্রবাহে তার নৃত্যের ছন্দ।

অন্তরা বলল, আজ দারুণ দারুণ সব কথা বলছেন আপনি।

মজুমদার সাহেব বললেন, শোন হে ইয়ং লেডি, আমিও একদা রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। তার ছিটেফোটা এখনও মনের অতল থেকে ভেসে ওঠে।

ইয়ং লেডি বলাতে অন্তরা সেই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ল। তার তেত্রিশ বছরের যৌবন হঠাৎ একটি মন্ত্রেই দশ বছর কমে গেল।

সে বলল, চুলে আপনার পাক ধরেছে ঠিক, কিন্তু সত্যি বলছি মিঃ মজুমদার এখনও আপনাকে দেখলে মনে হয়, এভারগ্রীন।

মজুমদার সাহেব বয়সটাকে পাঁচ বছর কমিয়ে একান্নতে বিহার করছেন। তিনি অন্তরার উদ্দীপক উক্তিতে অবশ হয়ে পড়লেন।

বললেন, বয়সের হাওয়া লেগেছে গায়ে, তবু বলি আজকের দিনের ইয়ং জেনারেশনের মত অকালে বুড়ো হয়ে যাইনি। এখনও পাকা দশ ঘণ্টা অফিসের কাজ করি। রোজ চার মাইল চক্কর দিই ময়দানে। জোর কদমে দু'পা চালিয়ে গেলে হাঁফ ধরে না আজকালকার ছেলে ছোকরাদের মত।

অন্তরা বলল, আমরা কিন্তু আসল কথা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আপনি কি যেন বলছিলেন সেই সতীসাধ্বী মেয়েটির সম্বন্ধে?

মজুমদার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে কথার খেইটা ধরলেন। বললেন, মেয়েটি ঢুকেই স্বামীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ক'দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কাল থেকে অফিসে জয়েন করেছে। আজ একটু আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে এসে পড়ল, তাই আপনার কাছে আসতে পারলাম।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায় কাজ আপনার?

খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল লোকটি। মিনমিন করে হাত কচলে বলল, অতি সামান্য কাজ করি। মানে এই বইপত্রের দোকানে। বলার মত কিছু নয়।

মেয়েটি অমনি স্পষ্ট করে বলল, ও সোনা কোম্পানীর বইয়ের দোকানে সেলস্‌ম্যান।

হেসে বললাম, সামান্য কাজ বলছেন কেন, কোম্পানীর নামটা তো খুবই মূল্যবান। সোনা কোম্পানী!

মেয়েটি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, ঠিকই বলেছেন আপনি। টাকা-পয়সা খুব বেশী নেই, তবে কোম্পানীর মালিকের মত এমন উচ্চ হৃদয়ের লোক খুব কম দেখা যায়। প্রতিটি কর্মচারীর বিপদ-আপদে পাশে এসে দাঁড়ান। সব রকম সাহায্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আপনাদের বিপদে দাঁড়াব বইকি, আমরা যে এক পরিবারের মানুষ। এখানে অঢেল পয়সা পাবেন না, তবে এও বলে রাখি, এর চেয়ে সম্মানের কাজ আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, ইংরেজী বই পড়তে বড় ভালবাসে। মালিক জানতে পেরে বলেছেন, আপনি যত খুশি বই বাড়ি নিয়ে যাবেন, আর সাবধানে পড়ে ফেরত দিয়ে যাবেন।

লোকটি স্ত্রীর কথায় সঙ্কুচিত হয়ে বলল, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

মেয়েটি বলল, রোজ আমাকে ও বই পড়ে শোনায়। এত ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ কোথায় পাব বলুন? তাই কম পয়সা হলেও এ চাকরী ছাড়তে আমাদের কারুর ইচ্ছে নেই।

তারপর কাজের কথা পাড়লাম। মেয়েটিকে বললাম, আপনার গান

শুনেছি। গলা ভাল। অনুশীলন করলে আরও ভাল হবে। আমি আপনাকে রেকর্ড কোম্পানীতে একটা চান্স দিয়ে দেখতে চাই।

মেয়েটি বেশ অবাক হয়ে গেছে বলে মনে হল। অবশ্য তাকে যখন আমি ডেকেছি তখন তার কিছুটা আঁচ করা উচিত ছিল। লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখখানা হাঁ হয়ে আছে।

মেয়েটি কথা বলল, যদি মনে করেন আমার গলায় রেকর্ড হওয়া সম্ভব তাহলে আমাকে সুযোগ দিতে পারেন।

বললাম, সব জেনেই প্রস্তাবটা রাখছি আপনার কাছে। হ্যাঁ, তবে একটি কথা। আপনার গলা সুরেলা হলেও আমাদের ট্রেনারের কাছে আপনাকে বেশ কয়েকদিন ট্রেনিং নিতে আসতে হবে।

মেয়েটি কি চিন্তা করে বলল, আপনাদের ট্রেনারের নামটা জানতে পারি কি?

বললাম, অরণ্যদেব চৌধুরী। আধুনিক গানের সুরকার হিসাবে ওর জুড়ি এখন আর কেউ নেই। সিনেমা কোম্পানীগুলোকে তো প্রায় মনোপলি করে নিয়েছে।

মেয়েটি একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, জানি ওঁর খুবই নাম, তবে আমি যে ধরনের গান গাইতে অভ্যস্ত তাতে ওঁর গায়কীর সঙ্গে আমার মেজাজের মিল হওয়া সম্ভব হবে না।

অন্তরা বলল, উনি তাহলে কেবল গান গাইতেই জানেন না, মেজাজ দেখাতেও জানেন। আমরাই কেবল পারলাম না।

মজুমদার সাহেব বললেন, মেয়েটিকে আমার সরল আর বেশী রকমের বোকা বলেই মনে হল। ওকে আবার বললাম, আপনার ওসব ভেবে কাজ নেই, আমাদের কথা মত কাজ করে যান, আপনার কিছু পসিবিলিটি আছে কিনা দেখা যাক।

মেয়েটি চুপচাপ বসে থেকে কি ভাবল। তারপর বলল কি জান, আমার গুরু বলেছেন, কোন লোভের কাছে মাথা নোয়াবে না। আপনার কোম্পানীতে রেকর্ড করলে আমার নাম হবে ঠিক, কিন্তু অরণ্যদেব চৌধুরীর কাছে গান শিখলে আমার জাত খোয়াতে হবে।

বললাম, তার মানে?

মেয়েটি বলল, আধুনিক গানের নামে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। ঐ গুলো কি সুর? যেন মনে হয়, হাঁপানীর রুগী তেড়ে ফুঁড়ে উঠে গাইছে। কিছু মনে করবেন না। আমার একটুও পছন্দ হয় না ওঁর সুর।

বললাম, সারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে ভেঙে পড়ে ওর গান শুনতে।

মেয়েটা বলল কি জান, আপনারাই সর্বনাশ করছেন দেশটার। আজকাল আধুনিক গানের যেমন ভাষা তেমনি সুর। আপনারাই পারতেন মানুষের রুচি বদলাতে, কিন্তু রেকর্ড বিক্রির লোভে আপনারা গা ভাসালেন। তাই আপনাদের খুব বাহারী নৌকোয় চেপে ওরা ট্যুইস্ট নাচতে নাচতে এগিয়ে

যাবার সুযোগ পেল।

বললাম, আপনাদের মত ক্রেতারাই লুফে নিচ্ছেন। পড়তে পাচ্ছে না আধুনিক গানের রেকর্ড।

মেয়েটি বলল, আপনারা ভাল গান বাজারে ছাড়লে শ্রোতার কান তৈরী হত, যাঁরা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ঐসব রেকর্ড কিনতেন।

ভাগ্যিস ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। অমনি বললাম, আচ্ছা ভেবে দেখা যাবে আপনার প্রস্তাব।

ওরা স্বামী-স্ত্রী উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গীতগুরুর নামটা জানতে পারি কি?

মেয়েটি বলল, ভবানন্দ মিত্র।

হঠাৎ চমকে উঠল অন্তরা, কি বলল, ভবানন্দ মিত্র?

মজুমদার সাহেব বললেন, এমন করে চমকে উঠলে যে? জান নাকি লোকটাকে? অন্তরা বলল, না।

আটটি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে আসা অন্তরা ঘূর্ণির মত পাক খেতে খেতে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। মজুমদার সাহেব রিটায়ার করতেই নতুন কর্ণধার এসে বসলেন তাঁর চেয়ারে। পূর্বসূরীর সব অপকীর্তি মুছে দিলেন তিনি। অন্তরার একচ্ছত্র অধিকারে নির্মম ভাবে ছেদ পড়ে গেল।

এদিকে ড্রিংক শুরু হয়েছিল মজুমদার সাহেব আর তাঁর সাকরেদদের কল্যাণে। এখন অতিরিক্ত ড্রিংক করার ফলে অন্তরার গলা হারাল তার সুরের সূক্ষ্ম কাজ। ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে মঞ্চের আড়ালে চলে গেল অন্তরা।

সে কি অবর্ণনীয় কণ্ঠ শিল্পীর! গানের জগতকে ধরে রাখার কি করুণ চেষ্টা। যে শিল্পীর গানে করতালি উঠত বাতাস কাঁপিয়ে, সে শিল্পীকে আসর থেকে তুলে দেবার জন্যে পড়তে লাগল হাততালি।

গলার অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য বাড়ল প্রসাধন। দিনে দিনে উগ্র হয়ে উঠল অন্তরার সাজ। কিন্তু সব করেও শেষরক্ষা হল না। ভাঁটার টানে অতি দ্রুত তখন সব কিছু গড়াতে শুরু করেছে। যারা অন্তরার সঙ্গে বারে যাওয়াটাকে ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করত, বারের কড়ি কে আগে দেবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হত, তারা হাত গুটিয়ে নিল। অন্তরা রয়ালটির পয়সা ভেঙে সপার্ষদ কিছুদিন ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু নতুন রেকর্ড হচ্ছে না আর, পুরনো রেকর্ডের বিক্রিও অনেক কমে এসেছে, তাই রসদে পড়ল টান।

এখন নির্বান্ধব যায় বারে। দুঃখ ভোলার জন্যে মদ গেলে আকণ্ঠ। ফলে পুরো মাতাল হয়ে বাসায় ফেরে। ট্যাক্সি প্রথম প্রথম ডেকে দিত বারের ওয়েটাররাই। কিন্তু ইদানীং টিপস পাওয়া যায় না বলে তারাও আর গ্রাহ্য করে না। নিজেকেই ডেকে নিতে হয়। যেদিন অতিরিক্ত পানের ফলে জড়তা

আসে গলায়, সেদিন আর ট্যাক্সি ডাকা সম্ভব হয় না। একদিন দুদিন পথের ওপর থেকে পুলিসের লোকে টেনে তুলে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিয়েছে।

ভবানন্দ খবর পেলেন। অন্তরার তলিয়ে যাবার খবর তাঁকে শুনতে হল। তিনি বড় আঘাত পেলেন। নিজের হাতে পোঁতা দামী ফুলের গাছটাকে পোকায় মুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে দেখলে যেমন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ঠিক তেমনি একটা অনুভূতিতে ভুগতে লাগলেন ভবানন্দ। কি করে দেখা পাওয়া যায় অন্তরার! অসময়ে একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেলে সে হয়তো ফিরে আসতে পারে। এখনও সংযত জীবন যাপন করলে হয়ত ফিরে পেতে পারে তার আগের ক্ষমতা।

ভবানন্দের মনে হল অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবনকে জানতে গেলে মূল্য দিতে হয় বড় বেশী। ভবানন্দ আগে ভাবতেন, অভিজ্ঞতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, কিন্তু এখন অন্তরার পরিণতি দেখে মনের সে বিশ্বাসে চিড় ধরল।

শহরতলীর দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় বস্তি এলাকার একটা ছোট্ট ঘরে কম ভাড়ায় থাকে অন্তরা। বিলাসের দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখন চলেছে কৃচ্ছ্রসাধনের দিন। দু'একটি গানের টিউশনি সম্বল। গলার সে দাপট নেই। আগের দিনের নামটুকু ভাঙিয়ে যোগাড় হয়েছে এই গান শেখানোর কাজ।

মাঝে মাঝে কি অন্তরার মনে পড়ে জয়তিলকের কথা? জয়তিলক ফিরে এসে অন্তরার কোন খোঁজ কি নিয়েছে? অন্তরার মনে হয়, সে-ও তো কোন খোঁজ রাখেনি জয়তিলকের। একটা উন্মাদনার স্রোতে কয়েকটা বছর সে ভেসে চলেছিল, সে ভুলে গিয়েছিল তার অতীতকে। গানের জগতে নাম করতে হবে, এই ছিল তার ধ্রুব মন্ত্র। সে যদি নীচে নেমে থাকে তাহলে গানের জন্যেই নেমেছে: অন্তরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে মনে মনে ভাবে, মা তার সন্তানের মুখে অন্ন দেবার জন্য, তার উন্নতির জন্য দেহ-বিক্রিও করে বলে শোনা যায়, তাহলে গানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াতে দোষ কোথায়? চলতি দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়তে হবে। একবার নাম হলে, রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড থাকলে, লোকে তাকে মনে রাখবে বহুকাল। তার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পরও হয়তো সে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু দিন গেলে কেউ মনে রাখবে না সে কি করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ওপরে উঠেছিল। ভাবতে ভাবতে কখনও কখনও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন মনে কেমন যেন ছায়া ফেলতে থাকে কয়েকটা মেঘ।

টাকা দিয়ে সে যাদের টিকিট কিনে দিয়ে কনফারেন্সে করতালি কুড়োত, তারা যেন তার চারদিকে অট্টহাসি হাসে। ওদের হাসির শব্দ ছাপিয়ে যে ও গলা তুলতে পারে না। গলার স্বর কেমন যেন ভেঙে ভেঙে যায়।

বার থেকে বেহেড মাতাল হয়ে যেদিন বেরোয় সেদিন হঠাৎ সামনে ল্যাম্প পোস্টটা দেখে চমকে ওঠে। এমনি কতবার চমকে উঠেছে সে। ভবানন্দ যেন দাঁড়িয়ে আছেন। পথের ওপর আলো ফেলে বলছেন, অন্তরা আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ আলোর পথ ধরে চলে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো

না। এ তোমার নিজের জায়গা নয়। সেখান থেকে অন্তরা টলতে টলতে সরে যায়।

এক আধদিন দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পায় মজুমদার সাহেব গাড়ি থেকে নামছেন। বোধহয় টেনিস কোর্টের দিকে যান। অন্তরা গা-ঢাকা দিয়ে পালায়। তার বিধ্বস্ত দেহটাকে নিয়ে সে পুরাতন পরিচিত জগতে ফিরে যেতে চায় না।

তার অনেক সময় মনে হয় মজুমদার সাহেব তার চেয়েও দুঃখী। অর্থের অভাব হয়তো তাঁর নেই, কিন্তু প্রতিপত্তির এতবড় একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য হারিয়ে তিনি মনে প্রাণে নিশ্চয়ই একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন।

যারা তাঁর পাশে ঘিরে থাকত, আজ তারা মানুষটাকে পরিত্যক্ত ভুক্ত-পত্রের মত আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

অন্তরা তাঁর কোম্পানী ছেড়ে চলে যাবার পরও বার দুয়েক দেখা করেছে। তখন অন্তরার দেহে ভাঙনের সুস্পষ্ট চিহ্ন। তাই তার দিকে চেয়ে থেকে মজুমদার সাহেবের চোখ দুটো আগের মত আর চক্ চক্ করে ওঠেনি।

যে দেহকে সম্বল করে উঠেছিল একদিন, সে দেহ চলে গেলে অন্তরার সেই বানানো স্বর্গে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোন অবলম্বন রইল না।

সে এখন নিজেকে সবার চোখের আড়াল থেকে সরিয়ে রাখতে চাইল। আর তার এই পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়, তাই তাকে নিজেকেই বইতে হবে এ দুর্বহ জীবনের ভার। সে তাই চলমান সংসার থেকে সরে এল অনেকখানি আড়ালে।

ভবানন্দ একদিন অনেক খোঁজ করে এলেন অন্তরার শহরতলীর আস্তানায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিনতে কষ্ট হচ্ছিল অন্তরাকে।

অন্তরা ভবানন্দকে দেখে প্রণাম করল না। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল তার। শেষবেলায় প্রসাধন সেরে বেরোচ্ছিল বারের উদ্দেশ্যে। বারের ম্যানেজার এককালে তার গান শুনতে ভালবাসত, সেই সুবাদে আজও কিছু কনসেসন পায় সে। তাছাড়া বিপত্নীক ম্যানেজার বিকৃতদর্শন পুরুষ। ওকে নিয়ে অন্তরা তার জোয়ারের যুগে বন্ধুদের সঙ্গে কত রসিকতা করেছে। এখন ঐ ম্যানেজার মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ অন্তরাকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। কোন কোনদিন ম্যানেজার নিজের চেম্বারে অন্তরাকে ডেকে নেয়। সেদিন বারের খরচটা বেঁচে যায়। বিকৃত মানুষটারও সেদিন নিজেকে সম্রাট বলে মনে হয়। তাকে খুশি রাখার জন্যে অন্তরাকে ভাঙা গলায় ফরমায়েসী গান গাইতে হয়।

সেদিন বারে অন্তরা ম্যানেজার সাহেবের অতিথি। তাই অতিরিক্ত প্রসাধনে দেহের ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টায় একটা সকরুণ ছবি ফুটে উঠেছিল তার সারা অবয়বে।

সে অদ্ভুত একটা হাসি হেসে তাকাল ভবানন্দের দিকে। ভাবখানা এই, এদিকে কি মনে করে বন্ধু?

ভবানন্দ কিছু মনে করলেন না অন্তরার ব্যবহারে। ঈশ্বর মানুষের সব

ক'টি হৃদয়বৃত্তি তৈরী করার শেষে 'স্নেহ' বস্তুটিকে সৃষ্টি করেন। প্রতিটি ভাবের ত্রুটি ঐ এক স্নেহ দিয়েই ঢাকা দেন তিনি।

ভবানন্দ অন্তরার পরিণতি দেখে অভিভূত হলেন। তাঁর স্নেহ তখন হৃদয়ের উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে। অন্তরার কোন ত্রুটিকেই আর তিনি তখন ত্রুটি বলে মনে করতে পারছেন না।

কথা বললেন ভবানন্দ, তোকে দেখতে এলাম বেটি। অনেকদিন দেখিনি, তাই—

অন্তরা বিকৃত গলায় বলল, আজকাল অনেকদিনের চেনা মানুষেরা হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়। সহানুভূতি দেখিয়ে চলে যায়। মনে হয় ওরা দেখতে চায় অন্তরার একেবারে শেষ হয়ে যেতে আর কত বাকি।

কথাগুলো উত্তেজনায় বলে গিয়ে হাঁপাতে লাগল অন্তরা।

দুঃখের হাসি ফুটে উঠল ভবানন্দের মুখে। তিনি প্রতিবাদ করলেন না অন্তরার কথার। মানুষের উত্তেজনাকে বেরিয়ে যাবার পথ করে দিতে হয়। প্রতিবাদ না করে, ক্ষোভ প্রকাশ না করে সে সময় সহনশীল হতে হয়।

ভবানন্দ বললেন, দরজা থেকেই ফিরে যাব, না একটু বসতে বলবি?

অন্তরা হাত তুলে ভবানন্দকে তার একমাত্র ঘরের তক্তপোষখানা দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল।

ভবানন্দ বিছানায় বসে বললেন, অনেক দূর থেকে এলাম, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারিস?

অন্তরা ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনল। ভবানন্দ জল খেলেন। অন্তরা বলল, চা চাইলে কিন্তু পাবে না কাকু।

ভবানন্দ অনেকদিন পরে অন্তরার মুখে কাকু ডাক শুনতে পেলেন। মনটা তাঁর কেঁপে উঠল। তবু কোন রকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে নিজেকে দমন করলেন।

ভবানন্দ বললেন, সকালে আর রাত্রে রেওয়াজের আগে দু'কাপ চা খাই, এখন তার বেশী আর খাই না রে।

অন্তরা অমনি স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি তো আগে দশ-পনেরো কাপ চা খেতে।

ভবানন্দ বললেন, এক এক সময় অভ্যেস মানুষকে খায়, আবার কখনো মানুষই অভ্যেসকে তাড়ায়। যদিও অভ্যেসটাকে তাড়ানো বড় কঠিন কাজ।

অন্তরা বলল, অভ্যেস তাড়ানো শুধু কঠিন কাজ নয়, বোধহয় ওটা তাড়ানো যায় না।

ভবানন্দ হেসে বললেন, তুই আজকাল সাঁঝ সকালে রেওয়াজ করিস?

অন্তরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, রেওয়াজ, সে যে কোন যুগে করতাম তা এখন আর মনে আনতে পারি না।

ভবানন্দ বললেন, তবে, এই যে একটু আগে বললি, অভ্যেস তাড়ানো যায় না? তোর রেওয়াজ করার অভ্যেসটা তাহলে ছাড়লি কি করে?

অন্তরা হেসে উঠে বলল, তুমি উকীল হলে খুব পসার জমাতে পারতে কাকু।

ভবানন্দ বললেন, আমার ঠাকুর্দা কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন বলে শুনেছি। নাতির রক্তে হয়ত তার রেশটুকু থেকে গেছে।

অন্তরা বলল, কিন্তু তোমার গানের এতবড় প্রতিভা তুমি পেয়েছ কোন পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ?

ভবানন্দ বললেন, থাক ওসব কথা। প্রতিভা না হাতী। এখন বল তোর কথা। কোথায় চলেছিস ?

অন্তরা বলল, এক বন্ধুর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

ভবানন্দ বললেন, তাহলে এখন উঠি, তোকে আবার যেতে হবে এখুনি।

অন্তরা বলল, না না, তুমি বোস না। এমন কিছু জরুরী নয়, সে যাবো 'খন।

ভবানন্দ বললেন, অনেক খুঁজেছি তোকে, কিন্তু কারো কাছ থেকেই হদিস পাইনি। শেষে রেকর্ড কোম্পানীতে গিয়ে সঠিক ঠিকানা পেয়ে গেলাম।

অন্তরা অবাক হয়ে বলল, কি করে ? আস্তানার ঠিকানা তো ওখানে নেই।

ভবানন্দ হেসে বললেন, কোম্পানীর খাতা থেকে পাইনি ঠিক, কিন্তু ক্লার্ক নিরাপদবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি। উনি আমার পরিচয় পেয়ে ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

অন্তরা বলল, রেকর্ড কোম্পানীর খরচের খাতায় যে সব আর্টিস্টের নাম উঠে গেছে তাদের সবার বন্ধু এই নিরাপদবাবু।

ভবানন্দ বললেন, লোকটিকে আমার বেশ ভাল বলেই মনে হল।

অন্তরা বলল, আশ্চর্য মানুষ এই নিরাপদবাবু। বড় বড় দেমাকী আর্টিস্টদের উনি ছেড়ে কথা কন না। ওঁর মতে, যত তাড়াতাড়ি চড়চড় করে উঠবে, তত তাড়াতাড়ি হড়হড় করে নামবে। ধীরে উঠলে চুড়োয় থাকতে পারবে অনেক কাল।

ভবানন্দ বললেন, সত্যিকারের গুণী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

অন্তরা বলল, আমরা কেউই ওঁর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারতাম না। কোন আর্টিস্টের খাতির করে উনি কথা বলেন না। রয়ালটি হিসেব করে পেমেণ্ট দেবার ভার ওঁর ওপর, তাই কেউ ওঁকে অবহেলা করতে পারে না, সবাই গিয়ে ভীড় জমায়।

ভবানন্দ বললেন, স্পষ্ট কথা বলার লোক এ দুনিয়ায় খুব বেশী নেই রে বেটি। যে বলতে পারে সে সবার অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে পিছোয় না।

অন্তরা বলল, রয়ালটি যে বেশী পেল, তার হাতে চেকটি দিয়েই নিরাপদ-বাবু বলতেন, এর থেকে কিছু রেখে দিও ফিক্সড্ ডিপোজিটে। আখেরে কাজে লাগবে। গলা গেলে আর ফিরে আসে না।

কথাটা হয়তো খারাপ লাগে সে সময়, কিন্তু এখন বুঝেছি কি নির্মম সত্য কথা তিনি বলেছিলেন।

ভবানন্দবাবু তাকিয়ে রইলেন অন্তরার মুখের দিকে।

অন্তরা একটু থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যারা এতকাল

রেকর্ড কোম্পানীর সেবা করল, কোম্পানীর কোন কৃতজ্ঞতাই নেই তাদের ওপর। সেল কমলেই নির্মম ভাবে ছাঁটাইয়ের খড়্গ এসে পড়ল। মানে মানে এখন সরে পড়। সৌজন্য দেখানোর সময় কই তাঁদের। এটা একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জায়গা নয়।

ভবানন্দ বললেন, দুঃখ করিস না, দুনিয়ার নিয়মই এই। তাই আমার বিবেচনায় যে শিল্পী নিজেকে নিরাসক্ত রেখে যত বেশী সাধনায় ডুবে থাকতে পারবে তার তত লাভ। সে সম্মান পাবে, কিন্তু দুঃখ পাবে না। আবার যে শিল্পী যথাসময়ে অবসর নিতে জানে তার কোনদিন অসম্মানের ভয় থাকে না। যদিও এই দারুণ মোহের জগৎ থেকে সরে আসা বড় কঠিন কাজ।

অন্তরা বলল, সেই যে নিরাপদবাবুর কথা হচ্ছিল কাকু! তাঁর মত এমন লোক খুব কম দেখেছি। কোম্পানীর কাছে শিল্পীদের দাম যখন কমে যায় তখন নিরাপদবাবু তাদের নানাভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। হয়তো ক'জন শিল্পীর একখানা লং প্লেইং রেকর্ড হচ্ছে, তদ্বির করে পুরোনো আর্টিস্টকে ঢুকিয়ে দিলেন। রেকর্ডের দোকানে গিয়ে পুরনো আর্টিস্টের প্রশংসা করে এলেন। অনুরোধ জানালেন দু'কপি পুরনো রেকর্ড রাখতে।

তাই খরচের খাতার আর্টিস্টদের মরমী বন্ধু নিরাপদবাবু। তাঁর কাছে সবার মান অভিমান দুঃখ আক্ষেপের কথা জমা থাকে।

ভবানন্দ বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে এ ঠিকানা পেয়েছি। তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা জানতে পেরে তিনি কাগজে ঠিকানা লিখে দিতে দিতে বললেন, খুব প্রতিভা নিয়ে এসেছিল মেয়েটা, বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

অন্তরা মেঝের ওপর চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ভবানন্দ দেখলেন টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ল অন্তরার চোখ থেকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অন্তরাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অন্তরা ততক্ষণে ঢুকে গেছে রান্নাঘরে।

একটু পরে বেরিয়ে এল একটা ফাটা প্লেটে খানিকটা বাদাম তক্তি আর একগ্লাস জল নিয়ে। বলল, নিজের কেনার পয়সা নেই, টিউশানির একটা মেয়ে দিয়েছিল, তুমি এলে আর শুধু মুখে চলে যাবে। এটুকু অন্ততঃ খেয়ে গেলে শান্তি পাব।

ভবানন্দ বললেন, তুই কি মনে করেছিস তোর কাকুর এখনও বাদাম-তক্তি খাবার বয়েস আছে? সব ক'টা দাঁত বাঁধানো রে। তবে রেখে দিলাম পকেটে, তোর দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিতে তো পারব না।

আবার সহানুভূতির ছোঁয়ায় অন্তরার চোখে জল এল।

ভবানন্দ বললেন, কেন এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছিস বেটি, তোর কাকু তো মরে যায়নি। আর কেনই বা তুই ভুলে আছিস জয়তিলককে? কি করেছে ও তোর?

কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগল অন্তরা, ও আমার খোঁজ নিয়েছে একদিনও? আমি বিপথে চলেছি বলে কোনদিন ও ভৎর্সনা করেছে আমাকে? ও নিজের কাজে পাগল। কাজ পেলে ও স্ত্রীকে নয়, নিজেকেও ভুলে যায়।

আমি চাই না কেউ আমাকে মনে রাখে। তুমিও না, জয়তিলকও না।

ভবানন্দ অন্তরার মুখে-চোখে প্রবল উত্তেজনার ছবি দেখে আর কিছু বললেন না।

অনেকগুলো ক্ষোভের আগুন উদ্‌গীর্ণ করে থেমে গেল অন্তরা। সেদিনের মত ভবানন্দ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন অন্তরার ঘর থেকে।

সেদিন বারে অন্তরার জন্যে একটি অভিনব প্রস্তাব অপেক্ষা করছিল। বারের ম্যানেজার অন্তরার হাতে মদের গেলাস তুলে দিয়ে বললেন, যদি আপত্তি না থাকে এসো আজ থেকে আমরা দুজনে পার্টনার হয়ে জীবন কাটাই।

অন্তরার জোয়ারের দিনে একথা উঠলে ম্যানেজার খড়-কুটোর মত ভেসে যেত বানের ধাক্কায়, কিন্তু সেই মুহূর্তে জোরের সঙ্গে 'না' বলতে পারল না অন্তরা। সে শুধু বলল, তুমি আমার দুঃখের দিনের সঙ্গী, তোমাকে ভুলতে পারব না। তবে এতবড় একটা ডিসিসান নেবার জন্যে একটু সময় দাও আমাকে।

ম্যানেজার বললেন, তুমিও আমাকে এতদিন দেখছ, আমিও তোমাকে দেখছি, এর ভেতর ভাবনার কি আছে? আমি বিপত্নীক, আমার বৌ-এর বালাই নেই, আর তুমি স্বামীকে ছেড়ে এসেছ। তাই বলছিলাম কাল হরণের দরকার কি? বল তো আজ থেকেই আমরা থাকব একই কোয়ার্টারে।

অন্তরার ঘরে যদি ভবানন্দ আজ না আসতেন, তাঁর স্মৃতিটুকু যদি তার মনে তাজা হয়ে না থাকত, তাহলে হয়তো ম্যানেজারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত অন্তরা। নিজের বিক্ষত হৃদয়ের নিরাময় না হলেও সাংসারিক অনটনের হাত থেকে সে মুক্তি পেত।

অন্তরা বলল, আজ আমি তোমার অতিথি হয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গিনী হয়ে আসতে গেলে যে মনের প্রস্তুতি দরকার তা আজ আমার নেই। তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে আমার কোনরকম আপত্তির কারণ থাকতে পারে না, তবু বলি আমাকে নতুন ভাবনা নিয়ে একটা বিশেষ দিনে তোমার কাছে আসতে দাও।

ম্যানেজারের কুৎসিত মুখের ওপর জেগে ওঠা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ হঠাৎ নিভে গেল। বিকৃত মুখখানাতে একটুখানি হাসি ফোটাতে গিয়ে তা আরও ভীষণ বীভৎস হয়ে উঠল। অন্তরা ডিনার শেষ করে যখন পথে নামল তখন তার হাত ধরে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে গেলেন স্বয়ং ম্যানেজার। বললেন, আমার দরজা খোলা রইল তোমার জন্যে, এবার যেদিন আসবে একেবারে চলে এসো পুরনো বাসা ভেঙে দিয়ে।

অন্তরা নেশার ঘোরে বার কয়েক মাথা নেড়ে গেল।

ভোর হলে অন্তরা কোথাও আজ আর গেল না। সে পুরোপুরি যেন ছুটি উপভোগ করছে এমনি একটা মেজাজ নিয়ে পড়ে রইল বিছানার ওপর।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ড্যাম্প লাগা ঘরের ছোপ ছোপ আঁকিবুকিগুলো দেখতে লাগল সে। তার মনে হল, চোখের ওপর নানা আকৃতির কতকগুলো

মুখ ফুটে উঠছে। কতকটা আজম খাঁ-র মত একখানা মুখ। ঠিক যেন বাঁ হাতখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে গান গাইছে।

আজম খাঁকে সাদি করার পর তার নাম হয়েছিল রিজিয়া। অনেক পেয়ার পেয়েছিল সে সাদির পর চার পাঁচটা মাস। গানের কাজ যতখানি সূক্ষ্ম ছিল আজমের, বিবির ওপর ব্যবহারটা ততখানি সূক্ষ্ম ছিল না। তাই মাস পাঁচেক পরে যখন অমিত-দেহভোগের তৃষ্ণা মিটল তখন ফুটে উঠল আজমের আসল ছবি। গান শেখার জন্যে পাগল অন্তরার ওপর চলল তাচ্ছিল্যের নির্যাতন। অন্তরা দেহের নির্যাতনকে চিরদিন উপেক্ষা করে এসেছে, কিন্তু যে গানের জন্যে সে নারীর সব সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই গানের ক্ষেত্রে উপেক্ষা সে সহ্য করতে পারল না। যখন গভীর নিষ্ঠায় গলা সাধত তখন হঠাৎ তার কাছে এসে হয়তো হাজির হত আজম। রুক্ষ গলায় বলত, খানা বানাও, রেওয়াজ পরে হবে। কোন কোনদিন আজমের বন্ধুরা এসে গান শুনতে চাইত অন্তরার। বলত, বাংলা গান গাও, আমরা ঐ গান শুনতে চাই।

অন্তরা গান ধরত, আর তখনি বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চরবে আলোচনার দরকার পড়ত আজমের। এ উপেক্ষা অন্তরার মনে বড় বেশী করে বাজত। সে বুঝতে পারত না একজন জাতশিল্পীর পক্ষে কি করে এ কাণ্ড করা সম্ভব!

অন্তরার আজ মনে হল আজমের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে বেঁচে গেছে। বারের বিকৃত দর্শন ম্যানেজারকে সে বুঝতে পারে। তার একমাত্র লোভ দেহটার ওপর সে একথা জেনেই তার সঙ্গে মেশে। কিন্তু এই আজম খাঁর মত লোককে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। গানের উঁচুদরের শিল্পী তার সঙ্গিনীকে সঙ্গীতের জগতে টেনে নেবে, এই তো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজম শুধু করে গেল দেহ-ভোগ। ঐ বিকৃত ম্যানেজারের চেয়েও আজমের মনটা আরও বিকারগ্রস্ত বলে মনে হল তার।

মজুমদার সাহেব যেন গলায় টাই বেঁধে বসে আছেন। অবিকল সেই ভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছে সিলিংয়ের শ্যাওলা-ধরা রেখায়।

এই মানুষটার ওপর অন্তরার কোন ক্ষোভ নেই। মেয়েদের কাছে পাওয়া সুযোগের কখনও একটুও অপব্যবহার করেননি মজুমদার সাহেব। কিন্তু তাদের গানের লাইনে সম্ভবমত সুযোগ সুবিধা দিতে তাঁর কার্পণ্য দেখা যায়নি কোনদিন। তিনি কোম্পানীর উন্নতির জন্য অনলস কাজ করে গেছেন, কিন্তু নিজেকে অভুক্ত রেখে নয়। এ ব্যাপারে তাঁর এককালের আশ্রিতা কয়েকটি শিল্পী গানের লাইনে কিছু করে খাচ্ছে।

ঐ তো জয়তিলকের মত মনে হচ্ছে একখানা মুখ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না মুখখানা। সার্জেনের সাদা পোশাকে ঢাকা অবয়ব।

পাগল, একটি বদ্ধ পাগল। কে জানত গান ভালবেসে তার গায়িকাকে এমন বেমালুম ভুলে যাবে কেউ? যত গান বাজত অন্তরার গলায় অবসর মুহূর্তে, সব ক'টি টেপ করে রাখা চাই জয়তিলকের। খেতে শুতে নাইতে বাজাত সেই টেপ। কিছু বলতে গেলেই সরিয়ে দেবে ধাক্কা দিয়ে। যেন ঐসব

গানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অন্তরার। আবার অন্য রোগও আছে। রোগী নিয়ে মত্ত হলে জয়তিলককে আর পাওয়া যাবে না সংসারের কাজে। সিরিয়াস কোন অপারেশনের ব্যাপার হলে ক'দিন কথা বন্ধ। মানুষটা তখন বন্ধ কালা আর বোবা।

সামাজিকতার ধার ধারে না জয়তিলক। অন্তরা হয়তো তার গানের গুরুর সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করেছে, তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও হয়েছে, হঠাৎ আসর ছেড়ে অভদ্রের মত উঠে চলে গেল জয়তিলক। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, কি একটা গুরুতর বিষয় মনে পড়ায় সে স্টাডিতে বসে নোট করছে নিবিষ্ট হয়ে।

কোনদিন সামাজিক নেমন্তন্ন থাকলে অন্তরা হয়তো সেজে বসে আছে যথাসময়ে, দেখা নেই জয়তিলকের। চারদিকে লোক পাঠিয়েও তার হদিস মিলল না। শেষে ঘণ্টা দুয়েক পরে সিগারেট টানতে টানতে ঘরে ঢুকেই বোকার মত বলল, কি ব্যাপার, এমন সেজেগুজে বসে আছ যে।

অন্তরা হয়ত রাগে ফেটে পড়ে বলল, তুমি একটা রোগিনীকে বিয়ে করলে পারতে!

জয়তিলকের উত্তর, তাই তো করেছি। তুমি সে সময় কঠিন রোগ ভোগ না করলে কে বিয়ে করত তোমাকে।

অন্তরার গলায় রাগ ঝলসে উঠল, উদ্ধার করেছ আমাকে। দয়া করে এখন চল পার্টিতে, প্লেটগুলো অন্ততঃ তোলার কাজ পাওয়া যাবে।

কিছুদিন জয়তিলকের সঙ্গে চলার পর অন্তরা দেখল, অসম্ভব। ওকে কারো পক্ষে চালানর চেষ্টা করাটাই বাতুলতা। তাই নিজেই চলতে লাগল সে। গানের ফাংশন, পার্টি, পিকনিক, সব জায়গাতেই সে জয়তিলক ছাড়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে যদি দেখত জয়তিলক ফিরে এসেছে, তাহলে তুলকালাম লেগে যেত তাদের ভেতর। জয়তিলকের কথা হল, সারাদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ঘরে ফিরে আসবে তখন বউ তার। ইচ্ছে হলে তার দিকে যতক্ষণ খুশি সে তাকিয়ে থাকবে। তার গান টেপ করবে। তার কানে শোনাবে সেদিনের অপারেশনের বিপদ-সঙ্কুল কাহিনী।

অন্তরাকে ভালবাসবে জয়তিলক অথচ তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করবে না, এ কেমন কথা? সেইখানে জয়তিলকের সঙ্গে তার বিরোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে।

জার্মানীতে যাবার আগে জয়তিলক বলল, চল আমার সঙ্গে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন গানের জগতের সঙ্গে হবে তোমার পরিচয়। আর তাছাড়া একা একা এখানে থাকলে রাতদিন ফাংশন আর পার্টি করে বেড়াবে। হাল ধরার কেউ নেই, ঘুরে ফিরবে ঘূর্ণি জলের টানে।

শেষের কথাগুলো গরম সীসের মত কানের ভেতর কে যেন ঢেলে দিল। ঠিক ঐ ক'টি কথাই বাড়িয়ে দিল তার জেদ।

সে বলল, জার্মানীতে বিখ্যাত কোন সার্জেনের সঙ্গিনী হয়ে যাবার ইচ্ছে

আমার একটুও নেই। তার চেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টরের চিঠি নিয়ে ওদের কলকাতা অফিসে যাওয়া আমার কাছে অনেক বেশী জরুরী।

কিছু সময় কি যেন ভাবল জয়তিলক। তারপর একসময় একেবারে শান্ত গলায় বলল, তোমার উন্নতির পথে কোনদিন আমি বাধা হয়ে দাঁড়াব না। কলকাতা যাচ্ছ যাও, তবে আঙ্কলের সাহায্য আর পরামর্শ নিতে ভুলবে না। ওঁর মত শুভার্থী তোমার আর কেউ নেই।

অন্তরার মনে আবার একটা ধাক্কা এসে লাগল। কেন, ভবানন্দ মিত্র ছাড়া কি তার নিজের একটি পা-ও চলার ক্ষমতা নেই? জয়তিলক তার ওপর বার বার বিশ্বাস হারাচ্ছে কেন? সে তাহলে নিজের পথেই চলবে। জীবনের অনেক ক'টা বছর স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে সে যেমন চলেছিল এখনও তেমনি চলবে। মনে মনে জয়তিলক যদি তাকে বিশ্বাস করতে না পেরে থাকে তাহলে চোখে চোখে রাখার পাঁচিলের ভেতর সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

জয়তিলকের সেদিনের কথার সে আর কোন জবাব দেয়নি।

কলকাতায় ফিরে এসে অন্তরা তার নিজের পথেই চলেছিল। আজ তার এই পরিণতির জন্যে সে কাউকে দায়ী করতে যাবে না, নীরবে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

অন্তরা কয়েকটা সপ্তাহ নিজেকে প্রায় ঘরের ভেতর বন্দী করে রাখল। না গেল টিউশনিতে না গেল বারে। নিজেকে এমন নির্বাসিত করে রাখা এই বুঝি তার জীবনে প্রথম।

কিন্তু আর বুঝি থাকা যায় না। কড়ি সংগ্রহের জন্যেও অন্ততঃ বেরোতে হয়।

অভাবিত ভাবে টাকা এলো রেকর্ড কোম্পানীর কাছ থেকে। তার রয়ালটির টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন নিরাপদবাবু। অন্তরার মনে হল, সে ভারত-সম্রাজ্ঞী। এতগুলো টাকা হঠাৎ হাতে এসে পড়লে কে না নিজেকে সম্রাজ্ঞী বলে মনে করে।

টাকা ক্যাশ হবার পর অন্তরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বেরোল বারের দিকে। উদ্দেশ্য, আজ সে ম্যানেজারকে তার নিজের পয়সা খরচ করে খাওয়াবে। সে লোকটাকে বিয়ে করুক'আর না করুক, তার কাছে তার ঋণের পরিমাণ কম নয়। অনেকদিন পরে আবার পরিচিত পৃথিবীতে বেরোল অন্তরা। বেশ কিছুদিন উগ্র পানীয় আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখার ফলে অন্তরা আবার উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠেছিল। আজ পথে চলতে গিয়ে নিজের শক্তিকে যেন সে ফিরে পেল। কয়েকটা পুরনো টিউশনির বাড়ি সে ঘুরে ঘুরে গান গাইল। নিজের কানে নিজের গলার এমন সুর কতদিন সে শোনেনি। না থাক আগের গলা, অন্ততঃ একটু সুর গলায় থাকলে সে আরও অনেককাল টিউশনির কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে। তাতে খাবার অভাবটা তার নাও হতে পারে।

সন্ধ্যার একটু পরে বারের পথে পা বাড়াল অন্তরা। পথে এক গুচ্ছ

গোলাপ কিনল কি যেন ভেবে। পথ পেরিয়ে এসে উঠল বারের দোতলায়।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখল ঘর শূন্য। একটা বেয়ারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার সাহেবের কথা।

বেয়ারা বলল, আপনি অনেকদিন আসেননি, তাই না ?

অন্তরা বলল, হ্যাঁ, তা না হয় হল, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে দেখছি না কেন ?

বেয়ারাটা জানত ম্যানেজার সাহেবের ঘরে মহিলাটির যাতায়াত ছিল। সে তাই একটু ঘুরিয়ে বলল, আপনার মত সাহেবও অনেকদিন আসেননি।

অন্তরা বলল, অনেকদিন আসেন নি, কেন ? অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো ?

বেয়ারা বলল, পক্স হয়েছে বলে শুনেছি। স্মল আর চিকেন মেশা। একসময় অবস্থা নাকি খুব খারাপ হয়েছিল, এখন শুনছি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

অন্তরার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বলল, তুমি কখনো ওঁর কোয়ার্টারে গেছ ?

বেয়ারা বলল, গেছি বইকি। অবশ্য অসুখ হবার পরে আর যাইনি।

অন্তরা বেয়ারার কাছ থেকে ম্যানেজারের বাসার হদিসটা নিয়ে চলতে লাগল। অপরিচিত কয়েকটা ছোট বড় রাস্তা পেরিয়ে সে একসময় এসে পৌঁছল ম্যানেজারের বাসায়।

ম্যানেজার সাহেব এক চিলতে লনের ওপর বসে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভেতরের ঘরে দেখা যাচ্ছিল একটা আয়া জাতীয় মেয়ে ঘোরাফেরা করছে।

চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে অন্তরা বলল, কেমন আছ ?

চমকে অন্তরার দিকে ফিরে তাকালেন ম্যানেজার সাহেব। গলায় বিস্ময় উপচে পড়ছে, তুমি ! সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি।

অন্তরার গলায় গভীর আন্তরিকতার সুর বাজল। সে বলল, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, বাতাসে এখনও ঠাণ্ডার আমেজ আছে, চল ঘরের ভেতর বসি।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ঘরের দিকে। পেছন পেছন চলল অন্তরা। ঘরের ভেতর দুটো চেয়ারে এসে বসল তারা। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কারো মুখে কথা নেই। ম্যানেজার দেখলেন, অন্তরা যেন নতুন শ্রী পেয়েছে। তার খসে পড়া যৌবন জাদুর ছোঁয়ায় ভরন্ত হয়ে উঠেছে। চোখের কোলে কালির চিহ্ন এখন অনেক ফিকে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে দেখছিলেন অন্তরার পরিবর্তন। কিছু পরে অন্তরার কাছে নিজেকে বড় বেমানান আর অসহায় বলে মনে হল। তিনি চোখ অন্যদিকে ফেরালেন।

অন্তরা দেখছিল ম্যানেজারকে। ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে, কিন্তু গভীর দাগগুলো মেলায়নি। বিধাতা যেন বিকৃত মুখখানাকে কত বীভৎস করে গড়া

যায় তার পরীক্ষা করছেন ম্যানেজারের ওপর।

হঠাৎ এই কুৎসিত মানুষটা অন্তরার হৃদয়ে আলোড়ন তুলল। তার মনে হল, মানুষটা কখনও কারো ভালোবাসা পায়নি, আর পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই একটুখানি ভালোবাসার উত্তাপে তাকে উত্তপ্ত করে তুলতে ইচ্ছে হল তার।

অন্তরা গলার স্বর নরম করে বলল, কতদিন তোমাকে দেখিনি।

ম্যানেজার অন্তরার গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলেন। তাঁর বর্তমান চেহারা নিয়ে কোন মেয়ের সামনে যে দাঁড়ানো যায় না, এ অনুভূতি তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু অন্তরার কোমল আন্তরিকতার ছোঁয়ায় তা দূরে হয়ে গেল।

তিনি বললেন, আমার অসুখের খবর পেলে কবে?

অন্তরা বলল, আজই খবরটা জানলাম! অনেকদিন বারে আসিনি।

ম্যানেজার বললেন, বাঁচার আশা ছিল না। মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেলাম। অসুখের সময় কেন জানি না প্রায়ই তোমার কথা মনে হত।

অন্তরা বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে অসুখের সময় তোমার কাছে আসতে পারিনি বলে।

ম্যানেজার বললেন, ঐটুকু কথা যে বললে অন্তরা, তাতেই আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। তুমি আজ এসেছ, এ রোগের কথা শুনলে আর কেউ আসত কিনা জানি না।

অন্তরা বলল, আয়া রেখেছ নিশ্চয়ই।

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ। তবে সেবার চেয়ে টাকার খাঁই বেশী। রাতে ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে গেলেও ঘুম থেকে জেগে কেউ পাশে এসে একবারটি দাঁড়াত না। একটু যখন ভাল হয়ে উঠলাম তখন টাকার জন্যে ঘন ঘন তাগাদা। হাত কাঁপে তবু চেকে সই করে দিতে হল। যে টাকায় চুক্তি হয়েছিল তা আগে ভাগেই নেওয়া হযে গেছে। এখন অসহায় পেয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে টাকা টানছে।

অন্তরা বলল, আজই ওকে ডেকে বিদেয় করে দাও।

ম্যানেজার অন্তরার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অন্তরা আবার বলল, আমি আছি, এখন তো তুমি প্রায় সুস্থ হয়েই উঠেছ। তোমার এটুকু সংসারের কাজ এক হাতেই চালিয়ে নিতে পারব।

ম্যানেজার অন্তরার হাতখানা টেনে নিয়ে কতক্ষণ ধরে রাখলেন তার হাতের ভেতর। একসময় বললেন তোমাকে আমার ঘরে থাকতে বলি এ সাহস আমার নেই অন্তরা। একদিন হয়তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে নিয়ে, আজ এই বসন্তের দাগেভরা মুখখানা নিয়ে সে স্বপ্ন দেখাটা পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে বল?

অন্তরা উঠে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের মাথাটা নিজের দেহে আলতো করে চেপে ধরে বলল, কোন কথা নয়, তোমার কাছে আজ আমি এসেছি বন্ধু হয়ে।

চিরদিন যদি আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে সংসার করতে নাও পারি, বন্ধু হয়ে থাকতে ক্ষতি কি। আজ আমাকে তোমার সবচেয়ে বেশী দরকার, তাই এসেছি তোমার কাছে। আবার যখন আমাদের দরকার ফুরোবে তখন যেন সহজেই বাঁধন ছিঁড়তে পারি।

ম্যানেজার তার মাথাখানা গভীর অনুরাগ আর কৃতজ্ঞতায় ঘষতে লাগল অন্তরার পোশাকের ওপর।

ম্যানেজারের কুৎসিত মুখখানায় একটা অসহায় ছবি ফুটে উঠতে দেখে অন্তরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রইল।

ভেলোরে জয়তিলকের কোয়ার্টারে বসেছিলেন ভবানন্দ আর জয়তিলক মুখোমুখি। কথা হচ্ছিল তাদের ভেতর।

ভবানন্দ বললেন, আমি যে তোমার এখানে কোনদিন আসব তা একবারও ভাবিনি জয়তিলক।

জয়তিলক হেসে বলল, আমিই কেবল আঙ্কলকে দেখতে যাব আর আঙ্কল আমার কাছে আসবেন না তা কি করে হয়? তাই বিধাতা বিচার করে আঙ্কলকে আমার কাছে এনে দিলেন।

ভবানন্দ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর এক সময় মনের গভীর থেকে বললেন, মানুষকে ভালবাসার মত দুঃখ নেই জয়তিলক। সে কাছে থাকলে হারাই হারাই ভাব, আর সে দূরে সরে গেলে অভিমানের যন্ত্রণা।

জয়তিলক বলল, আঙ্কল আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক বন্ধু অনেক পরিচিত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু আঙ্কল ভবানন্দ মিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বাস করুন আঙ্কল, আপনার কথা ভাবলে সবার ওপর থেকে আমার সব অভিমান চলে যায়।

ভবানন্দ বললেন, কিন্তু আমি তো কারো দুঃখ ঘোচাতে পারলাম না জয়তিলক। চেষ্টা করেছি সবাইকে আগলে রাখতে, ভালবাসা দিয়ে বাঁধতে, কিন্তু সব বাঁধন আলগা হয়ে গেছে।

জয়তিলক বলল, আমি কিন্তু তেমনি আছি আঙ্কল। আপনাকে ভুলিনি।

ভবানন্দ বললেন, সে আমি জানি জয়তিলক। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। তোমাদের জীবনের এই একটা ট্র্যাজেডি ঘটার ব্যাপারে নিজেকে যেন কিছুতেই অপরাধমুক্ত বলে ভাবতে পারছি না।

জয়তিলক মনে হল একটুখানি উদাস হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে ম্লান হাসি হেসে বলল, অনেক হার্ট অপারেশান করলাম আঙ্কল, কিন্তু হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

ভবানন্দ বললেন, যাঁরা মনোবিশ্লেষণ করে সব কিছু ধরতে পারেন বলে বড়াই করেন, হৃদয়ের ওঠা-পড়ার ছন্দ তাঁদের কাছেও অজ্ঞাত।

জয়তিলক এবার অন্য কথা পাড়ল, আচ্ছা আঙ্কল, এতক্ষণ আপনি আপনার বেটির কথা বললেন না তো? কেমন আছে ও? আজ প্রায় দুমাস

ওর কোন খবর আসছে না।

ভবানন্দ অবাক হয়ে সোফার ওপর সিধে হয়ে বসলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে অন্তরার?

জয়তিলক বলল, ওর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ না থাকলেও আমার কলকাতার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তারাই ওর ওঠানামার খবর জানিয়ে আসছে আমাকে। ও যে বারে যাতায়াত করে আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু ঐ বারের ওয়ার্কিং পার্টনার। সে আমাকে প্রায় সব কথাই লিখে জানায়। শুধু ওর মাস দুয়েকের খবর ও পাচ্ছে না।

ভবানন্দ বললেন, আমি ওর সম্বন্ধে তোমার চেয়ে অনেক কম খবর রাখি জয়তিলক। ও আমাকে এতদিন এড়িয়ে চলেছিল, মাস দুয়েক আগে ওর বাসার খোঁজ করে গিয়েছিলাম।

জয়তিলকের গলায় ঔৎসুক্যের সুর বাজল, কেমন দেখলেন ওকে?

ভবানন্দ বললেন, নিজের দুঃখের জালে ও এমন করে জড়িয়ে পড়েছে, যেখান থেকে ও চেষ্টা করেও মুক্তি পেতে পারছে না।

জয়তিলক বলল, আমার কথা কিছু উঠেছিল আঙ্কল?

ভবানন্দ বললেন, ওর চোখে জল আর মুখে তেজ দেখেছি। বলেছিল, জয়তিলক কি আমার খোঁজ নিয়েছে কোনদিন? তার স্ত্রী বিপথে গেল বলে ভর্ৎসনা করেছে কখনো?

জয়তিলক বলল, অন্তরার অভিযোগ মিথ্যে নয় আঙ্কল। আমি আমার কাজ নিয়েই পাগল হয়েছিলাম, ওর ওপর বলতে পারেন অবিচারই করেছি।

ভবানন্দ বললেন, এখনও দেরী হয়ে যায়নি জয়তিলক। দুজনের ভেতর যে অভিমান আর অনুশোচনা এসেছে, তাই তোমাদের পুনর্মিলনের পথকে সুগম করে দেবে। অবশ্য যদি মিলনের ইচ্ছে এখনও থেকে থাকে মনে।

জয়তিলক বলল, আমি ডাক্তার, দেহের অন্ধিসন্ধি আমার অজানা নয়। তাই দেহের লোভে যে আমি ওকে গ্রহণ করিনি, এটুকু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

ভবানন্দ বললেন, তোমাকে আমি চিনেছি প্রথম থেকেই, কিন্তু যে ছিল আমার একেবারে পাশটিতে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

জয়তিলক বলল, ওর গানের প্রতিভাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল আঙ্কল, যেজন্য ওকে অসুস্থ জেনেও আমি গ্রহণ করেছিলাম।

ভবানন্দ বললেন, অন্তরার একটি সন্তান যদি থাকত তাহলে হয়তো ও জীবনটাকে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত না।

জয়তিলক বলল, দেহের ক্ষুধায় ও যে ঘুরে বেড়ায় তা কিন্তু নয় আঙ্কল। ও দেহ সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত। নিজের সঙ্গীত আর সেই পথে উন্নতির শীর্ষে ওঠা, এই ওর স্বপ্ন। তার জন্য দেহের মর্যাদাকে ও ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

ভবানন্দ বললেন, তুমি অন্তরাকে সত্যিই ভালোবাস জয়তিলক, না হলে

তাকে এমন করে বিশ্লেষণ করতে পারতে না।

জয়তিলক ভবানন্দকে ডেকে নিয়ে গেল বেডরুমে! ভবানন্দ দেখলেন, চারিটি দেয়ালে অন্তত ছ'খানা বিভিন্ন ধরনের রঙীন ছবি টাঙানো অন্তরার।

জয়তিলক বলল, বসুন।

ভবানন্দ সুসজ্জিত ঘরে বসলেন।

জয়তিলক বলল, পাশাপাশি দুটো বিছানা দেখছেন, ঐ দক্ষিণেরটা অন্তরার। আজও ওটি সমান যত্নে সাজানো থাকে। ওর ওপরে দেখছেন অন্তরার তানপুরা। ওখানে বসে সকালে ও রেওয়াজ করত।

ভবানন্দ বুঝলেন, শিল্পী অন্তরাকে কতখানি ভালোবাসা দিয়েছে ডাক্তার জয়তিলক। সে অন্তরার বর্তমান জীবনের সবকিছু জেনেও তাকে মনের থেকে টেনে ফেলে দেয়নি দূরে।

জয়তিলক বলল, গান শুনুন আঙ্কল। ভাল স্টিরিও এনেছি আমি!

ভবানন্দ কান পাতলেন। জয়তিলক একটি করে রেকর্ড বসায় আর বলে কত তারিখে সেই রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছিল।

সব ক'টি গানের শিল্পী অন্তরা। তার শেষ রেকর্ডটিও জয়তিলকের সংগ্রহ থেকে বাদ যায়নি।

ভবানন্দ বললেন, জয়তিলক, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক ওপরে। তোমাকে সকলে মস্ত বড় সার্জেন বলেই জানল কিন্তু তার আড়ালে কত বড় মরমী একটা মানুষ লুকিয়ে আছে তা জানল না।

হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ নিয়ে ম্যানেজারের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছিল অন্তরা, পাশে এসে দাঁড়াল একখানা গাড়ি। গলিপথের কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্টের আলো থেকে চেনা যাচ্ছিল না গাড়ির আরোহীকে।

অন্তরা ফিরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়াল যে, সে যেন বহু যুগের ওপার থেকে এসেছে। অপলক দাঁড়িয়ে তাকে যেন চেনার চেষ্টা করছে সে। জয়তিলক বলল, চল অন্তরা, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। অনেক ঘুরে তবে পেয়েছি তোমার এ আস্তানার সন্ধান।

অন্তরা কোন কথা বলতে পারছে না, শুধু তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জয়তিলক বলল, স্বামী বলে স্বীকার করে যদি না আসতে চাও, অন্ততঃ ডাক্তার বলে এসো। আমি জানি তুমি দেহে মনে বড় ক্লান্ত। এ সময় ডাক্তারকে তার কর্তব্যটুকু করার সুযোগ দাও।

অন্তরার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে নিজের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টা করতে লাগল।

জয়তিলক আরও কাছে গিয়ে রজনীগন্ধা-সহ ধরল অন্তরার হাত। বলল, আর ক্ষোভ অভিমান নয় অন্তরা, তোমার সাজানো গানের ঘর তোমাকে

ডাকছে, তুমি চল মনে এতটুকু গ্লানি দ্বিধা না রেখে।

অন্তরা প্রবল আবেগে মাথা নেড়ে বলল, আমি পারব না, পারব না জয়তিলক ঐ ঘরে যেতে। গান গাইতে আমি আর কোনদিন পারব না। গানের জগৎ থেকে অন্তরার নাম মুছে গেছে।

জয়তিলক বলল, একদিন যখন অসুস্থ ছিলে তখন আর কোনদিন গান গাইতে পারবে না বলে বলেছিলে, কিন্তু সেই অন্তরা আবার গান গাইল। তাই বলছি, আমার হাতে সব ভার ছেড়ে দাও, তোমাকে সুস্থ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব গানের জগতে। যেখানে শুধু তুমি আর আমি। তুমি গাইবে আর আমি শুনব।

অন্তরা বলল, অপেক্ষা কর জয়তিলক, আমি আসছি। বড় সংকট মুহূর্তে তুমি এসে পড়েছ। বলতে বলতে অন্তরা ঢুকে গেল ম্যানেজার সাহেবের কোয়ার্টারে।

আজ ম্যানেজারের ড্রইং কাম ডাইনিং রুম আলো ঝলমল। দামী পানীয়ের ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে ম্যানেজার। কাজে যোগ দিয়েছে হপ্তা খানেক। আজ তাই অন্তরার সঙ্গে পান ভোজনের পাকাপাকি ব্যবস্থার শুরু। এই রাতের থেকে অন্তরাকে একান্তে পেতে চান ম্যানেজার সাহেব।

ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল অন্তরা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল তখন সে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে রজনীগন্ধা। ভেতরের ঘর থেকে পায়ের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার। আজ তাঁর পরনে সব সেরা পোশাক-খানা মনের খুশিকে বাইরে প্রকাশ করছিল।

ম্যানেজার সাহেব অন্তরাকে এ অবস্থায় দেখে প্রথমে একটুখানি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

কি হয়েছে অন্তরা, কি হয়েছে তোমার? ম্যানেজারের গলায় উদ্বেগ ভেঙে পড়ল। অন্তরা ম্যানেজার সাহেবের বুকে মুখ রেখে একরাশ কান্না ঝরিয়ে যখন স্থির হয়ে দাঁড়াল তখন ম্যানেজারের মূক, অবাক চোখ দু'টো জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাকিয়ে অন্তরার দিকে।

অন্তরা নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে।

ম্যানেজার হতাশ-রুদ্ধ গলায় বলল, কেন অন্তরা, আমাকে এমন করে একা ফেলে রেখে যেতে চাইছ?

অন্তরা বলল, আমার স্বামী আজ প্রায় এক যুগ পরে বহুদূর থেকে এসেছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। বার থেকে ঠিকানা নিয়ে এ বাড়ি খোঁজ করে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে।

হঠাৎ কি হল, ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ম্যানেজার সাহেব। বললেন, সেকি, বন্ধুমানুষকে তুমি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ! চল চল, ভেতরে ডেকে নিয়ে আসি।

অন্তরাকে একদিকে সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরোলেন ম্যানেজার

সাহেব। পেছন পেছন তাঁকে অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এল অন্তরা।

ম্যানেজার জয়তিলকের সামনে গিয়ে বললেন, আরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে। আপনি অন্তরার স্বামী, মানে আমার বন্ধু হলেন। আসুন গরীব-খানায়। লেট্স হ্যাভ আ ড্রিংক।

জয়তিলকের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন ম্যানেজার। পান ভোজনের সব সরঞ্জামই প্রস্তুত। ওরা এসে বসল। অন্তরা শুধু ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। শোবার ঘরে খাটে আজ সুন্দর নতুন বেড কভার পাতা হয়েছে। অন্তরার জীবনে শেষ সংসার রচনার অনুষ্ঠান এ শয্যা। হাতে ধরে থাকা রজনীগন্ধার গুচ্ছ অন্তরা অনেক যত্নে শুইয়ে রেখে দিল বিছানার ওপর। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙে যেন বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। ওরা দুজনে কিছু খেল, ড্রিংক করল, কিন্তু অনেক অনুরোধেও অন্তরা আজ আর ড্রিংক করল না। সে শুধু চেয়ে চেয়ে ঐ কুৎসিত মানুষটাকে দেখতে লাগল। তার মনে হল, একটা অনেক উঁচু হৃদয় থেকে ঐ বিকৃত মুখখানার ওপর আশ্চর্য এক আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্তরাকে নিয়ে জয়তিলকের গাড়ি গলি পেরিয়ে আসছিল। ব্যাক গ্লাসের ভেতর দিয়ে অন্তরা তাকিয়েছিল পেছন দিকে। খানিক দূরে অস্পষ্ট এক দীর্ঘদেহী মানুষ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও একই ভাবে হাত নেড়ে চলেছিল।

গাড়ি বাঁক নিতেই সব মুছে গেল। অমনি জয়তিলকের গায়ে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল অন্তরা।

অন্য মুখ

ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ির ওপর ধবধবে সাদা কলেজ বিল্ডিংটা আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কয়েকটা তালগাছ দাঁড়িয়ে। চাঁদ উঠলে তাজমহল।

সুমিতা বিশ্বাস তার কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল লেডিজ হোস্টেলের দিকে, তিনটি ছাত্রী একটু আগে বাদাম গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে গল্প করছিল। বেলা শেষের হলুদ আলোটুকু শুষে নিয়ে ওরা ঠিক পরী হয়ে গিয়েছিল।

সুমিতা টুকরো টুকরো ছবি দেখছিল কোয়ার্টারের জানালাটা খুলে রেখে।

এইমাত্র একটা মেঘ ঘনিয়ে উঠল সাদা বিল্ডিংখানার পেছনে। তালগাছগুলোর মাথায় এলেই মেঘটা ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে দিলে। গাছের মাথাগুলো একসঙ্গে নড়ে উঠল।

সারি দিয়ে একদঙ্গল রেসের ঘোড়া ছুটে আসছে বালি উড়িয়ে। সুমিতা জানালাটা ঝপ করে বন্ধ করে দিলে। এ সময় দোর-জানালা খোলা রাখার অর্থই হল সারা গায়ে, বিছানাপত্রে কিছুটা বালি মেখে নেওয়া।

সুমিতা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়াসওয়ারদের সাঁই সাঁই চাবুকের আওয়াজ। টিনের চালে চড়বড়িয়ে বেজে উঠছে শব্দ। দমকে দমকে এক এক দল ঘোড়া যেন খুর বাজিয়ে উড়ে চলেছে।

সুমিতা হাত বাড়িয়ে সেল্‌ফ্‌ থেকে গীতবিতানটা টেনে নিল। নির্জন নিঃসঙ্গতায় একমাত্র কথা বলার সঙ্গী।

পাতা মেলে গুনগুনিয়ে গান করতে লাগল সুমিতা। প্রকৃতি থেকে প্রেম, প্রেম থেকে পূজা, আবার পূজা থেকে প্রেম, প্রকৃতি। যেন হারমোনিয়ামের রিডে আরোহণ অবরোহণের খেলা চলেছে।

এক সময় কোলে পাতা-খোলা পড়ে রইল গীতবিতান। আলোটুকু কখন নিঃশেষে মুছে গেছে। সুমিতার উঠে গিয়ে আর সুইচটা জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না।

কণিকাদির ক্লাস শেষ কবে করেছে সে, মনে এলো না। শুধু কানে বাজতে লাগল একটা মন-উদাসী সুর।

> 'দূরে কোথায় দূরে দূরে
> আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
> যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।'

কণিকাদি গান গাইলে সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখত। মনের এমন অতল তলে কি করে উনি সুরের সূক্ষ্ম ঢেউগুলো তুলতে পারেন, তাই যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করত ও। গান গাইবার সময় সম্পূর্ণ একটা সুরের প্রতিমা হয়ে যান কণিকাদি।

সেই কবে শান্তিনিকেতনে এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে উঠেছিল দোল উৎসবে। রঙীন ছবি হয়ে আছে সবটুকু অনুষ্ঠান।

ছোট থেকে বড়দের আম্রকুঞ্জ ঘিরে নাচ, 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' বলে গান গেয়ে ফেরা, সব মিলে যেন চোখ আর কানের এক আকুল করা উৎসব। কিন্তু আশ্চর্য অপেক্ষা করছিল গৌর প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চের আড়ালে। সন্ধ্যায় পূর্ণচাঁদের জ্যোৎস্নাপ্লাবন। 'নটীর পূজা' অভিনয়। সুরে ভরা স্তোত্রগুলো হঠাৎ উচ্চারিত হল একটি কণ্ঠে। মনে হল চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে পারিজাতের পরাগ ঝরে ঝরে পড়তে লাগল হাজার হাজার নির্বাক শ্রোতার মনের ওপর।

কণিকাদির গান শেষ হল। অভিনয় শেষ হল। কিন্তু সেই মুহূর্তে শুরু হল সুমিতার সন্ধান। কেমন করে গান শেখা যায় ওঁর কাছে। তখনও কলকাতার পড়া শেষ হয়নি, কি করে আসা যায় শান্তিনিকেতন।

কলকাতাতেই সুযোগ মিলল। একটি গানের স্কুলের স্পেশাল ক্লাসে মুখোমুখি হল সে কণিকাদির।

পুরো দুটো বছর কি শিখতে পেল সে? এ আফসোস কি তার যাবে কোনদিন? চাকরীর টানে তাকে আজ চলে আসতে হল কলকাতা ছেড়ে এই মফস্বল টাউনে।

দরজায় কেউ আস্তে টোকা দিচ্ছে। সুমিতার চিন্তার খেই কাটল।

কে?

দিদি, আমি কাজরী।

সুমিতা উঠে দাঁড়াল। আলো জ্বালল। দরজা খুলে বলল, এসো ভেতরে।

কাজরী কি যেন এনেছে কলাপাতার ঠোঙায়। এ অঞ্চলে ঠিক কাগজের ঠোঙার মত কলাপাতার ঠোঙা তৈরী হয়। ঐ ঠোঙায় বাজার থেকে লোকেদের ছোট ছোট মাছ বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে সুমিতা।

ওতে কি? মাছ নাকি?

কাজরীর লজ্জা পেল। বলল, না দিদি, গাছ থেকে জাম পাড়া হয়েছিল আজ। ক'টা জাম এনেছি।

সুমিতা বলল, দারুণ জিনিস এনেছ তো। আমি জামের ভীষণ ভক্ত।

ভেতর থেকে একটা প্লেট আনল সুমিতা। কাজরী সুমিতার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে উবু হয়ে মেঝেতে বসে জামগুলো ঢেলে সাজাল।

সুমিতা একটা মুখে ফেলে বলল, একেবারে তৈরী, বেশ মিষ্টি। নুনও লাগবে না। কিন্তু তুমি দেখছি ভিজে গেছ। বৃষ্টি তো কাজরী অনেক আগে থেমে গেছে? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার একখানা শুকনো শাড়ি পরে নাও।

বলতে বলতে সুমিতা পাশের ঘরে যাচ্ছিল, কাজরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, কিচ্ছু হবে না দিদি, কিচ্ছু হবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে পথে বৃষ্টি এল। তাই খানিকটা ভিজে গেলাম। এখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে। যেতে যেতে হাওয়ায় একেবারে শুকিয়ে যাবে।

সুমিতা বলল, জলগুলো গায়ে শুকোলে অসুখ করবে না?

কাজরী জোরের সঙ্গে বলল, এমনি কত বৃষ্টিতে ভিজি, ও আমাদের

অভ্যেস হয়ে গেছে।

একটু থেমে বলল, আমি আজ আর বসব না দিদি, চাঁদ নেই আকাশে, অনেকখানি বালি ভেঙে যেতে হবে।

তুমি যেন কোথায় থাক ?

কাজরী বলল, কলেজের পেছনে যে উঁচু বালিয়াড়ি, তালগাছগুলো দেখা যায়, তার ওপারে কাঁটাবাঁশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা নীচে নেমে গেছে, সেটা একেবারে শেষ হয়েছে আমার বাড়ির সদর দরজায়।

সুমিতা বলল, নিশ্চয়ই জায়গাটা অদ্ভুত সুন্দর। আমি কোনদিন ওদিকে যাইনি।

কাজরী বলল, আমি একদিন আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। একদম পড়ো বাড়ি দিদি। তবে বাড়ির পেছন দিকটা আপনার ভাল লাগবে। বালির ওপর ঝাটি, রঙন, জাম আর বাদামের বন। রঙন তো ঝোপ আলো করে আছে।

সুমিতা বলল, অত লোভ দেখিও না কাজরী। এমন সুন্দর একটা জায়গার সন্ধান পেলে রোজ ওখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে।

কাজরী বলল, আপনি আর গেছেন !

সুমিতা বলল, ও কথা বলছ কেন ? দেখো, নিশ্চয়ই যাব। তবে কলেজ করে আসার পর আলসেমীতে পেয়ে বসে, তাই বড় একটা এদিক-ওদিক বেরোনো হয় না।

কাজরী এবার সোজাসুজি বলল, কবে যাবেন বলুন, আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

সুমিতা বলল, কাল কলেজে বলব। তবে তোমাকে আসতে হবে না। আমি বেলা পড়লে নিজেই বালিয়াড়ি পেরিয়ে তোমার বাড়ি গিয়ে হাজির হব !

কাজরী বলল, ওদিকে দু'তিনটে পথ নেমে গেছে। আপনি কোন পথ ধরে এগোবেন ?

সুমিতা বলল, আশপাশের কাউকে তোমার নাম জিজ্ঞেস করে বাড়ির হদিস জেনে নেব।

কাজরী বলল, দূরে দূরে বাড়ি আছে, কাছেপিঠে কোন বাড়ি নেই। তাছাড়া আমার কাজরী নামটা বড় একটা কেউ জানে না।

সুমিতা বলল, তার মানে আমি একা একা যে কিছু একটা খুঁজে নেব তার আর সুযোগ রইল না। আচ্ছা না হয় তুমি এসেই নিয়ে যেও। হ্যাঁ, কাজরী ছাড়া আর কি নামে যেন তোমাকে সবাই চেনে ?

কাজরী লাজুক গলায় বলল, কাজু। আমার দাদার দেয়া নাম। দাদা আমার চেয়ে বেশ ক'বছরের বড়। বাবা যখন মারা যান আমি তখন এক বছরের। দাদার কোলে-পিঠে মানুষ।

সুমিতা এখন কাজরীর বাড়ির খোঁজ খবর নিতে লাগল।

কে আছেন তোমার বাড়িতে ? মা, আর সব ভাইবোন ?

কাজরী বলল, দু'বছর আগে মা মারা গেছেন। ভাইবোন বলতে আমি আর দাদা।

সুমিতা আরও কিছু জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ সে নিজেকে সংযত করল।

এবার অন্য প্রসঙ্গে এল সুমিতা। বলল, একদম ঠিক ঠিক বলে দাও তো দেখি আমার ক্লাশ তোমাদের কেমন লাগছে?

কাজরী বলল, নীপাকে জিজ্ঞেস করবেন, ও আপনাকে বলে 'কবি'। আর রুমা কি বলে জানেন?

কি?

ওয়েসিস।

সুমিতা খিল খিল আওয়াজ তুলে হেসে উঠে বলল, ওয়েসিস! তার মানে?

কাজরী বলল, আমি ঠিক বলতে পারব না দিদি। মনে হয় আপনার ক্লাসের আগে ওর ডি. কে. স্যার অথবা পি. জি. স্যারের ক্লাস থাকে। ও বলে, এতক্ষণে খটখটে শুকনো মরুভূমি পেরিয়ে ওয়েসিসে এসে পড়লাম।

সুমিতা বলল, ভারী ডেঁপো হয়েছে তো রুমা। এখন আমার ক্লাসগুলো তোমার কেমন লাগে তাই বল।

কাজরী বলল, দারুণ ভাল লাগে। তবে আমার দাদার কাছে অনার্সের বইগুলো আগে পড়ে নি, তাই আপনার পড়া বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না।

সুমিতা হঠাৎ কথার মাঝে থমকে দাঁড়াল। কাজরীর দাদা তাহলে বাংলা ভাষার চর্চা করেন! স্কুলে না অন্য কোথাও কাজ করেন!

সুমিতা বলল, কোথায় কাজ করেন তোমার দাদা?

কাজরী সোজাসুজি বলল, ঘরে।

সুমিতা কথাটা ধরতে পারল না। বলল, ঘরে মানে? ঘরে কি কাজ করেন?

কাজরী বলল, ঘরের সবরকম কাজে আমাকে সাহায্য করে। তাছাড়া আমাদের একটা চাষ-ঘর আছে, সেখানে জন-মজুর নিয়ে চাষের বন্দোবস্ত করে।

সুমিতা বলল, উনি এত পড়াশোনা করেও চাকরি করেন না কেন?

কাজরী বলল, দাদা স্কুলের ওপর ক্লাসে যখন পড়ত তখন আমার বাবা মারা যান, তাই ঘর সামলাতে গিয়ে পড়াশোনা আর বেশীদূর এগোয়নি।

সুমিতা বলল, এই যে তুমি বললে তোমাকে অনার্সের পড়া বুঝিয়ে দেন! শুধু স্কুলের পড়াতে তো অনার্স পড়ানো যায় না কাজরী।

কাজরী বলল, বিশ্বাস করুন দিদি, ও স্কুলের গণ্ডীও পেরোয়নি। তবে ওর পড়াশোনা অনেক। বাড়িতে যখন থাকে তখন লাইব্রেরী ঘরেই পড়ে থাকে বেশী সময়।

সুমিতার কাছে কথাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হল। কাজরীকে প্রথম দিনটিতেই ভাল লেগেছিল সুমিতার। ওর মাজা মাজা শ্যামলা রঙ

চোখমুখের সরলতা ওকে অন্য মেয়েদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত করে রেখেছিল। বুদ্ধির দীপ্তি ছিল ওর চোখে, কিন্তু তা ওর সারল্যকে ছাপিয়ে উপচে পড়েনি।

প্রথম দেখাতেই চোখ টেনে নিয়েছিল সুমিতার। কিন্তু ওর পোশাকে পরিচ্ছন্নতা থাকলেও সামান্যতম বৈভবের ছোঁয়া ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি প্রিয়দর্শিনী ভদ্র মেয়ে বলা চলে তাকে, আর বেশী নয়।

সেই কাজরীর বাড়িতে দিনের পর দিন এক বই-বুভুক্ষুকে জোগান দেবার মত বই থাকা কি করে সম্ভব? কথাটা তাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হল সুমিতার? অবিশ্বাস না করলেও কাজরীর কিছু পরিমাণে অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে হল। তার দাদাকে ভালবাসে কাজরী, তাই তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক।

সুমিতা একটু কৌতুকছলেই বলল, তাহলে তো তোমার বাড়িতে অবশ্যই যেতে হয়! লাইব্রেরী যখন আছে বলছ, তখন বইপত্র দেখা যাবে।

কাজরী বলল, আমি ছোটবেলায় দেখেছি কলেজ থেকে কোন কোন স্যার আমাদের লাইব্রেরীতে পড়তে আসতেন। আজকাল আর বড় একটা কেউ আসেন না। সব রকমের বই আছে দিদি। খুব ভ্যালুয়েবল সব বইয়ের কালেকশান। প্রায় হাজার পনেরো বই আমার ঠাকুরদাদার সংগ্রহ।

কথাটা শুনে মুখ থেকে কৌতুকের হাসি উবে গেল সুমিতার। কাজরী তাহলে অতিশয়োক্তি করেনি একবিন্দু!

সুমিতা বলল, কালই যাব তোমার বাড়ি। আমি পুরনো সব বই নেড়েচেড়ে দেখতে ভালবাসি।

আবছা অন্ধকার। মেঘ মেঘ খেলা চলেছে আকাশে। চাঁদটা লুকোচুরি খেলছে। পথ দেখা যায় তো যায় না।

কাজরী বেরিয়ে পড়তেই সুমিতা বলল, দাঁড়াও, টর্চটা নিয়ে যাও।

কাজরী বলল, কিচ্ছু দরকার নেই।

সুমিতা একটু ধমকের সুরে বলল, বালিয়াড়ির ওদিকে শুনেছি ইলেকট্রিক নেই। তুমি নিয়ে যাও টর্চ, কাল যখন যাব তখন নিয়ে আসব।

অগত্যা কাজরীকে নিতে হল টর্চ। দু'-এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরল।

কি হল?

কাজরীর গলায় বিনম্র একটা লজ্জার সুর। বলল, দাদা খোলাখুলি কতকগুলো কথা বলে ফেলে। আমি কত বাধা দিই, বোঝাই, ও শোনে না। বলে, উচিত কথা বলতে লজ্জাটা কি? তা আপনি দিদি কিছু মনে করবেন না।

সুমিতা হেসে বলল, না না মনে করব কেন। সবার তো আর একরকম স্বভাব নয়।

কাজরী চলে গেল। সুমিতা বাইরে বেরিয়ে এল জামের প্লেটটা হাতে। টানা বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে জাম খেতে খেতে মেঘের খেলা দেখতে

লাগল। এলোমেলো অনেক কথা মনে হল, ভেসে গেল। চাঁদটা ডুবসাঁতার কাটছে। মেঘের তরঙ্গে কতক্ষণ ডুবে থেকে আবার ভুস করে ভেসে উঠছে।

পরের দিন কলেজ থেকে সিধে সুমিতাকে কাজরী ধরে নিয়ে গেল বাড়ি। দূর থেকে সুমিতার মনে হল দুদিকে নিবিড় বাঁশের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বালির একটা সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে। তার ঠিক শেষেই যেন কয়েক শতাব্দী আগের একখানা একেবারে বিধ্বস্ত প্রাসাদ উঁকি দিচ্ছে।

ভাঙা বাড়িখানার কাছে আসতেই প্রথম যে মানুষটি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, তার চেহারার সঙ্গে কাজরীর কোন মিল না থাকলেও সুমিতা বুঝল, ইনিই কাজরীর দাদা।

ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। সারা চেহারার ভেতর অকৃত্রিম অগোছাল একটা ভাব। সুমিতার মনে হল, কোন দক্ষ ভাস্করের তৈরী একটি মূর্তি অনেককাল রোদে জলে থেকে অযত্নের ছাপে খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে।

কাজরী দাদার দিকে চেয়ে আছে। সুমিতার মুখে ভদ্রতার হাসি।

হঠাৎ সুমিতার মনে হল ভদ্রলোকের মুখখানা কি রকম যেন অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে।

একসময় কাজরীর দাদা কথা বলে উঠল, আচ্ছা আপনিই বলুন তো, এমন ভ্যাপসা গরমে গায়ে কেউ জামা রাখতে পারে? এই গেঞ্জীখানা গায়ে চাপিয়ে গলগল করে ঘামছি।

সুমিতা বুঝল, কাজরী কলেজ যাবার আগে তার দাদাটিকে জামা পরে থাকার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল, দাদা তা অমান্য করেছে, তাই একপক্ষে নীরব ভর্ৎসনা, আর অন্যপক্ষে আত্মসমর্থনের চেষ্টা।

সুমিতা মুখে বলল, সত্যি ভারী গরম পড়েছে।

আর কিছু সে বলতে পারল না।

ভেতরে সুমিতাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে যেতে কাজরীর দাদা বলল, পাগলী কলেজ যাবার আগে পই পই করে কত কিছু করতে বলে গেল, আচ্ছা বলুন তো অতসব চলাফেরা কথা বলার আইন-কানুন মনে রাখি কি করে?

সুমিতা মিষ্টি করে হেসে বলল, সব বোনেরাই দাদাকে ছেলেমানুষ ভেবে উপদেশ দেয়, আর সব দাদাই সেগুলো পালন না করে আনন্দ পায়।

কাজরী বোঝা গেল মনে মনে একটু রাগ করেছে। সে বলল, আমার দাদাটি আবার একটু সৃষ্টিছাড়া।

দারুণ জোরে হাওয়া ফাটিয়ে হেসে উঠল কাজরীর দাদা। কয়েকটা চড়ুই সে শব্দে সুরকি ঝরিয়ে পাকাবাড়ির ফোকর থেকে ঝটপটিয়ে উড়ে পালাল।

সুমিতা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, আপনার বাড়ির পথটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

আর বাড়িখানা, ততোধিক অসুন্দর, তাই না?—বলেই আবার হেসে উঠল কাজরীর দাদা।

না, না, তা কেন হবে,—বলল সুমিতা,—বনেদী জমিদারদের ভেঙে পড়া

বাড়ি যেমন হয় ঠিক তেমনি আমার এসব বাড়ির ভেতর ঘুরে বেড়াতে কি রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে।

ওরা বাইরের দুখানা গেট আর চত্বর পেরিয়ে অন্দর মহলে ঢুকল। পরিত্যক্ত শ্যাওলার ছোপ লাগা সব দরদালান! এখানে একসময় অনেকগুলি দাসদাসীর কর্মকোলাহল নিশ্চয়ই শোনা যেত। আজ এ বাড়ির অস্তমিত অবস্থায় তারা কেউ নেই।

উঠোনের কোণাকুণি একটা বেড়াল আগন্তুকদের উপেক্ষা করেই যেন পার হয়ে গেল।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে সুমিতা দেখল ঘরের পলেস্তারা দেয়াল থেকে খসে খসে পড়েছে। যে জায়গায় এখনও পলেস্তারা রয়ে গেছে সে জায়গাটুকু সাদা মার্বেলের মত মসৃণ আর ঝকঝকে।

দোতলার করিডোর দিয়ে যেতে যেতে সুমিতার মনে হল, বাড়ির এই অংশটাই বাসিন্দেরা এখনও ব্যবহারযোগ্য রেখেছে।

দক্ষিণের একটা ঘরে সুমিতাকে এনে বসানো হল। পুরনো দিনের পালঙ্কের ওপর বিছানা। সাদা কাচানো একখানা চাদর আজ বিশেষ দিনটির জন্যে বের করা হয়েছে। ইস্ত্রির ভাঁজগুলো এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে।

দক্ষিণের জানালা বিরাট আকারের। মোটা মোটা লোহার গরাদ।

জানালার বাইরে সেই বাঁশবনের ছবি। কিন্তু ওপর থেকে বাঁশবন ছাড়িয়ে আর একখানা ছবি দেখা যাচ্ছে। শেষবেলার আলোয় বালির পাহাড় আর তালগাছগুলো যেন অন্য এক জগতের আভাস দিচ্ছে।

ভারী ভাল লাগল সুমিতার। কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

একসময় মুখ ফেরাতেই দেখল ঘরে কেউ নেই। নিশ্চয়ই অতিথি অভ্যর্থনার আয়োজনে ভাইবোনে মিলেছে!

একটু পরেই ঘরে ঢুকল কাজরী। মস্তবড় ঝকঝকে থালায় ফল মিষ্টি। সুমিতার পাশে বিছানার ওপর বসিয়ে রেখে বলল, এটুকু এখন খেয়ে নিন দিদি। তার পর আপনাকে বাড়ির পেছনটা ঘুরিয়ে আনব।

সুমিতা বলল, তুমি তো কিছু খাওনি কলেজ থেকে ফিরে। এসো, একসঙ্গে খাওয়া যাক।

কাজরী বলল, আপনি খেতে থাকুন, আমি এই আসছি।

আবার কাজরী ঘরের ভেতর গিয়ে একবাটি মুড়ি, নারকেল কোরা আর একটা পাথরের বাটিতে ক্ষীর নিয়ে এল।

সুমিতা বলল, এত্তো! অসম্ভব!

কাজরী বলল, খান তো দিদি, পড়ে থাকে থাকবে।

এরপর কাজরী নিজের খাবার নিয়ে এল। সুমিতা জোর করে কিছু তুলে দিল ওর বাটিতে।

খেতে খেতে বলল, তোমার দাদা কোথা গেলেন?

কাজরী বলল, গরুর পরিচর্যা করতে। নিজের হাতে ওর সেবা না করলে

দাদার শান্তি নেই। আমরা পেছনের বাগানে ঘুরে যখন লাইব্রেরী ঘরে যাব তখন দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। ও সিধে গা হাত ধুয়ে চলে যাবে লাইব্রেরীতে, রাত দশটা অবধি একটানা পড়াশোনা করবে।

সুমিতা অবাক হল, প্রতিদিন এমনি পড়াশোনা করেন বুঝি ?

হ্যাঁ দিদি। খাওয়াতে ভুল হবে, কিন্তু রোজ লাইব্রেরীতে পড়ার রুটিনে ভুল হবার জো নেই।

পেছনের বাগানটা সত্যি মনোরম। সোনালী বালির একটা কার্পেট বিছানো। তার ওপর লাল রঙের ডিজাইন তোলা। গোলাপ ফুলের গাছে বড় বড় পাতার ফাঁকে থোকা থোকা সাদা ফুল। ভেতরে হলুদের আভা।

সুমিতা গাছটার দিকে চেয়ে আছে দেখে কাজরী নীচু ডাল নুইয়ে কয়েকটা ফুল পেড়ে এনে দিল সুমিতার হাতে। সুমিতা শুঁকে দেখল ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ।

জামগাছ সবুজ ঝলমলে পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে থলো থলো কালো আর মেরুন রঙের জাম। গাছের তলায় ছড়িয়ে পড়ে আছে কাঁচা-পাকা বেশ কয়েকটা। সুমিতা উবু হয়ে বসে কুড়োতে লাগল জাম। তাই দেখে কাজরী বলল, ওগুলো কুড়োচ্ছেন কেন দিদি, আমি কাল আবার নিয়ে যাব।

সুমিতা দুটো কাজরীর হাতে এগিয়ে দিয়ে নিজের মুখে একটা পুরে বলল, আঃ, চমৎকার !

কাজরী সুমিতাদির কাণ্ড দেখে হাসছিল।

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এগুলো হল গাছের স্বেচ্ছায় দান। এর কি তুলনা আছে কাজরী ?

বলতে বলতেই চোখ গিয়ে পড়ল জামগাছের ফাঁক দিয়ে একটা বালির পাহাড়ের ওপর। বালিয়াড়িটা চলে গেছে বহুদূর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় বনঝাউ আর বাদামের গাছ। বালিয়াড়িটা কোন একটা গ্রামে ঢুকে গেছে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য গ্রাম। এমনি করে শেষ মেষ গিয়ে মিশেছে কোথায় কে জানে।

সুমিতাকে সেদিকে চেয়ে থাকতে দেখে কাজরী বলল, ঐ বালিয়াড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে আমরা একদিন সমুদ্রের ধারে পিকনিক করতে যাব। খুব মজা হবে।

সুমিতা বলল, দারুণ জমবে। আমাদের বাংলা অনার্সের সবাই মিলে গেলে কেমন হয় ? একটা ছুটির দিন সকালে যাব, ফিরব বিকেলে।

কাজরী বলল, আমি কালই কলেজে খবরটা দিয়ে দেব। দেখবেন ভার্নাকুলারের একঝাঁক মেয়ে আপনাকে ছেঁকে ধরবে।

সুমিতা বলল, অতবড় দল নিয়ে যাওয়া সত্যি একটা ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে ছোট দল নিয়ে একটা পরীক্ষা চালানো ভাল। সফল হলে তখন বড় দল নিয়ে যাবার কথা ভাবা যাবে।

কাজরী বলল, ঐ যে দেখুন, দাদা অবেলায় চান সেরে ঢুকছে। এখুনি লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকবে।

সুমিতা পূব দিকে তাকিয়ে দেখল বিরাট ঝিলের মত একটা পুকুর। অনেককালের পুরনো প্রশস্ত ভাঙা ঘাট। পুকুরের মাঝে ডাঙা জেগে উঠে শরবন হয়েছে। ক'টা সাদা কালো বাদামী হাঁস তরতরিয়ে জল কেটে শরবনের দিকে কলর-কলর কথা বলতে বলতে চলেছে।

সুমিতা দেখল, ভেজা কাপড়ের ওপর লাল একখানা গামছা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা। কাজরীর দাদা খালি গায়ে ঘরের দিকে চলেছে। গেঞ্জী পরা গায়ে সুমিতা দেখেছে ভদ্রলোককে। এখন খালি গায়ে রঙটা মনে হল যেন পাকা সোনার মত।

এক ঝলক তাকিয়েই চোখটা ফিরিয়ে নিল সুমিতা। কাজরী পাশে দাঁড়িয়ে, তাই বেশীক্ষণ কোন পুরুষের দিকে চেয়ে থাকা নিশ্চয়ই ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

সুমিতা বলল, অবেলায় স্নান করলে কোন অসুবিধে হয় না তোমার দাদার ?

কাজরী বলল, আপনি অসুখ-বিসুখের কথা বলছেন ? আমি তো জ্ঞান হওয়া অবধি ওকে সামান্য সর্দি-জ্বরেও ভুগতে দেখিনি।

সুমিতা সপ্রশংস চোখ মেলে বলল, অবাক ব্যাপার ! এমন স্বাস্থ্য কারো আছে এই প্রথম জানলাম।

কাজরী বলল, সবাই সে কথা বলে।

ওরা কথা বলতে বলতে লাইব্রেরী ঘরের সামনে এগিয়ে এল !

কাজরীর দাদা হাতে একখানা ঝাড়ন নিয়ে বইয়ের র‍্যাকগুলো ঝাড়ছিল। সুমিতা আর কাজরী ঢুকল ভেতরে।

সুমিতার দিকে চেয়ে কাজরীর দাদা হেসে বলল, সরস্বতী ঠাকরুণের ঘর সাফ করছি। গুরুদেব তাঁর 'আবেদন' কবিতায় রাণীর কাছে মালঞ্চের মালাকর হবার আর্জি পেশ করেছিলেন, আর আমি দেবী বীণাপাণির কাছে ঝাড়ুদার হবার আবেদন জানিয়েছিলাম। মঞ্জুর হয়েছে।

সুমিতা বলল, আমাদের পরিচয় কিন্তু এখনও পুরোপুরি হয়নি। আমার নাম সুমিতা বিশ্বাস।

কাজরীর দাদা হেসে বলল, আপনি যে মিত্র হিসেবে খুবই ভাল সে বিশ্বাস আপনার নাম দেখেই মনে হয়েছে। আমার নামে কিন্তু ওরকম কোন মাহাত্ম্য নেই। খুব সাদামাঠা নাম। সরল সামন্ত।

সুমিতা হেসে বলল, দারুণ নাম আপনার। আপনার ব্যবহারই আপনার নামের গুণ প্রকাশ করছে। আগেকার কালে সামন্ত নৃপতিরা কিছু কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন হতেন। কিন্তু সামন্তরা সরল হলেই বৈষয়িক দিক থেকে বিঘ্ন। আপনার ক্ষেত্রে যেমন।

হা হা হা হা করে হাসতে লাগল সরল সামন্ত। বলল, আপনাকে আমাদের কলেজে আনা সার্থক হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়াটা চিরকালের। এ অধম সরস্বতীর বরপুত্র না হয়েও সরস্বতীর বার মহলের ভৃত্যের কাজটুকু যোগাড় করেছে। তাই লক্ষ্মী এ অধমকে আর কৃপার

দৃষ্টিতে দেখলেন না।

সুমিতার হঠাৎ মনে হল, কলেজের প্রসপেকটাসে মেম্বারদের লিস্টে সে এস. সামন্তের নাম দেখেছে। তিনি এই সরল সামন্ত হতে পারেন। কথাট যাচাই করে নেবার জন্যে সে বলল, কলেজের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগটা কত দিনের?

সরল বলল, আমার ঠাকুর্দাই তো এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। সেই সুবাদে গণ্ডমূর্খ হয়েও আমি শ্রীসরল সামন্ত মহাবিদ্যালয়ে তাবৎ বাঘা বাঘা ব্যক্তির সঙ্গে লেজুড়ের মত যুক্ত হয়ে আছি।

সুমিতা হেসে বলল, ও কথা বলবেন না। ক'টা ডিগ্রি থাকলেই মানুষ বাঘ হয়ে যায় না।

সরল বলল, সে কি বলছেন? স্যার আশুতোষের কত ডিগ্রি, তাই তো তিনি বাংলার বাঘ হতে পেরেছিলেন।

সুমিতা বলল, আদপেই না, বাঘের মত তাঁর ব্যক্তিত্বই তাঁকে ঐ উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

হাসতে হাসতে সরল বলল, হেরে গেলাম। কিন্তু আমাদের কলেজ যে একজন গুণী স্পষ্টবক্তা অধ্যাপিকা পেয়েছে সে কথা জেনে খুব তৃপ্তি পাচ্ছি।

সুমিতা বলল, ও কথা বলবেন না। এসেছি সবে মাস পাঁচেক। একদম কলেজ ব্যাপারে আনাড়ী। বর্ষপূর্তি এখনও হয়নি। পাঁচ মাসে এত গুণাবলীর পরিচয় দিলে সামনের দীর্ঘ বছরগুলোতে দেখাব কি?

সরল সামন্ত খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হল। বলল, আপনি লাইব্রেরী দেখুন, কোন বই দরকার হলে ঐ চেয়ার-টেবিলে বসে নোট নিন। সময়ে-অসময়ে আমি থাকি আর না থাকি, কাজরীকে বলে চাবি খুলিয়ে বইপত্র নেড়েচেড়ে দেখুন।

সুমিতা বলল, এমন সুযোগ আর স্বাধীনতা দিলেন যে দরকার হলেই চলে আসব।

সরল সামন্ত আবার মিষ্টি হেসে হাতজোড় করল। তারপর ঘাড়টা কাৎ করে বলল, কিন্তু সব কিছুতে 'ইয়েস' থাকলেও একটি 'নো' আছে।

সুমিতা বলল, আপনার ঐ 'নো'টা বই নিয়ে যেতে পারব না সঙ্গে করে, এই তো?

সরল সামন্ত হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, পারবেন, কেবল আপনারই নিয়ে যাবার পারমিশান থাকবে। 'নো'এর নিষেধটা আপনার বেলাতেই শুধু নাকচ।

কেন?

সব 'কেন'র তো উত্তর নেই প্রফেসার বিশ্বাস।

সুমিতা বলল, না জানলে তো বই নিয়ে যেতে পারব না।

সরল বলল, আপনি 'নো'র ব্যাখ্যাটা এত তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন যে, আপনার ক্ষেত্রে 'নো' ব্যাপারটাই বাতিল হয়ে গেছে।

সুমিতা বলল, ও, তাই বুঝি ?—বলেই হাসতে লাগল।

এবার লাইব্রেরীর বইয়ের দিকে চোখ পড়ল সুমিতার। বিরাট হলঘর। অন্ততঃ পনেরোখানা আলমারী আর বেশ কয়েকখানা র‍্যাক। পুরনো আর নতুন বইয়েতে ঠাসা। পুরনোই বেশী। প্রায় সব ক'টি পুরনো বই-ই বাঁধানো।

বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল সুমিতা। বঙ্কিম থেকে বিভূতিভূষণ অবধি প্রতিটি বাঙালী লেখকের রচনাবলী দুটি আলমারীতে ঠাসা হয়ে আছে। অন্য দুটি আলমারীতে রামায়ণ মহাভারতের প্রায় সবরকম অনুবাদ রয়েছে, সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাগুলি কেটে সুন্দর করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। বটতলা থেকে বুদ্ধদেব বসু অবধি বিভিন্ন কালের বিভিন্ন লেখকের সমন্বয়। সবচেয়ে সুন্দর হল, আলমারীর বাইরে এক কোণায় একটি কার্ডে সংকলক, সম্পাদক, লেখক ও সমালোচকদের নাম লেখা। পাশে কোন সালে প্রকাশিত তার ফিরিস্তি দেওয়া।

এক জায়গায় বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণগুলি রাখা আছে। কার্ডে ঐ সব বইয়ের শেষ কোন সংস্করণ বেরিয়েছে তাও লেখা আছে।

জীবনীগ্রন্থ ভরা দুখানা আলমারী। মহাপুরুষ, সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, দেশনেতা প্রভৃতি স্বদেশী-বিদেশী সবরকম মানুষেরই জীবনীগ্রন্থ। তার ভেতর আবার আত্মজীবনীমূলক বইও আছে। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখার বই আলাদা সব আলমারীতে রাখা।

সবচেয়ে লোভনীয় বিশ্বকোষ, ভারতকোষ থেকে আধুনিক কাল অবধি তাবৎ অভিধান গ্রন্থগুলি।

অনুবাদ গ্রন্থগুলিও সুবিন্যস্ত। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া সংস্কৃত বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ;—কালিদাস, বাণভট্ট, জয়দেব প্রভৃতি কালজয়ী রচয়িতাদের রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ রয়েছে এক জায়গায়। অন্যত্র বিদেশী কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মূল বঙ্গানুবাদ রয়েছে। আবার ইংরাজীর মাধ্যমে প্রকাশিত গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ রয়েছে।

এমনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত গ্রন্থের বিপুল সমাবেশ। ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সর্বশাখার বাংলা বইয়ের এত প্রচুর সংগ্রহ একটি মফস্বল শহরের প্রান্তবাসী ক্ষয়িষ্ণু উচ্চ-মধ্যবিত্তের বাড়িতে প্রায় আশাতীত।

সুমিতার মোটামুটি বইয়ের কালেকশান দেখতে দেখতে আর কার্ডে বইয়ের নামগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল।

কাজরী কখন বেরিয়ে গিয়েছিল সুমিতার খেয়ালই নেই। সে বই দেখে যখনই উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই সরল সামন্ত এসে তাকে বইটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল। কাজরীর দাদার নখদর্পণে যেন বইগুলোর বিষয়বস্তু। একটি লাইব্রেরীর ভেতর কাটাতে পারলে যে একটি মানুষ ইউনিভার্সিটির যে-কোন ডিগ্রিধারীর চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত হতে পারে

তার প্রমাণ যেন সামনেই দেখতে পাচ্ছিল সুমিতা।

একটা হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকল কাজরী। সুমিতার এতক্ষণ বই দেখতে দেখতে আর আলোচনা করতে করতে খেয়ালই ছিল না যে সন্ধ্যে চরাচর ডুবিয়ে নেমে এসেছে।

হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রাখল কাজরী। সুমিতা বলল, আজ এই অবধি থাক। এ একটা নেশার জায়গা। প্রায় রোজ না এসে শান্তি নেই।

সরল হাত পেতে বলল, এখানে প্রবেশের জন্যে সামান্য কিছু দক্ষিণা দিতে হয় মিস বিশ্বাস।

কাজরী চেঁচিয়ে বলে উঠল, না দিদি, দাদার রসিকতায় কান দেবেন না।

সুমিতা বলল, সে কি কথা! একজন মানুষ বই কিনতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন, আর অন্যেরা বিনি পয়সায় তার সুফল লুটবে, সে তো হয় না কাজরী।

সরলের দিকে ফিরে এবার বলল সুমিতা, বলুন, এখন কি দিতে হবে আমাকে?

সরল বলল, শুভেচ্ছা। আমি চিরদিনই লক্ষ্মীছাড়া, তাই আমাকে মিথ্যে অর্থকরী সাহায্য দিতে আসবেন না। তার চেয়ে শুভকামনা জানাবেন এই বলে যে, চিরদিন লোকটা যেন সরস্বতীর মন্দিরের ঝাড়ুদার আর খিদমতগার হয়ে থাকতে পারে।

সুমিতা বলল, এই তো দানের একটা সুযোগ এল, কিন্তু দাতা হতে দিলেন না। আর আপনি যে কাজ বেছে নিয়েছেন, তার চেয়ে বড় কিছু সম্মানের কাজ আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সরল বলল, রবীন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। আমার ঠাকুর্দা সে কথা না শুনে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আর আমি তার নাতি হয়ে ঠাকুর্দার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

সুমিতা বলল, অন্যায় বলবেন না, শিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান থাকা যেমন দরকার, আবার যাঁরা নিজেরা কোন প্রতিষ্ঠানে না ঢুকে শিক্ষিত হয়েছেন তাঁদের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়াও দরকার।

সরল বলল, শিক্ষা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। লোকে আমার কথা শুনে আড়ালে বলবে আকাট মূর্খ সাফাই গাইছে।

সুমিতা বলল, আপনি যদি মূর্খ হন তাহলে দেশসুদ্ধ মানুষই মূর্খ।

সরল বলল, শুনেও আনন্দ। আপনি ছাড়া বিশ্বাস করুন কেউ আমার বিদ্যা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। আর আমি যে একটা বিদ্যার জাহাজ না হলেও অন্তত গাদাবোট, এ কথাটাও আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

সুমিতা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, কক্ষনো আমি সেকথা বলিনি।

সরল সামন্ত বলল, তাহলে দেখছি শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। সামান্য যেটুকু প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তাও কেড়ে নিলেন।

সুমিতা এবার সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়ের অবতারণা করে বসল, আচ্ছা দেখুন আপনাদের কলেজের প্রেসিডেন্ট মনে হয় বেশ শিক্ষিত মানুষ।

কি করে বুঝলেন ?

ইন্টারভিউয়ের দিন উনিই তো আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন।

সরল সামন্ত বলল, আগে আপনারা ওকে প্রশ্ন করে বাজিয়ে নিলেন না কেন ?

সুমিতা বলল, তার মানে ?

সরল বলল, মানেটা খুবই সোজা। ইন্টারভিউ যাঁরা নেবেন তাঁর ইন্টারভিউ নেবার যোগ্য কিনা তা বাজিয়ে দেখতে হবে।

সুমিতা হেসে বলল, তা কখনো হয় কোথাও ?

হয় না বলেই তো আমার প্রতিবাদ। কারণ আমি কলেজের প্রেসিডেন্ট কিংবা সেক্রেটারী, আমি একটা কটন মিল অথবা দুটো চটকলের মালিক, সুতরাং আমি ইন্টারভিউ বোর্ডেও চেয়ারম্যান। আমি বোটানি থেকে বাংলা, সব বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকারী।

সুমিতা বলল, ব্যাপারটা কিছু সত্য হলেও, সম্পূর্ণ নয়। আরও অনেকে থাকেন বোর্ডে।

সরল বলল, আর যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রায় সকলেই 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জল উঁচু'র দল। ক্যানিউটের পারিষদ।

সুমিতা বলল, ইন্টারভিউ না হলে বাছাই হবে কি করে ?

সরল বলল, অবশ্যই ইন্টারভিউ হবে, তবে তার পদ্ধতি হবে আলাদা।

কি রকম ?

সরল বলল, যে বিষয়ে লোক নেওয়া হবে সে বিষয়ে তিনজন এক্সপার্ট থাকবেন। বাইরের দুজন আর কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড। বাইরের অন্তত সাত আটজন এক্সপার্টের নাম লেখা হবে একটা কাগজে। তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ হবেন। লটারী করে তাঁদের ভেতর দু'তিন জনকে নির্বাচন করতে হবে। তাঁদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আনতে হবে। তিনদিন পরীক্ষা চলবে ক্লাস রুমের ভেতর। দু'দিন অনির্বাচিত এবং একদিন স্বনির্বাচিত বিষয় পড়াবেন নির্বাচন-প্রার্থী। অনির্বাচিত বিষয়ের জন্যে একঘণ্টা প্রস্তুতির সময় পাবেন তিনি।

এখন তাঁর পড়ানোর ধারা, মান, জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি বিচরকেরা লক্ষ্য করবেন। তারপরেও কথা কাছে। যে ক্লাসে তাঁরা পড়াবেন, সে ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ভোট নিয়ে তবেই নির্বাচন ফাইনাল করতে হবে।

সুমিতা বলল, অনেক সময় লাগবে।

সরল বলল, দিতে হবে সে সময়। একজন অপদার্থ লোক যদি নির্বাচিত হয়, তাহলে সে সারা জীবন জ্বালাবে। তাকে না গেলা যাবে, না ফেলা যাবে ! জেনারেশনের ভাগ্য যাঁদের ওপর নির্ভর করছে তাঁদের উপযুক্ত পরীক্ষার ভেতর দিয়ে আসতে হবে বইকি। তদ্বির নয়, নিজের যোগ্যতাই নির্বাচনের মাপকাঠি

যাতে হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

একটু থেমে সরল সামন্ত হেসে বলল, এসব আলোচনা চালালে মাথা ভারী হয়ে উঠবে, তার চেয়ে আসুন হালকা আলোচনা করা যাক।

সুমিতা বলল, আজ অনেকক্ষণ সন্ধ্যে নেমেছে, আজ আমাদের আলোচনায় এখানেই ছেদ পড়ুক। আবার তো আসতে হবে লাইব্রেরীর টানে, তখন আপনার সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসা যাবে।

সত্যি বলছেন ? সরল সামন্ত বলল, আমার সঙ্গে একবার আলোচনার পর দ্বিতীয় বার বড় একটা কেউ আসতে চান না। অবশ্য অনেকেই কথা দিয়ে যান, কিন্তু কথা রাখা আর হয়ে ওঠে না।

কাজরী বলল, তুমি যতসব উদ্ভট কথাবার্তা জুড়ে দেবে লোকজনের সঙ্গে, তাঁরা কেন আর আসতে যাবেন ?

সরল সামন্ত কেমন যেন অসহায় অপরাধীর মত হাসতে লাগল।

সুমিতা বলল, উপযুক্ত কথা বলেন তোমার দাদা। আমরা যারা শ্রোতা, তারা ওসব কথা শুনতে অভ্যস্ত নই বলে আসতে চাই না।

সরল সোৎসাহে বলল, তুই তো আমার সব কথাতেই খুঁত ধরিস, এখন দেখ, কতবড় একজন নাম-করা প্রফেসার আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য উনি আবার ফিরে এলে তবেই বুঝব সার্টিফিকেটটা ভুয়ো নয়।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে উদ্গত হাসিটাকে কোনরকমে রোধ করল সুমিতা।

সরল বলল, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুমিতা আর সরল সামন্ত ঘর থেকে বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে খানিক পথ এগিয়ে দিতে এল কাজরী। একদিকে মেঘ আর একদিকে চাঁদ। বালুপথের দুদিক থেকে কাঁটাবাঁশের ঝাড় এভিনিউ তৈরী করেছে। বাঁশের গায়ে গায়ে ঘষাঘষি করে অদ্ভুত আওয়াজ তুলছিল।

সুমিতা বলল, তোমার আর এগিয়ে কাজ নেই। পড়াশোনায় বসে যাও। আমি নীচের পথটা পেরিয়ে ওপরে উঠলেই একা চলে যেতে পারব।

কাজরী দাঁড়িয়ে পড়ল। সরল সামন্ত বলল, কিছু ভাবতে হবে না, আমি একেবারে আপনার বাসা অবধি পেঁাছে দিয়ে আসব।

সুমিতা চলতে চলতে ফিরে দাঁড়িয়ে কাজরীকে বলল, আমি কিন্তু এবার একাই আসতে পারব। আর শোন, এলেই কিন্তু খাবার ব্যবস্থা করতে পারবে না। আমি সিধে গিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকব।

সরল সামন্ত হেসে বলল, দ্বিতীয়বার আসুন তো, তারপর দেখা যাবে।

ওরা দুজনে বালুপথের ওপর আলোছায়ার আলপনা মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলল।

গ্রীষ্মে যথেষ্ট গরম পড়ে দিনের বেলায়। বালির পুরু আস্তরণ পাতা অঞ্চল। তাই সূর্যের খরতাপে বালি তেতে ওঠে। মধ্যাহ্ন থেকে বেলা তিনটে অবধি বালির ওপর দিয়ে পথ চলা প্রায় অসম্ভব। লেডিজ হোস্টেল, সুশান্ত ছাত্রাবাস আর প্রফেসারদের ছড়ান ছিটোনো কোয়ার্টারগুলো থেকে খোয়া

পেটানো পথ এসে মিলেছে শহর থেকে কলেজ অবধি প্রসারিত পিচ রোডের সঙ্গে। দিনের বেলা খরতাপে কেউ বালির ওপর দিয়ে চলাফেরা করে না। বেলা পড়ে এলে বালির গরম কমে আসে, তখন কলেজের পেছনের বালিয়াড়িতে বনঝাউয়ের তলায় ছেলেরা এক একটা গোলটেবিল তৈরী করে শুয়ে-বসে আড্ডা জমায়। সমুদ্র মাইল তিন-চার দূরে। হু হু করে বইতে থাকে দক্ষিণের হাওয়া। চাঁদ থাকলে কথা নেই, একেবারে অ্যারেবিয়ান নাইটস্-এর পরিবেশ।

চলতে চলতে সরল বলল, মনে দ্বিধা না রেখে বলবেন একটা কথা ?

সুমিতা একটু চমকে উঠে বলল, বলুন।

জায়গাটা আপনার লাগছে কেমন ?

সুমিতা বলল, কোনদিন ঘর থেকে এতদূরে আসিনি মাকে ছেড়ে, তাই প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হত, কিন্তু এখন জায়গাটা বেশ ভাল লেগে গেছে।

সরল বলল, আর একটি প্রশ্ন।

বলুন।

আপনার বাড়িটি কোথায়, এবং ওখানে আপনার আপনজন কারা কারা রয়েছেন ?

সুমিতা বলল, কলকাতার পুরনো বাসিন্দে। ছোট্ট একটি বাড়ি আছে বিডন স্ট্রিট এলাকায়। বাবা গভর্নমেণ্ট এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। বছর তিনেক মারা গেছেন। একটিমাত্র ভাই মেডিকেল কলেজে পড়ছে। তার দেখাশোনা করতে মায়ের সময় কেটে যায়।

সুমিতা থামতেই সরল বলল, ইতিমধ্যে মা কিংবা ভাই কি আপনার কাছে ঘুরে গেছেন ?

সুমিতা বলল, প্রথম আসার দিন আমি ভাইকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম। তারপর ডিসেম্বরে ক'দিনের ছুটিতে মা'র সঙ্গে দেখা করে এসেছি। জায়গাটার গল্প শুনে উনি কিছুদিন আমার কাছে এসে থেকে যাবেন বলেছেন।

সরল বলল, ভাইয়ের কেমন লাগল ?

সুমিতা বলল, লাগবার সময় আর পেল কোথায় ? পরের দিনই চলে গেল ক্লাশের তাড়ায়। যাবার সময় বলে গেল, মনে হচ্ছে এখানে ভালই কাটবে তোর দিদি।

সরল হেসে বলল, ঐ তো হল। তার মানেই জায়গাটা আপনার ভাইয়ের অপছন্দ হয়নি।

সুমিতা হেসে বলল, আচ্ছা এবার আমি একটা প্রশ্ন করি ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সুমিতা বলল, আমাদের ভাল লাগার ব্যাপারটা নিয়ে এত কথা জানতে চাইছেন কেন ? নিছক কৌতূহল, না আর কিছু ?

সরল বলল, একেবারেই কৌতূহল নয়, উদ্দেশ্য আছে বইকি।

সুমিতা বলল, বলুন কি উদ্দেশ্য ?

আমাদের এ অঞ্চলে আপনি এতদূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, আপনার

যদি জায়গাটা ভাল না লাগে তাহলে আপনি কাজ করবেন কি করে ? আগে স্থান পছন্দ, তারপর কাজ।

সুমিতা হেসে বলল, কলেজের একজন বিচক্ষণ মেম্বারের মত কথা বলেছেন আপনি।

সরল বলল, আপনার আসার কিছুদিন আগে ইংরাজী পড়াবার জন্যে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তাঁর তো এসেই পালাই পালাই অবস্থা আর মেয়েদের কাছে রোজ আক্ষেপ, একটুও তাঁর নাকি ভাল লাগছে না। শহর থেকে এসে এই নির্জনতা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে যেন নির্বাসন। শেষে ঝাঁক ঝাঁক সাদা পায়রার মত ওড়াতে লাগলেন চাকরীর জন্যে দরখাস্ত। কোথায় একটা মিলেও গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিয়ে চলেও গেলেন।

সুমিতা বলল, এখন আমার জায়গাটা শুধু ভালই লাগছে তা নয়, পরিবেশটাকে সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলেছি।

সরল বলল, এতে কলেজের মেয়েরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছুই পাবে।

সুমিতা বলল, সত্যি কথা বলতে কি ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছ থেকে কি পাবে বলুন তো ? পড়া শুরু হতে না হতেই পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। এক এক সময় দুঃখ হয়, সাহিত্য পড়াচ্ছি বলে মনেই হয় না।

সরল বলল, একটুখানি চোখ চেয়ে থাকলেই সব বোঝা যায়। একদিন বেলা পড়ে আসছে, আমি লেডিজ হোস্টেলের পাশ দিয়ে আসছি, কানে এল, দুটি মেয়ে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ বলছে দুজনের কাছে। কবিতাটি জীবানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।' আপনি তো বাংলার অধ্যাপিকা, বলুন না, ওর ভেতর মুখস্থ করে মনে রাখার ব্যাপার কিছু আছে কি ?

সুমিতা বলল, সমস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই ঢেলে সাজান দরকার।

সরল বলল, ও কথা বলবেন না। আপনি কি আমাদের এই বুড়ো বিদ্যালয়টিকে ভাতে মারতে চান ?

সুমিতা বলল, বিশ্বাস করুন, আমি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় ভালবাসি। যার ভেতর এতকাল সুখে-দুঃখে আনন্দ-উত্তেজনায় কাটালাম তার ওপর একটা আকর্ষণ থাকা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সব কাজেই এর গদাই-লস্করী চলন অনেক সময় অসহ্য মনে হয়।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে গেল প্রায় সুমিতার কোয়ার্টারের সামনে। আর ঠিক সেই সময় এক পশলা বৃষ্টি চড়বড়িয়ে নেমে এল। কথায় মত্ত হয়ে ওরা খেয়ালই করেনি যে পশ্চিমের মেঘটা আস্তে আস্তে এগিয়ে কখন চাঁদটাকে গিলে ফেলেছে।

সুমিতা আর সরল সামন্ত বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল সামনের কোয়ার্টারে।

সুমিতা দরজা খুলে আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখে লোডশেডিং চলছে। বৃষ্টির ঝাপটায় ভেতর বাইরে দাঁড়িয়ে সরল সামন্ত। বিছানার পাশ থেকে

টর্চটা আনতে গিয়ে মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কাজরীর হাতে টর্চটা দিয়ে দিয়েছিল। আজ ওদের বাড়ি থেকে ফেরার সময়, চাঁদ ছিল তাই কারুর মনেই হয়নি টর্চটার কথা।

এখন দারুণ একটা সমস্যায় পড়ল সুমিতা, আবার সমস্যার সমাধানেরও সময় নেই হাতে। বৃষ্টিটা ঝলকে ঝলকে চেপে এসে বারান্দা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সুমিতা সকল দ্বিধা দূর করে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, আলো জ্বলছে না, লোড শেডিং, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

সরল বলল, অন্ধকারে ঘরের ভেতর গিয়ে আর কি করব, তার চেয়ে এখানে বেশ তো আছি।

সুমিতা আবছা আলো-আঁধারে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বৃষ্টিতে এখুনি সারাটা ভিজে যাবেন, আসুন তো ভেতরে।

সরল সামন্ত আর কোন কথা বলতে পারল না। সে সুমিতার বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরে আন্দাজে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল।

সুমিতা ওকে চেয়ারের কাছে নিয়ে এসে হাতখানা চেয়ারে ঠেকিয়ে দিয়ে বলল, চেয়ারটায় বসুন। কাজরী কাল টর্চটা নিয়ে গিয়েছিল, আনতে ভুলে গেছি। ঘরে মোমবাতি নেই। দেশলাই ঠিকে ঝিয়ের হেফাজতে।

সরল বলল, কোন অসুবিধে নেই, দিব্যি বসে আছি। শ্রাবণ মাস নয় যে সারা দিনরাত বৃষ্টি ধরে থাকবে। এখুনি বৃষ্টি থামলেই বেরিয়ে পড়ব।

সুমিতা খাটের এক প্রান্তে বসে খোলা জানালা দিয়ে দক্ষিণের দিকে চেয়েছিল। কোয়ার্টারের শেষে কাঁটা তারের উঁচু বেড়া। এ বেড়া লেডিজ হোস্টেল অবধি চলে গেছে। কাঁটা তারের বেড়ার শেষে অনেকখানি জমি কলেজের। আম আর বাদামের একটা বন তৈরী হয়েছে। তার ঠিক পরেই একটা ক্যানেল। দূরের নদী থেকে ব্যবসায়ীরা মফস্বল শহরে মালপত্র বয়ে নিয়ে আসে এই ক্যানেল পথে।

একটা নৌকো ক্যানেলে নোঙর ফেলে আছে। টিমটিম করে আলো জ্বলছে। বৃষ্টির কাঝটার ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে কাঁপা কাঁপা আলোগুলো।

সুমিতা বলল, দেখুন তো আমাকে পৌঁছে দিতে এসে আপনাকে কি রকম আটকে পড়তে হল।

সরল গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক কথা, কাজের মানুষরা আটকে পড়লে অসুবিধে হয় বৈকি।

সুমিতা কথার সুরটা না বুঝেই বলল, সত্যি বিশেষ দুঃখিত।

সরল বলল, শুধু দুঃখিত হলে তো চলবে না, ক্ষতিপূরণ করুন।

এতক্ষণে সুমিতা নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে। সে হেসে বলল, কি ক্ষতিপূরণ চান?

সরল বলল, এটা নিয়ে যখন কোর্টে দৌড়ব না, তখন ক্ষতিপূরণ আপনার ক্ষমতা মতই আপনি করবেন।

সুমিতা খানিক সময় চুপ করে থেকে বলল, আপনি গান ভালোবাসেন ?

সরল সামন্ত বলল, আমাকে দেখে কি আপনার খুনী বলে মনে হয় ?

এ কথা কেন বলছেন ?

সরল বলল, শুনেছিলাম, যারা গান ভালবাসে না তারা নাকি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

সুমিতা বলল, বেশ, তাহলে ক্ষতিপূরণ বাবদ একখানা গান শোনাই।

সরল বলল, গান তো আগে শুনি, তারপর বলা যাবে ঐ একখানা গানে ক্ষতিপূরণ হল, না আরও চাই।

সুমিতা বলল, একবার গান শুনলেই বলবেন, আপনার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে, আর গাইতে হবে না।

একটু থেমে সুমিতা গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল।

আবার থামল সুমিতা। বলল, আধুনিক ছাড়া আর কি গান শুনবেন বলুন ?

সরল বলল, আপনি বুঝি গানের দিক থেকে আধুনিক নন ?

তা বলতে পারেন।

সরল বলল, তবে এই বাদলার দিনে বর্ষার গানের রাজাকে দিয়ে শুরু করুন। তারপর সামন্ত নৃপতিদের গান দিয়ে শেষ হোক।

সুমিতা বলল, রাজার কথা তো বোঝা গেল, কিন্তু সামন্তদের কথা তো বুঝলাম না।

সরল বলল, রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ দিয়ে শেষ করার কথাই বলছি। অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না থাকে।

সুমিতা বলল, বর্ষা এখনও শুরু হয়নি। সারা বর্ষাকাল আপনার লাইব্রেরীতে পড়তে গিয়ে গান শুনিয়ে আসব। তাই আজ ওঁদের ভেতর থেকে যে কোন একজনের গানের ফরমায়েশ করুন। সবাইকে আর এক আসরে ডাকবেন না।

সরল বলল, তবে রাজচক্রবর্তীর দানই নেব।

সুমিতা একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বর্ষার গান গেয়ে গেল। সরল মগ্ন শ্রোতার মত পান করতে লাগল সে গানের সুধা।

বর্ষা কখন থেমে গেছে খেয়াল নেই কারু। একটি গান থামছে তো অন্য একটির জন্যে অনুরোধ। গানের কথা বড় একটা ভুলে যায় না সুমিতা। এদিক থেকে তাকে স্মৃতিধরও বলা চলে। যদি কোথাও সে কথার জন্যে থামছিল, অমনি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কথাগুলো যুগিয়ে দিচ্ছিল সরল সামন্ত।

গান শেষ হলে সরল সামন্ত নীরব। সুমিতা বলল, আপনি নিশ্চিত গান জানেন। একখানা গেয়ে শোনাতেই হবে।

সরল বলল, বিশ্বাস করুন, দুটো জিনিস আমি পারি। গানের রসাস্বাদন করতে, আর গানের কথাগুলো মনে রাখতে। কিন্তু গান গাইতে পারি না।

সুমিতা বলল, বেশ, তাহলে বর্ষার একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

তা পারি। তবে আপনার গানের পরে এ আর জমবে না।

সুমিতা বলল, খুব জমবে। একটানা গানের পর রেসিটেশান যে-কোন আসরের মনোটনি ভেঙে দেবে।

সরল বলল, আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু একটা কথা দিন।

বলুন।

আমার আবৃত্তির পর আপনি অন্তত আর একখানা গাইবেন।

তা গাইব, কিন্তু কেন ?

সরল বলল, মন ভরে আছে গানের সুরে। আবৃত্তি করলে মনের সেই মগ্নতাটুকু আর থাকবে না। তাই বলছিলাম, আপনার শেষ গানের রেশটুকু নিয়েই চলে যাব।

বেশ তাই হবে। আমাকেও কিছু পেতে দিন আজ।

সরল 'মেঘদূত' আবৃত্তি করল। ভরাট পরিপূর্ণ দরদী পুরুষ কণ্ঠের আবৃত্তি। কণ্ঠের ওঠা-নামায় কোন সচেতন চেষ্টা নেই। কবির বাণী যেন এক যথার্থ যোদ্ধার কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে।

কবিতা থামলে সুমিতা বলল, যদি যথার্থ শ্রোতা কোন আসরে থাকেন তাহলে আমার গান আর আপনার আবৃত্তির ভেতর আবৃত্তিতেই ফুল মার্কস দিয়ে বসবেন।

সরল সামন্ত বলল, ওসব বলে শেষের গানটি এড়াতে পারবেন না।

সুমিতা গাইল,—

'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে,
শেষ কথা যাও বলে ॥
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার,
গোধূলিতে আলো-আঁধারে
পথিক যে পথ ভোলে।...'

গান শেষ হলে সরল সামন্ত উঠে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না! অন্ধকার ঘর থেকে ধীরে ধীরে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু মগ্ন মানুষটিকে কোন কথা বলতে তার ইচ্ছে হল না।

তিনদিন পরে সুমিতা একাই গেল সামন্তের লাইব্রেরীর দিকে। লোড শেডিংয়ের রাতে মানুষটি চলে যাবার পর সে অনেকক্ষণ বসে বসে তার কথা ভেবেছিল। সুমিতা সেদিন একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল। সরল সামন্ত অকৃত্রিম মনের অধিকারী। তার গণ্ডিবাঁধা স্কুল-কলেজের শিক্ষা নেই বলেই সে যথার্থ শিক্ষা লাভ করেছে। কেতাদুরস্ত চালচলন নেই মানুষটার, তা বলে তার সংস্কৃতিতে ঘাটতি আছে একথা বলার উপায়ও নেই। রবীন্দ্রনাথের গান আর সুরের মর্মে যে মানুষ ঢুকতে পারে, তার সংস্কৃতিহীন হবার জন্যে আর দ্বিতীয় সার্টিফিকেটেরই দরকার হয় না।

সুমিতা সোজা গিয়ে ঢুকল লাইব্রেরী ঘরে। আলো প্রচুর না থাকলেও অপ্রতুল ছিল না। এক ফালি সোনালী আলো লাইব্রেরী ঘরের ভেতর একটা কাচের পাল্লার ওপর গিয়ে পড়েছিল। তার প্রতিফলন হচ্ছিল উল্টোদিকের সাদা দেয়ালে। সুমিতা দেখল, সেদিকে মুখ করে বসে সরল সামন্ত। মগ্ন হয়ে টেবিসের ওপর কি একখানা বই রেখে পড়ছে। সাদা দেয়ালের আলোটা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এক অপার্থিব দীপ্তি এনে দিয়েছে।

সুমিতা কি করে সরল সামন্তের দৃষ্টি তার দিকে ফেরাবে তা বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে বই দেখতে লাগল।

কতক্ষণ পরে সরলের গলা পেল সে, আরে আপনি যে, কখন এলেন?

সুমিতা ফিরে দাঁড়িয়ে একমুখ হাসি উপহার দিল সরলকে। বলল, কি বই পড়া হচ্ছিল এত মগ্ন হয়ে?

ওসব কিছু না, বলতে পারেন নিছক পাগলামি।

সুমিতা টেবিলের কাছে নিজেই এগিয়ে গেল। মাথা নুইয়ে দেখল, একখানা নয়, দুখানা বই পাশাপাশি পড়ে। একখানা জরাজীর্ণ, অন্যটি আনকোরা নতুন। দু'খানাই কিন্তু এক বই। অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। একখানা প্রথম সংস্করণের বই, অন্যটি বিনয় ঘোষের সম্পাদিত নতুন প্রকাশ।

সুমিতা বলল, একই বই দুখানা নিয়ে কি করছেন?

বললাম তো, ওটা একেবারে পাগলামি। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে কোথায় কি পার্থক্য তাই মিলিয়ে দেখছিলাম।

সুমিতা বলল, উঠলেন কেন?

সরল বেরিয়ে গেল। সুমিতা ভেবে দেখল, সেদিন প্রায় এই সময়টিতে সরল স্নানে গিয়েছিল।

সুমিতা ইংরাজী বিভাগে হেমিংওয়ের বইগুলো টেনে টেনে দেখতে লাগল। এই লেখকটি সুমিতার বড় প্রিয়। সাহিত্যের পটভূমি রচনা এবং তার চরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষটি পাহাড় পর্বত অরণ্য সমুদ্র চষে বেড়িয়েছেন। অভিজ্ঞতা নইলে সত্যিকারের সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব?

দিদি, আপনি এসে গেছেন, আমাকে তো কই কলেজে কিছু বলেননি?

সুমিতা হেসে বলল, পাছে তুমি আমার আসার পথটা বন্ধ করে দাও সেই জন্য।

কেন দিদি?

রোজ রোজ খাওয়ালে তোমাদের এখানে কে আসবে বল?

কাজরী বলল, ঐ আবার খাওয়া, সবই বাড়ির জিনিস।

সুমিতা বলল, তা হোক, তবু তুমি ও সব খাইয়ে আমার লাইব্রেরীতে আসার পথটা বন্ধ করে দিও না।

আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে আর খেতে বলব না, হল তো?

সুমিতা হেসে বলল, তা বলে কালোজামও খাওয়াবে না?

কাজরী কোঁচড়ে করে কি যেন এনেছিল, টেবিলের ওপর ঢেলে দিয়ে বলল, দেখুন তো কেমন ?

একরাশ বড় বড় জামরুল। টস টস করছে মিষ্টি রসে। জামরুলগুলোর মাথার দিকে পিঙ্কের আভা।

একটা হাতে তুলে বলল সুমিতা, চমৎকার !

খেয়ে দেখুন।

হাতের জামরুলটা কাজরীর হাতে গুঁজে দিয়ে টেবিল থেকে আর একটা জামরুল তুলে কামড় দিল সুমিতা।

খেতে খেতে বলল, একদম জলসা নয়, রীতিমত মিষ্টি।

কাজরী বলল, আমাদের পুকুরের ধারে জামরুলের গাছটা। তার দু'তিনটে ডাল অনেকখানি জলের দিকে ঝুঁকে আছে। তাই এ জামরুলগুলো রক্ষে পেয়েছে ক্ষুদে ডাকাতদের হাত থেকে।

সুমিতা বিস্ময় চিহ্ন চোখে এঁকে বলল, ক্ষুদে ডাকাত।

কাজরী বলল, হ্যাঁ, ওরা দাদার পোষা ডাকাত।

পোষা ডাকাত ! সে কি রকম ?

কাজরী বলল, আমাদের বাড়ির পিছনে যে বালিয়াড়িটা আছে, তার ঠিক নীচেই একটা প্রাইমারী স্কুল। দুপুরে স্কুলের টিফিন হলেই ঐ বালির পাহাড় ডিঙিয়ে হুলদের মত এক দঙ্গল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের বাগানের ওপর। জাম জামরুল আম লিচু, কোন কিছুই ওদের জ্বালায় থাকবার উপায় নেই।

সুমিতা বলল, তখন তো তুমি কলেজে।

শুনুন না দিদি, পাছে আমি কলেজ থেকে এসে পড়ি সেজন্যে ওরা গাছে উঠলেই একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ধারে গেটের সামনে। কোনদিন আমাকে রাস্তার ওপ্রান্তে আসতে দেখলেই হাততালি আর জোর শিস্ দিয়ে সব ক'টা ডাকাতকে সাবধান করে দেবে পাহারাদার।

সুমিতা বলল, তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে ওরা সাহস করে গাছে চড়তে ?

কাজরী বলল, তাহলে আর বলছি কি, আমার দাদাটিই ওদের পাহারাদার।

সুমিতা হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ে আর কি।

কাজরী বলল, একদিন বাঁশবাগানের ভেতর লুকিয়ে থেকে দেখি, ছেলেগুলো জামের গাছে উঠে জাম পেড়ে খাচ্ছে, আর নীচে দাঁড়িয়ে দাদা করুণ ভাবে তাদের দিকে দুটো হাত তুলে বলছে, দে দে, দু'টো ছুঁড়ে দে।

ওরা নিজেরা বাঁদরের মত শাঁস খেয়ে বিচি ফেলছে নীচে, আর দয়া হলে দু'চারটে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

আমাকে ছড়ি উঁচিয়ে তেড়ে আসতে দেখে দাদা তবলায় চাঁটি দেবার মত চড়বড় করে ক'টা হাততালি দিলে। অমনি, বিশ্বাস করবেন না দিদি, ঐ উঁচু গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সব ক'টা লাফিয়ে পড়ল নীচে। ভাগ্যিস

নীচে বালি ছিল, নইলে সব ক'টারই হাত-পা ভাঙত।

সুমিতা বলল, পালিয়ে গেল সবাই ?

কাজরী বলল, যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ তো আমি আগলে রয়েছি, তাই স্থলপথ দিয়ে না গিয়ে জলপথ দিয়ে চলে গেল।

কি রকম ?

পুকুর সাঁতারে।

সুমিতা বিস্ময়সূচক চিহ্ন মুখে এঁকে বলল, এতবড় পুকুরটা সাঁতরে !

কাজরী বলল, ওটা ওদের কাছে কিছুই না। কিন্তু এজন্যে আমাকে দাদার কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল।

তুমিই শেষে বকুনি খেলে ?

হ্যাঁ দিদি। দাদা তো পুকুরের ওদিকে সরে পড়েছে ! এদিকে কিছুক্ষণ পরে ভেজা আসামীদের বন্দী করে দাদার কাছে নিয়ে এসেছেন ওদের মাস্টারমশায়। তাঁদের ধারণা ওরা চুরি করতে এসেছিল, তাড়া খেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

দাদা ওদের দুর্দশা দেখে আর আত্মগোপন করে থাকতে পারল না। বেরিয়ে এসে মাস্টারমশায়কে বলল, আপনি সেলফিস জায়েণ্টের গল্পটা পড়েছেন ?

মাস্টারমশায় বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, গল্পটা পড়া।

দাদা বলল, ওদের কিছু বলবেন না, আমি ইচ্ছে করেই ইস্কুলের দিকের পাঁচিলটা ভেঙে দিয়েছি। ওরা এসে ফলপাকড় না তুলে খেলে আমার বাগানের গাছে একটাও ফল ফলবে না।

মাস্টারমশায় ছাত্রদের নিয়ে চলে যাবার পর দাদা আমাকে নিয়ে পড়ল। বলল, তোর জন্যে ছেলেগুলোকে জলে পড়তে হল, আবার কত যে মার খেল বেচারারা মাস্টারমশায়দের হাতে তার কি লেখাজোখা আছে।

আমি আর কোন কথা বলিনি সেদিন।

সুমিতা বলল, দারুণ চরিত্র তোমার দাদার।

কাজরী বলল, ওর বিচিত্র খেয়ালের কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

কি রকম ?

কাজরী বলল, একটা দুটো নয়, অজস্র।

সুমিতা বলল, তবু একটা শুনি।

কাজরী বলল, এক চোরের কাহিনী শুনুন। দু'তিন বছর আগে এক শীতের রাতে দাদা কি যেন একটা শব্দ শুনে বিছানার ওপর উঠে বসল। জ্যোৎস্না রাত। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে কি দেখে দরজা খুলে তরতরিয়ে নেমে গেল।

স্নানের ঘাটের সামনে যে নারকেল গাছ, তার তলায় গিয়ে ওকে দাঁড়াতে দেখলাম। ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমের ঘোর তখনও আমার ভাল করে কাটেনি। তাই সবকিছু মোটামুটি দেখে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠিনি।

হঠাৎ দাদার গলার আওয়াজ পেয়ে ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে নীচে গেলাম।

দাদা হাত নেড়ে শাসনের ভঙ্গীতে নারকেল গাছের মাথার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, নেমে আয় হতভাগা, নইলে আমি গাছে উঠলে মেরে তোকে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।

দেখলাম, একটা লম্বা দড়ি গাছ থেকে মাটি অবধি ঝুলে আছে। বুঝতে পারলাম, লোকটা দড়ি বেঁধে গাছ থেকে ডাবের কাঁদি নামাচ্ছিল। হঠাৎ হাত ফস্কে কয়েকটা জলে পড়ে যেতেই শব্দ উঠেছিল।

দাদা আবার হেঁকে বলল, নেমে আয় কিচ্ছু বলব না, নইলে শীতের পুকুরে তোকে পাঁকে পুঁতে দেব।

লোকটা দাদার হম্বিতম্বিতে শেষটায় নামল। নেমেই দাদার পা জড়িয়ে ধরল। দাদা লোকটার পিঠে দু'চার ঘা উত্তম-মধ্যম কষিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল এই লাইব্রেরী ঘরে। বিশ্বাস করুন দিদি, সেই শীতের রাতে লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে বক্তৃতা শুরু করল। ডাব তোলা যে অন্যায়, তাতে যে অর্থের দিক থেকে মোটেই লাভজনক নয়, সেই সব বোঝাতে লাগল। কেরালা ডাবের দেশ, সেখানকার লোকে একেবারেই ডাব পাড়ে না। সেখানে নারকেলের তেল হয়। নরকেলের মালা হুঁকোর জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চালান যায়। নারকেল ছোবড়ায় দড়ি হয়। কিছুই ফেলা যায় না নারকেলের।

লোকটাও দিব্যি মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতে লাগল দেখে দাদার উৎসাহ দারুণ বেড়ে গেল। শেষে আমাকে একটি হ্যারিকেন আনতে বলল। অগত্যা শীতের রাতের ঘুম কামাই করে আমি হ্যারিকেন জ্বালতে গেলাম।

ফিরে এসে দেখি ঘরের মালিক আর চোর পাশাপাশি বসে গল্পে একেবারে জমে গেছে। বাইরে থেকে হাসির শব্দও একটা পেয়েছিলাম, আমি আসাতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল হাসিটা।

বাঁ হাতে হ্যারিকেনটা তুলে দাদা বই খুঁজতে লেগে গেল। বেরুল, 'কোকোনাট ইণ্ডাষ্ট্রি অব কেরালা'।

সেই বইয়ের থেকে চলল পাঠ। চোর ইংরাজী জানে না। দাদা বেশ খানিকটা পড়ে, আবার চোরকে বাংলা করে বোঝায়।

আমি ঘুমুতে চলে গেলাম। খানিক বেলায় উঠে দেখি, দাদা দাঁড়িয়ে আছে। চুপি চুপি বলল, দেখ কাজু, একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছি।

বললাম, বন্দোবস্তটা কি শুনি?

দাদা বলল, লোকটা বেশ গুণী রে। ও শুধু ডাব-নারকেল চুরিই করে না, গাছ-পালা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমি ওকে সব ক'টা নারকেল গাছ তদারকের ভার দিয়ে দিলাম।

বললাম, বেশ করেছ, ল্যাঠা চুকে গেছে। ওর চুরি করার পথটা মেরে দিয়েছ। এখন কি করতে হবে বল?

দাদা বলল, আমাদের ঐ মিষ্টি গাছের একটা নারকেল ভেঙে ওকে চাট্টি

মুড়ি খেতে দে। বুঝুক, কি রকম গাছের তদ্বির-তদারকে ওকে রাখা হল।

এবার বুঝুন দিদি, মানুষটি কেমন।

সুমিতা হাসি চেপে বলল, সেই চোরটি এখনও বহাল আছে?

কাজরী বলল, বহাল তবিয়তে। তবে লোকটা মনে হয় চুরিবিদ্যে ছেড়ে দিয়েছে। উন্নতিও করেছে সংসারের। আমাদেরও লোকসান নেই।

সুমিতা বলল, তবে দেখ, দাদা তোমার কতখানি বিচক্ষণ।

বলতে বলতেই একটি পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সরল সামন্ত লাইব্রেরীতে ঢুকল।

কাজরী বলল, দিদি আপনি বইপত্র দেখুন, আমি একটু আসছি, ঘরের কাজ আছে।

সুমিতা বলল, ও নিশ্চয়! আর ঐ যে জামরুলগুলো পড়ে রইল, ওগুলো নিয়ে যাও।

ও তো আপনার জন্যে।

আমি ঐ জামরুলের পাহাড় নিয়ে কি করব। খেয়েছি তো প্রচুর।

কাজরী বলল, তা হোক, দাদা স্নান করতে গিয়ে পুকুরে নেমে ওগুলো পেড়ে এনেছে আপনার জন্যে। ওর সদ্ব্যবহার আপনাকেই করতে হবে। নইলে যাবার সময় সঙ্গে দিয়ে দেব!

সুমিতা বলল, আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে।

কাজরী চলে গেল। সুমিতা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার ঐ ক্ষুদে ডাকাতদের দলে আমাকে ভর্তি করে নেবেন?

সরল বলল, কাদের কথা বলছেন?

ঐ যারা জাম-জামরুলের ডাল ভেঙে দুপুরবেলা জলযোগ করে যায়।

সরল সামন্ত হা হা করে অনাবিল একটা হাসি হাসল। বলল, কাজু নিশ্চয়ই এসব গুপ্ত খবর আপনাকে দিয়ে গেছে।

সুমিতা বলল, এসব খবর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা, আপনার সেই সাধু নারকেল চোরটির খবর কি?

তাও আপনাকে বলা হয়ে গেছে?

সুমিতা বলল, কাজু তার সুমিতাদিকে ভালবাসে, তাই কোন কিছুই সে আমার কাছে গোপন করে না।

সরল বলল, একটি বিষয় সে আপনার কাছে বলেনি, চেপে গেছে।

কি বিষয় বলুন তো?

সরল বলল, আমি ওর দাদা কি ও আমার দিদি, সেই কথাটি।

সুমিতা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। বলল, তা আর না বলে কি ছেড়েছে। আপনি যে ওর ছোট ভাই, সেকথা না বললেও চলে। ওর শাসনের বহর দেখলেই বোঝা যায়।

সরল যেন বোনের কানে না পৌঁছয় এমনি ভাব করে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, ওর মা আমার বড়মা ছিলেন। ও আমার আগেই জন্মাতে পারত।

সুমিতা বলল, ও আপনার নিজের বোন নয় ?

নিজের বোনই তো।

তবে যে বললেন, আপনার বড়মার মেয়ে ?

সরল সামন্ত যেন অবাক হল। বলল, বড়মা তো নিজের মা-ই। ছোটবেলা মা মারা গেলে বড়মা আমাকে বুকে করে মানুষ করেছিলেন। এই তো সেদিন আমার বড়মা-ও মারা গেলেন।

সুমিতা বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনার বাবার কি দুই বিয়ে ?

সরল বলল, খুব আস্তে, ও কিন্তু জানে না এসব কথা। আমার বাবার প্রথম বিয়ের পর অনেকদিন অবধি ছেলেমেয়ে হয়নি, তখন ঠাকুর্দা দ্বিতীয় বার বিয়ে দেন। আমি সেই দ্বিতীয় বিয়ের সন্তান। মা আমাকে জন্ম দেবার পর মারা যান। বড়মা-ই আমাকে প্রতিপালন করেন। আমি তখন বেশ বড় হয়েছি, বড়মা-র কোলে কাজু আসে। সেই থেকে দু'জনেই একই মায়ের কোলে-পিঠে মানুষ।

সুমিতা বলল, আপনাদের চেহারার পার্থক্যটা প্রথম দিনই আমার চোখে পড়েছিল।

সরল বলল, আমার বাবা চোখে পড়ার মত সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বড়মা-র রঙ একটু ময়লা ছিল, তাই কাজুর রঙটা শ্যামলা হয়েছে।

সুমিতা বলল, কাজু শ্যামলা হলে কি হবে, গড়ন বা মুখশ্রী খুবই সুন্দর।

সরল সামন্ত যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, নিজের বোনের প্রশংসা নিজের মুখে করা ঠিক নয়, কিন্তু ওর লাবণ্য আর গড়ন অনেক রূপসীকেও হার মানায়। তাছাড়া ওর স্বভাবের তুলনা হয় না মিস বিশ্বাস। আমি দাদা হয়ে কি আর বলব, আপনাদের কাছে তো রইল, দেখবেন।

সুমিতা বলল, শুধু আমি নয়, সব অধ্যাপকই কাজরীর আচরণের বিশেষ প্রশংসা করেন।

ওরা দুজনে এর পর বইপত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করল। সুমিতা নানা বিষয়ে পড়াশোনা চিরদিনই ভালবাসে। কিন্তু সরলের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সে দেখল, সরল সামন্ত এক অতি দক্ষ ডুবুরীর মত জ্ঞানের সাগরটাকে চষে বেড়িয়েছে।

আলোচনা থামেই না, কিন্তু সন্ধ্যা নামলে সম ফেলতে হল। সুমিতা বলল, আজ আপনাকে কষ্ট দেব না। আমি একাই দিব্যি যেতে পারব। টর্চও সঙ্গে রয়েছে।

সরল হেসে বলল, পাছে সঙ্গী লোকটা গান শোনবার জন্যে বায়না ধরে সে জন্য আগেভাগেই তাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন ?

সুমিতা বলল, এরকম বললে কিন্তু আমি এখান থেকে আজ আর নড়বই না। গান শুনিয়ে, আবৃত্তি শুনে, রাত কাবার করে দেব।

সরল কাজরীকে হাঁক দিয়ে কাছে ডাকলে। কাজরী এলে বলল, তুই তো তোর দিদিকে একটা দিনও কাছে রাখতে পারলি না. দেখ, নিজের থেকে তোর সুমিতাদি আজ রাতে থেকে আমাদের গান শোনাবেন বলছেন।

কাজরী কলকলিয়ে উঠল, সত্যি! কি মজা, কি মজা!

সুমিতা বলল, দূর বোকা মেয়ে সে অন্য একদিন হবে এখন।

সরলের দিকে চেয়ে বলল, আপনি তো বেশ মানুষ, মেয়েটাকে মাতিয়ে দিলেন।

কাজরীর কি হল, হঠাৎ চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠল। বেলাশেষের আবছা আলোতেও তা ঢাকা পড়ল না।

সুমিতা এগিয়ে গিয়ে কাজরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ না, আর একদিন নিশ্চয়ই তোমার এখানে সারারাত কাটিয়ে যাব। গান শোনাব, আর তার বদলে তোমার হাতের রান্না খাব।

একটু থেমে সুমিতা বলল, গান শিখবে?

কাজরী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, শেখাবেন আপনি?

সুমিতা বলল, অমনি মেঘের কোলে রোদ হাসল। হারমোনিয়াম আছে?

সরল বলল, পুরনো দিনের প্যারিস রিডের একটা হারমোনিয়াম আছে। কলেজে ফাংশান টাংশান হলে ধুলো ঝেড়ে সেরে-সুরে নিয়ে কাজ চালায়। বলেন তো কলকাতা থেকে ওটাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

সুমিতা বলল, পুরনো জিনিস অনেক ভাল। ভাল করে সারিয়ে আনুন ভাল মিস্ত্রী দিয়ে। তবে বাজাতে হবে রোজ।

সরল বলল, আপনি যদি শেখান তাহলে ও উৎসাহের সঙ্গে শিখবে।

সুমিতা বলল, শেখাব একটি শর্তে, কোন দিন আর আমার সামনে কাঁদতে পারবে না।

কাজরী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

সুমিতা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে সরল বলল, অতিথিকে কি বাঁশের জঙ্গলটাও পার করে দিয়ে আসতে পারব না?

সুমিতা হেসে মুখ ফিরিয়ে বলল, তাহলে কিন্তু শুধু নীচের রাস্তাই নয়, ওপরের রাস্তাতেও সঙ্গ দিতে হবে।

সরল বলল, মনে হচ্ছে একটা ভয় পাইয়ে দেবার মত কথা বলছেন।

সুমিতা হাসল। কাজরী বলল, দিদি আমি তাহলে এখন আসি।

সুমিতা বলল, সামনে তোমার উইকলি পরীক্ষা, যাও, বই নিয়ে বসগে।

সরল বলল, বই নিয়ে বসলেই ওর যত কাজের চাপ বেড়ে যায়, তখন রান্নাঘরে ঢুকে কাজের মেয়েটিকে সাহায্য করতে লেগে যায়। আর আমাকে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বইগুলো পড়ে ব্যাখ্যা করে যেতে হয়। এ নইলে আপনার ছাত্রীর পড়াই হয় না।

সুমিত্রা বলল, তাহলে তো আপনার যাওয়া চলবে না আমার সঙ্গে।

কাজরী বলল, না দিদি, আমি অনেকদিন দাদার কাছ থেকে বুঝে নিয়েছি,

এখন আমার একা একা পড়তে একটুও অসুবিধে হবে না।

সুমিতা আর সরল পাশাপাশি গল্প করতে করতে চলতে লাগল।

সুমিতার কোয়ার্টারের সামনে এসে সরল বলল, আজ এখান থেকেই ফেরা যাক্।

সুমিতা একটুখানি বিস্ময়ের আওয়াজ গলায় তুলে বলল, আসবেন না ভেতরে ?

সরল বলল, আজ তো আর পথিক তাড়ানো বর্ষা নামেনি যে তাড়াতাড়ি আপনার দাওয়ায় উঠে যাব, আর লোড শেডিংও নয় যে আপনি আমার হাত ধরে অন্ধের মত চৌকাঠ পার করে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর বসাবেন।

সুমিতা বলল, আমার গান সেদিন আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি, নইলে আজও আমার কোয়ার্টারে এসে গান শুনতে চাইতেন।

সরল বলল, ও কথা বলবেন না! পাছে আপনার কোন কাজের ব্যাঘাত হয় তাই আপনার কোয়ার্টারে ঢুকতে চাইনি।

সুমিতা বলল, আপনি এলে আমার কাজের ব্যাঘাত হবে ?

সরল বলল, লোকটা তো সুবিধের নয়। বসলেই আপনাকে উত্যক্ত করবে গান গাইতে বলে।

সুমিতা হেসে বলল, লোকটির কথা না শুনলেই হল।

সরল বলল, পারবেন না-শুনে ?

সুমিতা বলল, হয়তো পারতাম, কিন্তু আপনি আমাদের কলেজ কাউন্সিলেব মেম্বার। এখন না পেরে উপায় কি ?

সরল বলল, তাহলে আর আপনাকে গান গাইতে অনুরোধ করব না।

কেন ?

সঙ্গীত-ভক্তেব দাবীর চেয়ে যেখানে কলেজ কাউন্সিলের মেম্বারের জোর বেশী সেখানে আর যিনিই থাকুক সরল সামন্ত নেই।

সুমিতা বলল, অমনি একটুতেই রাগ হয়ে গেল আপনার ? চলুন তো, কত গান শুনতে পারেন দেখব একবার। বিরক্ত হয়ে উঠে না যাওয়া অবধি একের পর এক গান শুনিয়ে যাব।

হেসে বলল সরল সামন্ত, অমৃতে অরুচি।

গান হল, কিন্তু কথা হল তার চেয়ে বেশী। সুমিতা তার স্কুল-কলেজ জীবনের কথা শোনাল। তার বান্ধবীদের কথা। মাস্টারমশায়দের গল্প। শেষে তার ছোট্ট পরিবারের কথা দিয়ে শেষ করল।

সরল সামন্ত বেশীর ভাগ সময় নিল শ্রোতার ভূমিকা। সে শুধু গল্প করল তার লুপ্ত জমিদারীর এখনও অবশিষ্ট একটুকরো চরের। জালপাই মহল ছিল সেটা। তার ঠাকুর্দার বাবা নদীর ধারের সেই জলজঙ্গলে ভরা জায়গাটি কাটিয়ে সংস্কার করে আবাদী জমিতে পরিণত করেছিলেন। চাষা-ভুষোর নয়া একটা বসতি পত্তন করেছিলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি আরও দু'একটি ভাগ্যান্বেষী সে সময় পাশাপাশি দু'একটি জায়গা সরকারের কাছ

থেকে পত্তন নিয়েছিল। এখনও তাদের কারো কারো বংশধর সেখানে দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করছে। অবশ্য জমি-জায়গার বেশীর ভাগই সকলকে দিয়ে দিতে হয়েছে সরকারের হাতে। তাহলেও বেনামীতে কেউ কেউ বেশকিছু জমি রেখে দিয়েছে। মন্দির তুলে সেবাইত বনে গেছে। দেবতার নামে লিখিয়ে নিয়েছে জমি, হাত দেয় কার সাধ্যি।

জায়গাটার মায়া এখনও ছাড়তে পারেনি সরল সামন্ত। প্রায় পনেরো মাইল পথ নৌকোতে করে যেতে হয়। একবার গিয়ে পৌঁছলে নাকি সে অন্য জগৎ। এখনও সারাদিন বিচিত্র পাখির মেলা। বিশাল বট, অশ্বথ, শিরিষ, শিমুলের জটলা। তারই শাখায় শাখায় বিহঙ্গ নিবাস। পুকুরে চারিদিকে তালের গাছ। তার থেকে ঝোলে শত শত বাবুইয়ের বাসা। কোন ঝড়ের গোধূলিতে দেখা যায় বাবুইয়ের বাসাগুলো দারুণভাবে দুলছে। সারারাত ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে কতকগুলো বাসা টিকে যায়, বাকীগুলো লুটিয়ে পড়ে থাকে গাছের তলায় কাদা জলের মধ্যে। ভোরবেলা এক করুণ দৃশ্য। মৃত-অর্ধমৃত বাচ্চাদের নিয়ে বাবুইদের সে কি বুক-ফাটা আক্ষেপ। সাধ্যমত সাহায্য করতে হয় তালগাছে বাসাগুলো আবার বেঁধে দিয়ে।

রাতে এখনও ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁঝি শানাই বাজায় আর শত শত জোনাকী আলোর খেলা দেখিয়ে নেচে বেড়ায়। সে যেন সভ্যতার আলো না ঢোকা আদি অকৃত্রিম এক জগৎ।

সব শুনে সুমিতা দুঃখ করে বলল, কি ভাগ্য আপনার, আজও আপনি সেখানে যান।

সরল বলল, বিশ্বাস করুন, এখন ওখানে কোন মুনাফার ব্যাপার নেই, কিন্তু প্রতি ঋতুতে অন্তত একবার করে না গিয়ে পারি না। একটা অলৌকিক কিছু যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায়।

সুমিতা বলল, ওখানে কে দেখাশোনা করে আপনার জায়গা-জমি ?

সরল বলল, জমির ঝামেলা আর রাখিনি। উঁচু বাস্তুজমি কয়েক বিঘে জুড়ে রয়েছে। সেখানে পুকুর গাছপালা ফল সব্জির বাগান। একটা নাশি খাল নদী থেকে সোজা এসে মিশেছে আমাদের গড়খাইতে। ছোট একটা নৌকো বাঁধা থাকে সেখানেই। একটি মাঝি আর তার বউ থাকে আমার বাস্তুবাড়িতে। সব্জি ফলায়, নৌকোতে করে খাল নদী থেকে মাছ ধরে আনে। আমি গেলে ওর সঙ্গে যোগ দি।

সুমিতা বলল, কাজু যায় ওখানে ?

খুব কম। ছেলেমানুষ, হৈ-চৈ ভালবাসে। ওখানে সারা দিনরাত্তির পাখি, ঝিঁ ঝিঁ, জোনাকী, গাছগাছালি, নদী, আকাশ, আর নির্জনতা। ওর পোষাবে কেন বলুন ?

সুমিতা বলল, দেখাবেন আমাকে আপনার ঐ রাজ্যটা ?

সত্যি যাবেন আপনি ?

তাহলে কি মিথ্যে করে বলছি ?

সরল বলল, আমার নিয়ে যেতে আপত্তি কি। আপনার অসুবিধে না হয়।

সুমিতা বলল, কিছু অসুবিধে হবে না। ওসব জায়গার কথা শুধু বইতে পড়েছি আর স্বপ্নে দেখে এসেছি এতদিন। হ্যাঁ শুনুন, এ মাসের মাঝামাঝি তো গরমের ছুটি পড়ছে। ছুটির শুরুতেই ক'দিন গিয়ে কাটিয়ে আসা যাবে।

পরের দিন কলেজ থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করতে বসেছে সুমিতা, হঠাৎ কোয়ার্টারের সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে সুমিতা দেখল ড্রাইভার জীপ থেকে নেমে তারই কম্পাউণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুমিতা বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটি মাথা একটুখানি নীচু করে সেলাম করল। গায়ের পোশাক দেখে সরকারী লোক বলেই মনে হল সুমিতার। একটা খাম সুমিতার হাতে ধরিয়ে দিল লোকটি। সুমিতা ঘরে গিয়ে খামখানা খুলল।

নীচের নামটা দেখে নিল প্রথমে। সুপ্রকাশ।

সুপ্রকাশ তাকে চিঠি লিখেছে! সেই ইউনিভার্সিটির পর আর যোগাযোগ নেই তার সঙ্গে। ওরা প্রেসিডেন্সীতে সতীর্থ ছিল। তারপর ইউনিভার্সিটিতে সুমিতার ছিল বাংলা আর ওর ইংরাজী। ছেলে হিসেবে খুবই ব্রাইট ছিল সুপ্রকাশ। ওর সঙ্গে মোটামুটি যোগাযোগটা ছিল ইউনিভার্সিটিতে। তারপর ছাড়াছাড়ি। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গানের ফাংশানের শেষে সুপ্রকাশ গ্রীনরুমে এসে খুব তারিফ করে যেত সুমিতার। কখনো বা কারো হাতে স্লিপ পাঠিয়ে ফরমাশ করত গানের। সুমিতা শুনেছিল, সুপ্রকাশ নাকি এম. এ-র রেজাল্ট বেরোবার পর কম্পিটিটিভ এগজামিনেশানের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

সুপ্রকাশের চিঠিতে দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল সুমিতা। দারুণ মজার ছেলে ছিল সুপ্রকাশ। বান্ধবীদের নাম ধরে ডাকার আগে একটা 'সখি', আর বন্ধুদের নামের আগে বসাত একটা 'সখা'।

চিঠিতে লিখেছে,

সখি সুমিতা, দেখ তোমাকে এই নির্জন বালিয়াড়ির দেশে কেমন আবিষ্কার করে ফেললাম। কথাটি না বলে জীপ চেপে চলে এস চটপট। বায়নাক্কা করলে কিন্তু পাকড়ে আনব। আপাতত আমি সাবডিভিসনাল অফিসার। সুতরাং বুঝতেই পারছ তোমাকে পাকড়াতে আমার বেগ পেতে হবে না।

তোমার প্রাণের বন্ধু সুপ্রকাশ।

সুমিতা একটা চিঠি লিখল।

প্রিয় সুপ্রকাশ,

কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় যদি ডাক দিতে তাহলে এক কাপড়েই বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন তুমি এস. ডি. ও. সাহেব, তাই একটু

সেজেগুজে না গেলে কি মানায় ? আমি তোমার ডেরাটা বাইরে থেকে দেখেছি। একাই যাচ্ছি একটু পরে, ভুল হবে না। আর তাছাড়া সন্ধ্যাই তো অভিসারের উপযুক্ত সময়।

তোমার সখি সুমিতা।

চিঠিখানা খামে ভরে ড্রাইভারের হাতে দিবে এস. ডি. ও. সাহেবের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে বলল।

আধঘণ্টার ভেতরেই টিফিন সেরে কাপড় পাল্টে নিল সুমিতা। আকস্মিক বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সী-গ্রীন রঙের জাপানী ফোল্ডিং ছাতাটা হাতে নিয়ে নিল। নতুন একখণ্ড গীতবিতান ছিল। তার ওপর লিখল 'বন্ধু সুপ্রকাশের শুভ পরিণয়ে—সুমিতা'।

গীতবিতান খানা ব্যাগে ভরে নিয়ে রাস্তায় দু'চার পা এগিয়েছে, সামনে গর্জন করে এসে দাঁড়াল সেই জীপ।

ড্রাইভার নেমে এসে সেলাম করে বলল, সাহেব গুসসা করছেন। আপনি জীপে উঠে আসুন মেমসাব।

সুমিতা জীপে উঠতেই জীপ ক্যানেলের ব্রীজ পেরিয়ে টাউনের ভেতর ঢুকল। তখনও দোকানে দোকানে আলো জ্বলে ওঠেনি। সূর্যটা পশ্চিমের বনঝাউ আর বালিয়াড়ির ওপরের আকাশটাকে রাঙা করে দিয়ে ডুব দিল। সুমিতা তাকিয়ে ছিল সেই দিকে।

জীপটা এবার নীচে নামছে। সুমিতা চোখ ফেরাল। ঐ তো পার্ক, পাশেই লোক, আর তার পূর্বদিকেই বিরাট বিরাট ক'টি ঝাউগাছের তলায় মহকুমা শাসকের বাগানওয়ালা বাংলো। তার সামনেই ধু-ধু মাঠ। মাঠের শেষে একখানা বড়সড় গ্রাম, তার ঠিক পরেই সমুদ্রের এলাকা।

বাগানের ভেতর সাদা ক'খানা বেতের চেয়ার পাতা। পিঙ্ক রঙের গদী আঁটা। সবুজ লন। ছোট ছোট বেডে জিনিয়া, সানফ্লাওয়ার, রজনীগন্ধা আর বেলফুলের সমারোহ।

জীপটা লনের ভেতর ঢুকতেই এগিয়ে এল সুপ্রকাশ, বলল, এস এস।

ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারল না।

সুমিতা একমুখ হাসি ছড়িয়ে নেমে এল। জীপের ড্রাইভার ঘণ্টা তিনেক পরে আসার নির্দেশ পেয়ে জীপটা লনের একপাশে রেখে তার কোয়ার্টারে চলে গেল।

সুপ্রকাশ সুমিতার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তুমি দেখতে দারুণ সুন্দর হয়েছ!

সুমিতা বলল, আমি তো তোমাকে দেখে চোখ ফেরাতেই পারছি না। ভাবছি, এই কি আমাদের সেই সুপ্রকাশ!

সুপ্রকাশ অমনি বলল, রোগা, পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত, তাম্রবর্ণ।

সুমিতা বলল, মোটেই তুমি কখনো তাম্রবর্ণ ছিলে না। রোগা ছিলে ঠিক।

কিন্তু চোখে পড়ার মত নিশ্চয়ই নয়।

একটু থেমে সুমিতা বলল, হার হাইনেস কোথায়! অরুন্ধতী?

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অরুন্ধতীর সঙ্গে সুপ্রকাশের প্রায় বাগ্দান হয়ে গিয়েছিল, তাই কথাটা তুলল সুমিতা সোজাসুজি।

সুপ্রকাশ বলল, অরুন্ধতী এখন ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে।

সুমিতা বলল, তার মানে?

সুপ্রকাশ বলল, মানে খুব সোজা। আমাদের সময়ে সংস্কৃতে যে ছেলেটি ফার্স্ট হল, কি করে যেন তার সঙ্গে অরুন্ধতীর আলাপ হয়ে গেল। তারপর প্রণয়, পরিণয়। এখন পণ্ডিত মশায়ের ঘরণী।

সুমিতা বলল, স্বাতী, পরমা, অর্পিতা, কেউ আসেনি তোমার ঘরে?

সুপ্রকাশ বলল, এরা কারা? এরা তো কেউ আমাদের সঙ্গে পড়ত বলে মনে হচ্ছে না?

সুমিতা বলল, তুমি কি করে আই. এ. এস. হলে তাই ভাবছি।

সুপ্রকাশ বলল, বুঝেছি, তুমি জানতে চাইছ আমি সঙ্গিনী ঘরে এনেছি কিনা।

সুমিতা হেসে বলল, এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?

সুপ্রকাশ বলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হবে না, বসা যাক, এসো। বুঝতেই পারছ, বউ থাকলে সে-ই বসাত, নইলে ভাগাত।

সুমিতা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, অমন বউ নাইবা আনলে, যে তোমার বান্ধবীদের সইতে পারে না।

সুপ্রকাশ বলল, বাহাদুরী কোর না, তুমিও পারতে না।

সুমিতা একটু ভেবে বলল, আমি আমার কথা উইথড্র করছি। বাইরে ভদ্র আচরণ করলেও মনে হয় কোন মেয়েই মনের থেকে স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকাদের সইতে পারে না।

সুপ্রকাশ অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, এখন বল তো তোমাকে এখানে আবিষ্কার করলাম কি করে?

সুমিতা বলল, আমি তো অবাক তোমার চিরকুট পেয়ে। তুমি এখানে এসেছ ভাবতেই পারিনি। সেই ইউনিভার্সিটি থেকে ছাড়াছাড়ি।

সুপ্রকাশ বলল, এসেছি অল্পদিন। আসার পরেই দেখি পদাধিকার বলে অনেকগুলো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের এডভাইসার, প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসে আছি। সেই সূত্রে তোমাদের কলেজের গভর্নিং বডিরও উপদেষ্টা। প্রসপেকটাস একখানা হাতে পেলাম। তাতে দেখলাম তোমার নাম। সুমিতা বিশ্বাস বাংলা বিভাগ। বুঝলাম, সখি সুমিতা আর সুপ্রকাশ একই ঘাটে এসে তরী ভিড়িয়েছে।

সুমিতা বলল, ঘাটটা অচেনা, বন্দরটারও খুব একটা নাম-ডাক নেই। তবে তুমি তো দুদিনের পাখি, আজ আছ এ বাগিচায়, কাল বাদশার উদ্যানে। আমাকে হয়তো এ ঘাটেই সারা জীবন তরী বাইতে হবে।

সুপ্রকাশ বলিল, পাখি ঠিক, তবে যেন বাগিচার নয়, একেবারে পিঞ্জরের। দানাপানির ব্যবস্থাটা ভালই, তবে খুশিমত নীলাকাশে পাখা মেলার উপায় নেই।

সুমিতা এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, বউ নেই বলে কি চায়ের পাটও তুলে দিয়েছ নাকি ?

সুপ্রকাশ বলল, ডিম আর চা, কফি, ফ্রুট্স্ মজুত আছে স্টোরে, কেবল সন্দেশটা আনতে পাঠিয়েছি মার্কেটে। বেয়ারা এল বলে। আমিও চাতকের মত চেয়ে আছি। অফিস থেকে ফিরে এসে চা-পান হয় নি।

সুমিতা বলল, এই ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে তোমার এ জায়গাটা ওয়েসিস সুপ্রকাশ। ভারী ভাল লাগছে।

সুপ্রকাশ বলল, রাতে আমি জানালা খুলে শুয়ে থাকি। ঝাউ আর সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়।

সুমিতা হঠাৎ বলে উঠল, একদিন তুমি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলে মনে আছে ?

সুপ্রকাশ বলল, পি. কে. ডি-র ক্লাস ছিল না ? কি দারুণ রেগে গিয়েছিলেন স্যার।

সুমিতা বলল, রেগে গিয়ে তোমাকে সেদিনের টপিকসগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আর তুমি প্রায় একটুও না ভেবে সেগুলোর জবাব দিয়ে গেলে। সারা ক্লাস তো অবাক ! স্যার তো থ বনে গেছেন। বললেন, তুমি ঘুমুচ্ছিলে না ?

তুমি অমনি বললে, আমি চোখ বন্ধ করে শুনছিলাম স্যার ! স্যার চলে গেলে তুমি বলেছিলে, বক্তৃতা এমন চার্মিং হয়েছিল যে আমি না ঘুমিয়ে পারি নি।

হেসে বলেছিলাম, তবে উত্তরগুলো জানলে কি করে ?

বলেছিলে, স্বপ্নে। মনে আছে ?

সুপ্রকাশ বলল, সব মনে আছে। তার আগের সপ্তাহে উনি কি টপিকস্ পড়াবেন ক্লাসে বলেছিলেন। আমি সেদিন কেন জানি না ঐ টপিকগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে এসেছিলাম। তাই ফটাফট উত্তরগুলি বলে ফেলতে পেরেছিলাম।

সুমিতা হাসতে হাসতে বলল, কলেজে সেদিন একটা কাণ্ড হয়েছিল সত্যি। তোমাকে আসল রহস্যটা জিজ্ঞেস করেও সেদিন কেউ জানতে পারে নি। খালি রসিকতাই করে গিয়েছিলে। আজ ব্যাপারটা জানলাম।

বেয়ারা কোয়ার্টারের পেছন দিয়ে এদের গল্পের ফাঁকে কখন ঢুকে গিয়েছিল। ওরা দেখলে, ট্রেতে বৈকালিক জলযোগ সাজিয়ে ওদের সামনে এনে রাখল।

সুমিতা বলল, তুমি কাজে যাও, আমি চা ঢেলে নেব।

বেয়ারা চলে গেলে সুমিতা খাবারের প্লেটটা সুপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে

বলল, নাও, গেস্টই হোস্টকে না হয় পরিবেশন করল।

সুপ্রকাশ প্লেটটা হাতে ধরে নিয়ে বলল, তুমি যে আমার গেস্ট এ কথা আমি কিন্তু একবারও ভাবতে পারছি না। তুমি আমার বন্ধু সুমিতা।

সুমিতা বলল, বন্ধুই তো। বললাম বলেই কি গেস্ট হয়ে গেলাম। দায় পড়ে গেছে তোমার গেস্ট হতে।

সুমিতা চায়ের প্লেটে একটা অমলেট আর সন্দেশ তুলে নিয়ে খাবারের প্লেটটা সরিয়ে রাখল।

সুপ্রকাশ বলল, কি হল, ওসব সরিয়ে রাখলে কার জন্যে ?

সুমিতা একটুকরো অমলেট মুখে তুলে বলল, তোমার বউয়ের জন্যে।

সুপ্রকাশ বলল, তাহলে সখি ওটা তো তোমাকেই খেতে হয়।

সুমিতা বলল, মাস্টার মানুষ, কখন মেরে বসব কিন্তু আজে বাজে কথা বললে।

সুপ্রকাশ বলল, 'আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে'।

সুমিতা বলল, অত সহজে বোঝা যায় না মশাই। 'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন'।

সুপ্রকাশ বলল, কি অকরুণ এই নারী সম্প্রদায়। পঞ্চাশ বছর গড় পরমায়ু হলে সহস্রবর্ষের জন্যে অন্তত বিশবার জন্মাতে হবে।

সুমিতা বলল, হবেই তো।

তারপর কি যেন মনে পড়ে যেতেই সুমিতা প্লেটটা ট্রেতে রেখে দিয়ে বলল, মনে আছে সুপ্রকাশ আমাদের 'রাজা ও রাণী' নাটকটা পড়াতেন এ. কে. জি.। উনি যখন আমাদের দিকে চেয়ে বলতেন, 'আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে,' তখন বাসবী ওঁর দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বলত, পারলে তো এতদিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত।

সুপ্রকাশ হা হা করে হেসে উঠে বলল, এ. কে. জি. তো ব্যাচিলার ছিলেন, তাই না ? দারুণ মজার মেয়ে ছিল কিন্তু বাসবী।

সুমিতা বলল, শোনই না, ও তো ইন্দ্রকে ভালবাসত। এদিকে প্রভাংশু একদিন না জেনে ওকে প্রেমপত্র দিয়ে বসল। বাসবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা দিয়ে দিল।

বৃথা আশা ত্যাগ কর সখা
আমি শচী ইন্দ্রের রমণী।

সেই নিয়ে আমরা কতদিন হাসাহাসি করলাম। প্রভাংশু বেচারা মনমরা হয়ে রইল।

সুপ্রকাশ বলল, সাধারণত মেয়েরা নিষ্ঠুর। নইলে প্রভাংশুর মত গোবেচারা একটা ছেলেকে নিয়ে এমন হাসাহাসি করে।

সুমিতা বলল, বিগলিত আলু মার্কা বোকারাম হেলেগুলো চিরদিনই মেয়েদের দুচোখের বিষ।

ওরা গল্পের জাল বুনে চলল। আকাশে একটি একটি করে নক্ষত্রের দীপ

ফুটে উঠল। দক্ষিণ সাগর থেকে বয়ে এল সন্ধ্যার হাওয়া। সারাদিনের প্রচণ্ড গরমের শেষে এ যেন বিধাতার দাক্ষিণ্য।

সুমিতা তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে ফিরতে চেয়েছিল, সুপ্রকাশ বলল, অত তাড়া কিসের ? কার জন্যে প্রেমপত্র লেখার সময় পার হয়ে যাচ্ছে তোমার ?

হতেও তো পারে সে কোন এক সুদর্শন আই. এ. এস. বন্ধু।

সুপ্রকাশ বলল, হুঁ, পাশে বসে যে হাতে হাত রাখতে পেল না, সে পাবে তোমার প্রেমপত্র।

সুমিতা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এ হাতখানা কারু ধরার মত নয়। খাতায় নম্বর দিতে দিতে হাতটা নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।

সুপ্রকাশের হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। সে বলে উঠল, শোন, একমাত্র মহিলা হিসেবে অধ্যাপকদের দুটো গভর্নিং বডির আসনে তোমার প্রবেশের ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছি। ছাত্রীসংখ্যা প্রচুর, তাই বলে দিয়েছি, একজন অধ্যাপিকার গভর্নিং বডিতে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সুমিতা বলল, কৃতার্থ করেছ, যে সব জ্বালায় আমি কোন দিনই জড়াতে চাই না, তাতেই তুমি আমাকে জড়িয়ে দিলে।

সুপ্রকাশ বলল, দুজনে একসঙ্গেই না হয় সমস্যাগুলোর ভেতর জড়িয়ে পড়লাম।

সুমিতা বলল, কলেজের কাজে জড়িয়েছ, বেশ করেছ, কিন্তু আর কিছুতে দয়া করে যেন জড়াতে যেও না।

সুপ্রকাশ বলল, তোমার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছুতে তোমাকে জড়ায় সাধ্য কার।

সুমিতাকে কিন্তু সেদিন কিছুতেই সুপ্রকাশ ছেড়ে দিল না। ডিনার একসঙ্গে খেয়ে তবে ছাড়ল।

আসার সময় এক ফাঁকে সুপ্রকাশের বেডরুমে নতুন গীতবিতানখানা ব্যাগ থেকে বের করে রেখে এল সুমিতা।

সুপ্রকাশ সুমিতাকে বিদায় দিতে গিয়ে বলল, একদিন কিন্তু তোমার কোয়ার্টারে যাব গান শুনতে, কি ভালই না তুমি গাইতে কলেজে।

সুমিতা বলল, তাহলে আর দেখতে হবে না। টাউনের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়বেঃ নতুন নাটক—প্রজাপতি জীবন। শ্রেষ্ঠাংশে—মহানায়ক প্রকাশকুমার; মহানায়িকা মিতাকুমারী।

সুপ্রকাশ বলল, তাহলে আমার এখানে হবে। নানা কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুরুষ মহিলারা এখানে এসে থাকেন। কারু কিছু মাইণ্ড করবার নেই।

সুমিতা বলল, আসব, তবে নিশ্চয় ঘন ঘন নয়। আর শোন, একখানা গীতবিতান যোগাড় করে রেখো।

সুপ্রকাশ বলল, চেষ্টা করে দেখব।

সুমিতা বলল, এই তো, বিয়ে করলে নিশ্চিত কেউ না কেউ একটা

প্রেজেণ্ট করত।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, কেউ করুক আর না করুক, সুমিতা সখির কাছ থেকে অন্তত একখানা পাওয়া যেত।

সুমিতা জীপে উঠে চলে গেল। আবার ওদের দেখা হল ছুটির আগের একটি মিটিং-এ। ইতিমধ্যে বিশেষ জরুরী কাজে সুপ্রকাশকে চলে যেতে হয়েছিল কলকাতা। ফিরে আসার পর এই প্রথম গভর্নিং বডির মিটিং।

মিটিং-এর এজেণ্ডা ছিল, আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

এ-সভায় স্বাভাবিক ভাবেই সভার কাজ পরিচালনার ভার পড়ল মাননীয় এস. ডি. ও. সাহেবের ওপর।

নতুন মেম্বার হিসেবে সুমিতার প্রথম উপস্থিতি।

কদিন সরল সামন্তও আসেনি সুমিতার কোয়ার্টারে। কাজরীর সঙ্গে কলেজে যা দেখা। টুকরো টুকরো দু'একটা কথা। হারমোনিয়াম কলকাতার কোথায় যেন সারাতে দেওয়া হয়েছে। এলেই সুমিতা যাবে কাজরীদের ওখানে গান শেখাতে।

মিটিং-এ দেখা হল সরল আর সুপ্রকাশের সঙ্গে সুমিতার। চোখাচোখি হল দুজনেরই সঙ্গে। কলেজের প্রেসিডেণ্ট, সুমিতা নতুন মেম্বার বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুপ্রকাশ বলল, উনি আমার পূর্ব পরিচিত। ইউনিভার্সিটিতে এক বিষয়ে না হলেও প্রায় একই সময়ের ছাত্র ছিলাম।

আর কিছু বলল না সুপ্রকাশ। সুমিতা সামান্য হেসে মাথা নাড়ল। সকলের চোখে মুখে ঔৎসুক্য, আর সুমিতার প্রতি সম্ভ্রম। সুমিতা দেখল সরল সামন্ত স্থির শান্ত চোখ মেলে বসে আছে। মুখে চিরদিনের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রসন্নতার ছবি।

কিছুক্ষণের ভেতরেই আলোচনাটা জমে উঠল।

প্রিন্সিপাল পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। কলেজ প্রেসিডেণ্ট ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে উদাহরণসহ কটু মন্তব্য করলেন। সেক্রেটারী বললেন, যে করেই হোক পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষা করতেই হবে। আর সে জন্যে আমাদের মহকুমা শাসক মহোদয়ের উপদেশ ও সাহায্য প্রয়োজন।

এস. ডি. ও. সাহেব বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রতিদিন আমি যথেষ্ট পুলিস মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করব। বাইরে ভেতরে ইনভিজি-লেটরদের কাছে কাছে থাকবে পুলিস। এদিক ওদিক তাকান কিংবা ফিস্ ফিস্ আওয়াজ, সবই বন্ধ করে দেব পুলিস দিয়ে। আমি নিজেও আসার চেষ্টা করব মাঝে মাঝে।

সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন, এস. ডি. ও. সাহেবের এ ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসে।

মুখ খুলল সরল সামন্ত। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে উঠল সুমিতা। ব্যাজার মুখে সবাই তাকাল সরল সামন্তের দিকে।

সরল বলল, কিছু মনে করবেন না এস. ডি. ও. সাহেব, আমি মুর্খ মানুষ, সোজাসুজি যা বুঝি তাই বলে ফেলি।

সুপ্রকাশ বলল, আলোচনায় সকলেরই অংশগ্রহণের অধিকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই মতামত জানাতে পারেন।

সরল বলল, আপনাদের মতামত শুনে মনে হচ্ছে আপনারা মস্ত বড় 'ছেলেধরার' একটা দল তৈরী করতে যাচ্ছেন।

ক্ষেপে গিয়ে কলেজ প্রেসিডেণ্ট বললেন, আজেবাজে কথা বলবেন না মিঃ সামন্ত।

সরল অনুত্তেজিত গলায় বলল, পরীক্ষা অনেক আগেই প্রহসন হয়ে গেছে। সেই প্রহসনটা যাতে জমজমাট হয়ে ওঠে সেজন্যে আপনারা উঠে পড়ে লেগেছেন।

সম্পাদক মুখ বিকৃত করে বললেন, কি রকম?

সরল বলল, যদি ছেলেরা টোকাটুকি করে তাহলে সেটা অধ্যাপকদের দোষ। তাঁরা ভাল করে পড়িয়ে কোর্সগুলো ফিনিস করে দেননি যথাসময়ে। কিন্তু আমি বলব, তাঁদের দোষ যতখানি তার চেয়ে বেশী দোষ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। পরীক্ষার ফল বেরিয়ে নতুন ক্লাশে ঢুকতে না ঢুকতেই আবার পরীক্ষায় বসার নির্দেশনামা। বলুন আপনারা একথা সত্য কিনা? প্রি-ইউনিভারসিটি কিংবা থার্ড ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা কলেজে পড়ার কতটুকু সময় পায়?

সুমিতা হঠাৎ বলল, আমি মিঃ সামন্তের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

সকলে একটু চমকে উঠল।

সরল বলল, কয়েক বছর আগে যে সব ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার হার উল্লেখ-যোগ্য ছিল, তারা হঠাৎ দু'এক বছরের মধ্যে পাইকারী হারে নির্বোধ হয়ে গেল কি করে বলতে পারেন? একটি ছাত্রকে চার পাঁচবার ফেল করিয়ে তার কাছ থেকে বারে বারে সাইলকের মত টাকা শুষে নিতে লজ্জা করে না বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। যদি দেউলিয়া হয়ে গিয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে দরজা বন্ধ করে দিক। অর্থ উপায়ের জন্যে এ ছাত্রমেধ যজ্ঞ কেন? কোন একজন শিক্ষিত দরদী মানুষ কি দেশে নেই যিনি তাঁর বিশাল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলতে পারেন, দেশব্যাপী শিক্ষার এ প্রহসন বন্ধ হোক।

সুপ্রকাশ বলল, আপনি পরীক্ষাটা কিভাবে নেওয়ার কথা ভাবেন।

সরল বলল, আমি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, ক্ষমা করবেন। আমার মতে এ ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। তবে শিক্ষার মহারথীরা সে কাজ করবেন, এখন এ ধরনের আলোচনা নিরর্থক। আমার শুধু আবেদন, এস. ডি. ও. সাহেব পুলিস নিয়ে আসুন, কিন্তু তারা কলেজের বাইরে থাকবে। পার্টিবাজ সাহায্যকারীদের হিম্মৎ থাকলে পিটিয়ে

শায়েস্তা করুক। কিন্তু কলেজের ভেতর পুলিস ঢোকাবেন না। অধ্যাপকদের ছাত্রছাত্রীরা এখনও যেটুকু সমীহ করে তা অবশিষ্ট থাকবে না এর পর। বাইরের এলিমেণ্ট ভেতরে না আসতে পারলে অধ্যাপকরাই ছাত্রছাত্রীদের সামলাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সুপ্রকাশ অধ্যাপক সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের মতামত এ বিষয়ে জানতে পারলে ভাল হয়।

একজন বললেন, স্কুলে বেত উঠে গিয়েই বিপর্যয় ঘটেছে। ঘরে বাইরে কিছুদিন ধরে শায়েস্তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের বাগে আনা সম্ভব নয়।

সুপ্রকাশ সুমিতার দিকে তাকাল।

সুমিতা বলল, আমি আপনাদের কথা দিতে পারি, মেয়েদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তুত। এতগুলি মেয়ে যাতে পরীক্ষার হলে টোকাটুকি না করে সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখব। মাননীয় প্রিন্সিপাল রাউণ্ড দেবার সময় আশা করি কলেজের মেয়েদের শৃঙ্খলা মেনে পরীক্ষা দিতেই দেখবেন।

সুপ্রকাশ বলল, বেশ, পুলিস ব্যবস্থা বাইরের জন্যেই থাকবে, দরকার হলে প্রিন্সিপাল ডেকে নেবেন ভেতরে।

মিটিং ভাঙার পর সরল সোজা বাড়িমুখো পা চালিয়ে চলে গেল।

কলেজ প্রেসিডেণ্ট এস. ডি. ও. সাহেব ও অন্যান্যদের জন্যে একটুখানি চা-চক্রের ব্যবস্থা করলেন।

কথায় কথায় প্রেসিডেণ্ট বললেন, প্রতি কাজে আমাদের ঐ মেম্বার ভদ্র-লোকটির বাধা দেওয়া চাই! এস. ডি. ও. সাহেব আমাদের যে ভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তাতে পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

সুপ্রকাশ বলল, চারদিকে যেরকম পরিস্থিতি চলেছে তাতে কড়া হাতে সবকিছু দমন না করে উপায় নেই।

প্রিন্সিপাল বললেন, বই টুকে, শিক্ষক ঠেঙিয়ে পাস করছে বলেই আজকাল স্কুল কলেজ অফিস আদালতে বিচিত্র সব প্রোডাকসানগুলিকে দেখা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘরে বাইরে দিন স্যার পুলিসে পুলিসে ছেয়ে। পরীক্ষার হলে ঢুকতে গেলেই ভয়ে পিলে চমকে যাবে।

সুমিতা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তাহলে আর পরীক্ষা নেবার দরকারই হবে না। ভয়ে হল ছেড়ে পালাবে সবাই।

সেক্রেটারী চুপ করে গেলেন। এই মুহূর্তে ধমকে দিতেন বাচাল মেয়েটাকে, কিন্তু এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে নাকি পূর্ব পরিচয় আছে। যাক্ গে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এদিকে আবার ছাত্রছাত্রীদের কাছে শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই পপুলার হয়ে উঠেছে।

সুপ্রকাশ চা খাওয়া হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যে রিজলিউশান নেওয়া হল সেই মতই কাজ হোক। মনে হয় ওতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ঠিক সন্ধ্যায় আবার জীপ আর চিরকুট এল সুপ্রকাশের কাছ থেকে। লিখেছে ঃ গভর্নিং বডির এক স্পষ্টভাষী সদস্যাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে মহকুমার অন্যতম সেবক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

সুমিতা গাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

সুপ্রকাশ বলল, গভর্নিং বডিতে তুমি যে মূত সৈনিকের ভূমিকা নাওনি সেজন্যে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুমিতা বলল, দাঁড়াও, এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি চাকরীর। কনফারমেশান না হওয়া অব্দি ওদের বিশ্বাস নেই।

সুপ্রকাশ বলল, মাস ছয়েকের ভেতরে নিশ্চয় মহামান্য সরকার বাল্মিকীর সেই বিখ্যাত ব্যাধের ভূমিকা নিয়ে আমাকে আমার প্রিয়তম সখীর উত্তপ্ত সান্নিধ্য থেকে নিষ্ঠুরের মত বিচ্ছিন্ন করে দেবে না। আর তোমার কনফারমেশানের কাল পর্যন্ত টিঁকে যেতে পারলে তোমাকে ঠেকায় কে।

সুমিতা বলল, তোমার উত্তপ্ত সান্নিধ্যে আছি জানতে পারলে কালই স্পেশাল মিটিং ডেকে ওরা আমার চাকরী কনফার্ম করে দেবে।

সুপ্রকাশ বলল, পুরুত ডাকব?

সুমিতা বলল, আই. এ. এস. হয়েও কি কানমলা খাবার সাধ মেটেনি?

বেয়ারা খাবার আর চা দিয়ে গেল।

সুপ্রকাশ বলল, আজ কিন্তু গান শোনাতে হবে।

সুমিতা বলল, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

আমার কথার এই উত্তর হল!

সুমিতা বলল, বাব্বা গান শোনাব, শোনাব, শোনাব। কিন্তু খাব না তোমার এখানে।

সুপ্রকাশ বলল, কি রাজভোগ রেঁধে রেখে এসেছ?

সুমিতা বলল, রাজা থাকলে তো রাজভোগ তৈরী করব।

সুপ্রকাশ সুমিতার হাতটা টেনে নিয়ে রেখা বিচারের অভিনয় করে বলল, সত্যি সুমিতা, তোমার হাতে রাজরাণী হবার যোগ দেখছি না তো!

সুমিতা বলল, আমি তো রাজার বউ হবার জন্যে ভাবনায় মরে যাচ্ছি। বরং বাঁচলাম।

সুপ্রকাশ বলল, আচ্ছা সুমিতার সঙ্গে সুপ্রকাশের মিলটা কি একেবারেই অসম্ভব। আগুন জেবলে কয়েকটা পাক কি কিছুতেই ওরা ঘুরে নিতে পারবে না?

সুমিতা বলল, প্রথম থেকেই চলনটা আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এত ইয়ার্কি মেরেছি সেই কলেজ লাইফ থেকে যে এখন বোকা বোকা ভাব করে নীরবে চোখে চোখে চেয়ে থাকতে গেলেই কেমন হাসি পেয়ে যাবে।

সুপ্রকাশ বলল, তাহলে ওসব প্ল্যান এই মুহূর্ত থেকে নাকচ করে দিলাম সখী। এখন একটি মধুর গলার গান শোনাও তো দেখি।

সুমিতা বলল, গীতবিতান এনেছ ?

সুপ্রকাশ বলল, আমার বিয়ের এখনও যে সম্ভাবনা আছে একথা আর বন্ধু স্বীকার না করলেও একটি বান্ধবী কিন্তু স্বীকার করে। সে আগাম একখানা গীতবিতান আমার ভবিষ্যৎ পরিণয়ের কথা স্মরণ করে উপহার দিয়ে গেছে। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

সুপ্রকাশ গীতবিতান আনতে চলে গেল। সুমিতা ভাবল, কত সহজ সুন্দর মনটাকে এখনও বজায় রাখতে পেরেছে সুপ্রকাশ। কিছুদিন পরে ঝানু শাসক, স্রূড পলিটিসিয়ান হয়ে যাবে সুপ্রকাশ রায়। তখন তার ভেতর থেকে রসিক বন্ধুবৎসল সুপ্রকাশকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে !

ছুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খালি হয়ে গেল হোস্টেল আর প্রফেসার্স-কোয়ার্টারগুলো। যাঁরা ইনভিজিলেসান ডিউটি দেবেন তাঁরা আবার আসবেন মাসের শেষ সপ্তাহে। নির্জন কলেজ কম্পাউন্ডে শুধু থেকে গেল সুমিতা। সে কলকাতা গিয়ে এই অল্পসময়ের ভেতর আর ফিরে আসতে পারবে না। তাছাড়া সরল আর কাজরীর সঙ্গে তার জঙ্গলমহালে কদিনের জন্যে বেড়াতে যাবার কথা।

একদিকে জঙ্গলমহালে যাবার যখন প্রায় সব ঠিকঠাক, তখনই এল একটা দুঃসংবাদ ! কে একজন উড়ো চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সরল সামন্তের ঘর-পাহারাদার মাঝি নদীর চড়ায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার সোমত্ত বউটা নিখোঁজ। চিঠিখানা কেউ ফেলে রেখে গেছে লাইব্রেরী ঘরের জানালা গলিয়ে ভেতরে।

সরল সামন্ত খবর পেয়েই যাবার জন্যে তৈরী। কাজরী ছুটে এল সুমিতার কাছে। দাদা একা যাবে, নির্ঘাৎ একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যাবে।

সুমিতা বলল, চল আমরাও সঙ্গে যাই। একা কখনো তোমার দাদাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

সরল সামন্তের মুখোমুখি হল সুমিতা। বলল, আপনার একা যাওয়া চলবে না।

সরল বলল, তার মানে ?

আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

নিশ্চয়ই যাবেন, কিন্তু এ যাত্রায় নয়। আমি দু'চারদিন অবস্থাটা বুঝে আসি তারপর যাবেন।

উদ্‌ভ্রান্ত সরল সামন্তের দিকে তাকিয়ে সুমিতা বলল, আপনি এখন বিপদের মাঝে যাবেন আর আমরা পরে বেড়াতে যাব, অসম্ভব। আপনাকে একা কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

সুমিতার চোখে কি মেঘ ছিল ? গলার স্বরে কি বর্ষামেঘের আকুলতা ছিল ? সরল দ্বিতীয়বার না বলতে পারল না। শুধু বলল, বিপদের মুখে পড়ার জন্যে তৈরী থাকতে হবে কিন্তু।

সুমিতার চোখে মেঘ, মুখে হাসি। বলল, সব কিছু ঝুঁকি নিজের দায়িত্ব নেবার জন্যে তৈরী।

কাজরী সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরেছিল, কিন্তু ছেলেমানুষ বলে তাকে কিছুতেই সঙ্গে নিতে চাইল না সরল। বলল, একে তোমার বায়নাদার দিদিটিকে নিয়ে যাবার ঝুঁকি, তার ওপর তুমি গেলে আর দেখতেই হবে না।

কাজরী বলল, বেশ, কথা দাও, তোমরা চার পাঁচ দিনের ভেতরেই ফিরে আসবে।

সরল বলল, বেড়াতে তো যাচ্ছি না, ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটা ঘটল, সে সম্বন্ধে একটা খোঁজ নিয়ে আসতে হবে! বেশীদিন তো লাগার কথা নয়। তুই ভাবিস নে, আমি খুব তাড়াতাড়ি পোঁছে যাব।

নৌকোতে বসে কথা হচ্ছিল।

সুমিতা বলল, আপনার ধারণা কি? মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই কি কেউ লোকটাকে মেরেছে?

সরল বলল, ব্যাপারটা যে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে আমার মনে হয় এ ষড়যন্ত্রে মেয়েটার হাত না থাকলেও কিছু সম্মতি ছিল।

সুমিতা বলল, কি করে বুঝলেন?

সরল বলল, মেয়েটাকে বিয়ে করে আনার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, লোকটা কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে। বড় একটা নদীতে নৌকো নিয়ে যায় না। গঞ্জের বাজারে হপ্তায় দুবার খেয়া পারাপার করত ঐ মাঝি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি বিয়ের পর সে নিয়মিত কাজ করে না। তাছাড়া বাজারে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেলেও হঠাৎ অসময়ে ফিরে আসে।

এতে আপনি মেয়েটি সম্বন্ধে কি ধারণা করেছিলেন?

সরল বলল, মেয়েটি চঞ্চল। কথাবার্তা গ্রাম্য মেয়ের মত নয়। ওর হয়ত কোন পূর্ব প্রণয় থাকতে পারে। আর সেইটিই কথাবার্তায় চালচলনে আঁচ করেছিল তার স্বামী। তাই সে মনমরা হয়ে থাকত।

সুমিতা বলল, আপনি এতও অবজার্ভ করতে পারেন।

সরল বলল, মেয়েটিকে আমি একদিন একটি লোকের সঙ্গে সন্দেহজনক ভাবে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে দেখেছিলাম। তার থেকেই আমার এ ধারণাটা দৃঢ় হয়েছে। লোকটা আবার জঙ্গলমহালের ওপারের ঘুঘু জমিদার···জমিদার তনয়টি লম্পট চূড়ামণি।

সুমিতা বলল, আপনি ওদের কিছু বলেন নি?

সরল বলল, কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। যে কোন পুরুষ অথবা মহিলার ভালবাসার ব্যাপারে নিজের নিজের পছন্দ থাকতে পারে, সেখানে উপযাচক হয়ে আমি হাত দিতে যাব কেন?

সুমিতা বলল, এটা কি সত্যি, আপনি একসময় কলেজের একটি ছেলে-

আর মেয়েকে তাদের ভালবাসার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছিলেন ?

সরল বলল, ঘটনাটা যেখান থেকেই জানতে পারুন না কেন, কিছু রং চড়লেও একেবারে মিথ্যে নয়। ওরা পরস্পরকে ভালবেসেছিল। কলেজেই নোট বিনিময়ের নাম করে চিঠিপত্র লেন-দেন করত। আমি যখন ব্যাপারটা জানতে পারলাম তখন ওরা আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গভর্নিং বডির স্পেশাল বেঞ্চ বসেছে বিচারের জন্যে। আমি অন্যতম মেম্বার হিসেবে আমন্ত্রিত।

ওরা সোজাসুজি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গেল। ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হল যে যার হোস্টেলে।

ওরা চলে গেলে ডিসিসান নেবার পালা।

প্রেসিডেণ্ট বললেন, এখুনি দুটোকে দূর করে দেওয়া হোক হোস্টেল থেকে।

সেক্রেটারী বললেন, তাতে অসুবিধে আছে। কতকটা দায়িত্ব আমাদের। ওদের তাড়িয়ে দিলেই অভিভাবকেরা তেড়ে এসে আমাদের ওপরেই দোষ চাপাবে।

প্রিন্সিপাল সভাপতির মুখ চেয়ে বললেন, তাড়াতেই হয়, নইলে কলেজের শুচিতা নষ্ট হবে।

সুমিতা বলল, তাহলে তো দেখছি তাড়ানোর দিকেই পাল্লা ভারী।

সরল বলল, আরও দুজন ছিলেন আমাকে ছাড়া। দুই হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তাঁদের একজন লেডিজ হোস্টেলের চার্জে, বৃদ্ধ ভাইস প্রিন্সিপাল। অন্যজন ছেলেদের হোস্টেলের সুপার ইকনমিক্সের অধ্যাপক।

ভাইস প্রিন্সিপালের মত চাওয়া হলে তিনি বললেন, কোনদিন মেয়েটির আচরণে কোনরকম অন্যায় আমি দেখিনি। বরং পাঁচজনের ভেতর ওর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত।

প্রেসিডেণ্ট চেঁচিয়ে উঠলেন, ভুল হয়েছে আমাদের আপনাকে লেডিজ হোস্টেলের চার্জে রেখে। কে ভাল কে মন্দ সেটুকু চেনার ক্ষমতা আপনার নেই। ধূর্ত যারা তারাই ভাল সেজে আপনাদের মত লোকের চোখে ধুলো দেয়।

ছেলেদের হোস্টেলের সুপার বললেন, বিচ্ছু, একদম বিচ্ছু। ছেলেটা বদের আণ্ডিল। বহুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। এবার আপনাদের কাছে কথাটা তুলে তাড়াব বলেই ভেবেছিলাম।

হয়ে গেল। বিতাড়নের পক্ষেই পাল্লা ভারী।

সুমিতা বলল, আপনি কিছু বললেন না ?

সরল বলল, সবার সব বলা শেষ হয়ে গেলে এই মূর্খ মেম্বারটির দিকে সকলে একবার করুণার দৃষ্টি ফেললেন। ভাবটা এই, তুমি আবার কিছু বলবে নাকি হে ?

প্রেসিডেণ্ট মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, তাহলে কলেজ আর হোস্টেল থেকে তাড়ানই স্থির হল, কি বলেন মিঃ সামন্ত।

বললাম, ডিসিসানটা নিয়ে ফেলে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

সকলে তখন ভদ্রতার খাতিরে বলেন, আপনিও তো আমাদের একজন মেম্বার, আপনার মতামত দেবেন বইকি।

বললাম, আমার মত হল, ওরা এমন কিছু খারাপ কাজ করেনি।

যেন একটা বোমা পড়ল কাউন্সিল রুমে।

অধ্যাপকটি বললেন, অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি।

বললাম, আমি একটু সৃষ্টিছাড়া কথাই বলে থাকি প্রফেসার হালদার।

প্রিন্সিপাল একটু বিদ্রূপের সুরেই বললেন, ওটা ওঁর মত। সবাইকে যে ওঁর সঙ্গে একমত হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

বললাম, নিশ্চয়, প্রতিটি মানুষেরই বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক আছে, সুতরাং কথা বলতে গেলে যে যার নিজেদের বিচারের ওপর নির্ভর করেই বলবেন।

প্রেসিডেণ্ট বললেন, এখন আপনার মতামতটা একটু সংক্ষেপে বলুন।

বললাম, আমি আপনাদের মত বিদ্বান নই, মূর্খ মানুষ, তাই যেটা সামান্য কথায় আপনারা প্রকাশ করেন, আমার প্রকাশ করতে কিছু বেশী শব্দ স্বাভাবিক ভাবেই লাগবে।

ওরা চুপ করে আছেন দেখে ধমকের গলাতেই বললাম, দেখুন দেখি ছেলেটিকে একবার কলেজ থেকে তাড়িয়ে, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। মিঃ প্রেসিডেণ্ট, কথাটা অপ্রীতিকর শোনাবে, আপনি কি পেরেছেন আপনার ছেলেকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে ? আপনারা সকলেই জানেন ওর এগেন্সটে কটা এফ. আই. আর. থানাতে আছে। আমাদের মেয়েদের হোস্টেলে কাঁটা-তারের বেড়া দেবার মূলেও ঐ ছেলেটি। এস. পি-র কড়া ওয়ার্নিংয়ের ভেতর ও রয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট অপমানিত বোধ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। এ নিয়ে বিচার করার জন্যে সভা ডাকা হয়নি।

বললাম, ওটি যেমন আপনার ছেলে, এরাও আপনার ছেলেমেয়ে। বিচারকের আসনে বসে একই দোষের দু'রকম বিচার করবেন না।

প্রেসিডেণ্ট চুপ করে গেলেন। ভাবলেন, যদি এই দুর্মুখের মুখ দিয়ে আরও কিছু পারিবারিক স্ক্যাণ্ডেল বেরিয়ে যায়।

প্রিন্সিপাল লড়াই শেষ করলেন না। বললেন, আমি তো শাস্তি না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এত বড় ইন্সটিটিউশানের শুভাশুভের দায়িত্ব আমার।

বললাম, সন্দেহ কি। একসঙ্গে পড়াবেন আবার তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে বসে থাকবে। তাহলে চিত্ত সংযমের ক্লাশ খুলুন। যদি পাপই ওরা করে থাকে তাহলে আমি জীবনে একবার হলেও সে পাপ করেছি। কেউ প্রকাশ্যে কেউ মনে মনে। বুকে হাত দিয়ে বলুন, যৌবনে কোনদিন কোন মেয়ের কথা আপনারা কেউ ভাবেননি। যদি বলেন, না, তাহলে আমি বলব, তিনি দেবতা নয়তো মিথ্যেবাদী।

সবাই চুপ। সেক্রেটারি নরম গলায় বললেন, মিঃ সামন্ত, কি হলে সবদিক রক্ষা হয়, তাই দয়া করে বলুন।

বললাম, তাদের আলাদা আলাদা ডেকে একটু সাবধান করে দিন। যদিও কোনদিন এ সাবধানতার কোন মূল্যই নেই, তবু তারা বুঝুক কর্তৃপক্ষ সজাগ আছেন, নিতান্ত প্রথম অপরাধ বলে ক্ষমা করলেন।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে আমার কথাটা মেনে নিলেন।

সুমিতা বলল, আপনি বলে এমনি করে কথা বলতে পারলেন। আর সবাই তো প্রায় সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্টের মুখ চেয়ে কথা বলে।

সরল বলল, শেষ হয়নি ঘটনাটা। আমি সবার আড়ালে ওদের দুজনকে বাড়িতে ডেকে এনে বলেছিলাম, তোমরা ভালবাস পরস্পরকে, তাই তো?

ছেলেটা মাথা নীচু করলে আমি ছেলেটার মাথায় এক চাঁটি মেরে বললাম, হাঁ ভালবাসি, এ কথাটা বুক ফুলিয়ে বলতে পারিস না? এদিকে শখ আছে প্রেমপত্র লেখার।

মেয়েটি দেখি সিধে আমার দিকে চেয়ে আছে।

বললাম, তুমি কি বল?

মেয়েটি বলল, ভাল না বাসলে চিঠি দেব কেন, আর ওর সঙ্গে সন্ধ্যেয় বাদাম জঙ্গলে দেখাই বা করব কেন।

বললাম, খুশী হয়েছি তোমার কথা শুনে। তবে বাদাম জঙ্গলে সন্ধ্যায় একটা বছর আর দেখা সাক্ষাৎ কোর না। পড়াশোনা করে বেরিয়ে যাও কলেজ থেকে দুজনে, আমি তোমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করব। মত দেন ভাল, না হলে আমি দাঁড়িয়ে তোমাদের রেজেস্ট্রি ম্যারেজের ব্যবস্থা করে দেব।

সুমিতা বলল, শেষ অব্দি ঘটনাটা কোথায় দাঁড়াল?

সরল বলল, আমি ওদের ছেলের মুখেভাতে মাস পাঁচেক আগে খেয়ে এসেছি।

সুমিতা বলল, উভয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ির খবর কি?

সরল বলল, ছেলের বাড়ি রাজী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়ের বাড়ি বেঁকে বসেছিল। শেষে নাতি হবার খবর নিয়ে আমি আবার দৌত্যকর্ম করতে যাই। তখন না এলেও বুঝেছিলাম, উত্তেজনা অনেক হ্রাস পেয়েছে। মুখেভাতে গিয়ে দেখলাম, দিদিমা নাতি কোলে দাঁড়িয়ে, আর দাদামশায় খাবার তদারক করছেন।

সুমিতা হেসে বলল, এতজনের ঘটকালি করছেন, নিজেরটা এতদিন করতে পারলেন না?

সরল হা হা করে হেসে উঠে বলল, ভাগ্যে নেই। পরের ঘর বাঁধতে নিজের ঘরখানা কখন ভেঙে পড়েছে বুঝতে পারিনি।

সুমিতা বলল, শত্রুতেও বলবে না যে আপনার ঘর ভেঙেছে। আপনার ঘরের কাঠামো কংক্রিটে তৈরী, ওতে সহজে ফাটল ধরবে না।

সরল বলল, একে সুন্দরী তরুণী, তার ওপর অধ্যাপিকা, আপনার সার্টিফিকেটের মূল্য অসীম, দিন দয়া করে লিখে, মুখে যা বললেন।

সুমিতা বলল, দাম বাড়াচ্ছেন কেন, আপনি নিজেই জানেন আপনার ওজন কতখানি।

সরল বলল, ডিগ্রীধারী ছাড়া মেয়ের বাবারা ছেলেকে আমল দিতেই চান না। আর সত্যিই তো, তাঁদের দোষই বা দিই কি করে। ছেলে পাস করেছে, রাইটার্সে চাকরি করছে, তবেই তো সিকিউরিটি অব লাইফ। ডিগ্রি নেই, চাকরি নেই, কোন নির্বোধ মেয়ে বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসবে বলুন?

সুমিতা কোন কথা বলল না। সূর্যাস্তের সমারোহের দিকে চেয়ে রইল। তার দেহের শাখায় নিভৃত নীড় লক্ষ্য করে অস্ত সূর্যের আলো মেখে এক আশ্চর্য সুন্দর আর বলিষ্ঠ পাখি আশ্রয়ের আশায় দুটি ডানা প্রসারিত করে উড়ে আসছিল। সে মুগ্ধ আর তদ্গত প্রত্যাশায় চেয়ে রইল তার দিকে।

জোয়ারে অনেক পথ নৌকা উজিয়ে এসেছে, এখন পড়েছে ভাঁটার টান। অষ্টমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে। পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। নৌকোর মাঝি ছাড়া দুজন দাঁড়িই নেমে গেছে নীচে। তারা নদীর ধারে গুণ টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নৌকো। ছলাৎ ছলাৎ জল বাজছে নৌকোর তলায়।

সুমিতা বলল, একটা আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চারদিকে। ছোট ছোট ঝোপে ভরা ধু ধু প্রান্তর, মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলা নদী, আকাশে চাঁদ, জলের শব্দ। মনে হচ্ছে এক অলৌকিক জগতের অধিবাসী আমরা। এখানে পৃথিবীর মানুষ সন্দেহের চোখ পেতে বসে নেই। মিথ্যা ডিগ্রির পোশাকগুলো খুলে গেছে। নিয়ম নেই, তাড়া নেই, কি অদ্ভুত একটা মুক্তির স্বাদ—তাই না?

সরল বলল, আপনি শুধু অধ্যাপিকা নন, আপনি কবি। হৃদয় দিয়ে পরিবেশকে ভালবাসেন।

সুমিতা বলল, এই অলৌকিক পরিবেশে আমরা কি একটুখানিও অন্তরঙ্গ হতে পারি না। আপনি অধ্যাপিকা, এই শব্দগুলো কি আজ এই রাতের মত নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারি না?

সরল বলল, আমি আমার অন্ধকার ঘরে একটা ছোট্ট জোনাকীর আলো জ্বালিয়ে বসে আছি, সেখানে চোখ ঝলসানো হাজার বাতির দীপ জেবলে কেন অন্ধ করে দিতে চাও সুমিতা?

আমি জানি আলোটা জোনাকীর হলেও অলৌকিক। সকলে ও আলোর অধিকারী হতে পারে না। আর কিছু না হোক, আমি তোমার বন্ধু বলে অন্তত তোমার ঐ অন্ধকার ঘরে ঢোকার অধিকারটুকু দাও।

সরল সুমিতার একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর তুলে নিয়ে বলল, দুঃখ দিতে চাও দাও, দুঃখ পাবার জন্যেই তো আমার জন্ম।

এ কথা আজ ফিরিয়ে নিতে হবে তোমাকে। আজ দুঃখ নয়, শুধু তৃপ্তি।

সরল বলল, তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু সুমিতা। আমার এতদিনের নিঃসঙ্গ জীবনের মিতা।

সুমিতা বলল, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই বন্ধু বলে মনের গোপনে গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর মুখোমুখি মুখোশহীন অকৃত্রিম দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা তোমার বড় ভাল লেগেছিল। পৃথিবীতে বিত্তবান পাওয়া যাবে, পণ্ডিত পাওয়া যাবে, কিন্তু একেবারে অকৃত্রিম একটি মানুষ পাওয়া যাবে না। তাই তোমার বন্ধুত্বে আমার এত লোভ সরল।

মাঝি হঠাৎ ডেকে উঠল, ঐ যে বাবু ফণীমনসার চড়া।

সরল নৌকোর ছইয়ের ভেতর থেকে ছিলা খুলে যাওয়া ধনুকের মত ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। সুমিতা ব্যাপারটা কি হল বোঝার আগেই সরলের গলা পেল। চাপা গলায় সরল বলে উঠল, দাঁড়িদের নৌকোয় এবার তুলে নাও ডিঙ্গাল।

মাঝি সরলের মত চাপা গলায় ওদেব ডাক দিল।

নৌকো থেমে গেছে। ওরা দড়িদড়া গুটিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল নৌকোর ওপর। দাঁড় টেনে টেনে অতি কষ্টে খরভাঁটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

নৌকোটা এখন চলেছে নদীর মাঝ বরাবর। নদীর পরিসব এখানে খুব বড় নয়। সরলের গলা পাওয়া গেল, আর একটুখানি ধার ঘেঁষে চল, নইলে তীরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে ভাল করে চেনাই যাবে না।

ছইয়ের ভেতর থেকে সুমিতা উঁকি দিয়ে দেখল, নৌকা তীরের খানিকটা দূর দিয়ে চলেছে। সামনে কিছু দূরে কালো কালো স্তূপের মত মনে হল। নৌকো আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, আর কালো স্তূপের মত বস্তুগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে ওগুলো গাছের জটলা। খানিকদূর থেকে জলের একটা গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সুমিতা দেখল, সরল এবার পাটাতনের ওপর প্রায় হামা দিতে দিতে এসে ঢুকল ছইয়ের ভেতর। ফিস ফিস করে বলল সুমিতাকে, ভয় পেয়ো না কিছুতেই। অনুমান একটা করেছি, হয়ত ঠিক, নয়ত ভুল। শুধু দেখে যাও। চেঁচামেচি কর না।

গাছের জটলার কাছাকাছি নৌকোটা আসতেই জলের শব্দটা বেড়ে উঠল। সরল ছইয়ের ভেতর প্রায় আধশোয়ার ভঙ্গীতে বসে ফুটোতে চোখ রেখে কি যেন দেখছে। সুমিতা কিছুই বুঝছে না। সেও এক সময় সরলের মুখের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে ঐ ফুটো দিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

একটা ক্ষীণ লণ্ঠনের আলো ঐ গাছগাছালি, জলের শব্দের ভেতর দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে বলে মনে হল।

আলোটার কাছাকাছি নৌকোটা যেতেই আলো অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা লোক চীৎকার করে ডাক দিল, কোন্ ঘাটের নৌকো ? কে যায় ওতে ?

মাঝি চেঁচিয়ে উত্তর করল, বীরবন্দরের নৌকো। হাঁড়ি কলসী বোঝাই।

আর কোন হাঁক-টাক করল না কেউ।

নৌকো ঐ গাছের জটলা পেরিয়ে এগিয়ে চলে এল। সুমিতা চাঁদের আবছা আলোয় দেখল, একটা ছোট খালের জল এসে দারুণ শব্দে আছড়ে পড়ছে নদীতে। তারই শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকদূর থেকে। ঐ খালের মুখের কাছাকাছি একটা নৌকো বাঁধা, জলের তোড়ে দোল খাচ্ছে। কয়েকটা লোক মনে হল নৌকোয় বসে। একটা লোক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছিল।

সরল সামন্ত তেমনি চেয়ে আছে চরের দিকে। নদীটা একবার বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। একফালি চর উঁচু থেকে নীচুতে নেমে এসেছে। কটা শেয়াল কাঁটার গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু পাড়ের দিকটায় গামা গাছের ঝোপ। সরল মাঝিদের বলল, ঐ একটা কিছু যেন দেখা যাচ্ছে, চরের কাছে নৌকো ভিড়াও।

মাঝিরা নৌকো ভিড়াতেই সরল লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। হাঁ ঠিক, কাদা-জলে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ!

সরল মৃতদেহটা দু'হাত দিয়ে তোলার জন্যে যেই নীচু হয়েছে অমনি গামা গাছের ঝোপ থেকে দুটো লোক ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সরলের ওপর। পেছন থেকে তাকে জাপ্টে ধরল। ইতিমধ্যে নদীর পাড় থেকে আর একটা লোক হুইসল্ বাজিয়ে দিয়েছে। ওদিকের খালে যে নৌকোটা ছিল, তার সব লোকজন ছুটে আসতে লাগল এদিকে। কাদায় লড়াই চলে না। সরল লোক দুটোকে যতই ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে ততই পা বসে যাচ্ছে কাদায়।

সুমিতা চীৎকার করে মাঝিদের নিয়ে লাফিয়ে পড়তে চাইছিল, কিন্তু হঠাৎ সরল সামন্তের গলা শুনতে পেল, এই মাঝি, পালাও পালাও।

মুহূর্তকাল সময় নষ্ট করল না মাঝিরা। সুমিতার আকুল কান্না বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে নোঙর তুলে ফেলেছে ওরা! খরভাঁটার টানে নৌকো ফিরে চলল বিদ্যুৎ গতিতে। মনে হল, যেন ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্রকে ভেদ করতে এসে গভীর সেই ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ল সরল সামন্ত।

সরল রাতের অন্ধকারেই পৌঁছতে চেয়েছিল জঙ্গলমহালে। সে জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় খুঁজে নিতে চেয়েছিল মাঝির মৃতদেহটা। সেই দেহটা নিয়ে সে ফিরে এসে পুলিসে জমা করে দিত। তারপর কয়েকটা সূত্র বলে দিত সে পুলিসকে, যার ফলে তদন্তের কাজে সুবিধে হত অনেক।

দিনের বেলা এলে এই নির্জন ফাঁকা চরে তাকে দুর্বৃত্তরা সবাই মিলে আক্রমণ করতে পারে, তাই রাতের অন্ধকার সে বেছে নিয়েছিল। অবশ্য সে জানত ঐ খালের মুখে দিনরাত পাহারা থাকাই স্বাভাবিক তাকে ধরার জন্যে। আর সেজন্য সে প্রস্তুতও ছিল। মাঝিদের শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। কিন্তু খালের থেকে এত দূরেও যে দুর্বৃত্তেরা সারা দিনরাত্রি তার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে তা সে ভাবতেও পারেনি। খালের মুখে ঐ মানুষগুলোকে পেরিয়ে এসে সে নিশ্চিন্ত এবং নিজেকে বিপদমুক্ত ভেবেছিল। তাই বিপদে জড়িয়ে পড়তে তার বেশি সময় লাগেনি। পুলিস সঙ্গে নিয়ে সে আসতে পারত, কিন্তু

যদি কোন রকমে বিপক্ষ আঁচ পায় তাহলে একেবারে সরে পড়বে সব চিহ্ন মুছে দিয়ে। তাই নিজে দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে এসেছিল।

এদিকে বিপক্ষের লোকেরা ফাঁদ পেতেই বসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সরল সামন্তকে কোন রকমে ধরে ফেলা। তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য আদপেই ছিল না, হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টাই তারা করেছিল, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল তাদের।

কেস চলল। জঙ্গলমহালের প্রতিপক্ষ জমিদার তনয়টি অনেক সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করল। সরল সামন্ত যে আদপেই সরল লোক নয়, প্রতিপক্ষের বাঘা বাঘা উকিলরা তাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল। সরল সামন্ত একটি চরিত্র-হীন মানুষ! জঙ্গলমহালে সে সব জমি-জায়গাই বেচে বসে আছে, কিন্তু ঐ নির্জন আস্তানাটি ছাড়েনি। কি উদ্দেশ্যে ঐ পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তার ঐ নির্জন অরণ্যনিবাস? যেখান থেকে কোন উপার্জনেরই আর কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে সবকিছু বেচে দিয়ে ঐটুকু রেখে দেওয়া কেন? ওটা আসলে লীলাকুঞ্জ। ব্যাচিলার মানুষটির নিভৃত ভোগের গোপন ক্ষেত্র।

মাঝির বউকে হাজির করল ওরা সাক্ষী হিসেবে। সে কেঁদে-কেটে সরল সামন্তের অত্যাচারের একটা লোমহর্ষক চিত্র এঁকে দিল। মৃত স্বামীর শোকে আদালত ঘরেই বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল।

উকিল বিচারককে বোঝাল, মেয়েটিকে কব্জা করার লোভে নিষ্ঠুরের মত নদীর চরে গলা টিপে মাঝিটিকে হত্যা করেছে সরল সামন্ত। আর খালের ধারে রাত্তিরে নৌকোয় করে মাছ ধরার জন্যে যারা অপেক্ষা করছিল, তারা ভাগ্যিস শুনতে পায় লোকটার আর্ত চীৎকার। কিন্তু ওরা দৌড়ে গিয়ে সরল সামন্তকে ধরে ফেললেও হতভাগ্য মাঝিটিকে আর বাঁচাতে পারেনি।

সরল সামন্তের চরিত্র আর আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কোন কোন সম্মানীয় ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ সাক্ষ্য রূপে ডেকেছিল! বলাবাহুল্য তাঁরা সকলেই সরল সামন্তের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও সে যে সহজ মেজাজের লোক নয়, অত্যন্ত রুক্ষ আর বদমেজাজী তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে গেল।

সরল সামন্তের হয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত কেস লড়ল সুমিতা। সরল যে কোন ডিগ্রি না পেয়েও অনেক বেশী মার্জিত আর শিক্ষিত সে প্রমাণ দেবার চেষ্টা করল সরলের পক্ষের উকিলেরা। সে যে জমিজমা সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছে একটা মূল্যবান লাইব্রেরী গড়ে তোলার জন্যে তার প্রমাণ দিল বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা দেখিয়ে। তবে সে যে জঙ্গলমহলের ঐ অরণ্য-নিবাসটুকু রেখে দিয়েছে সেটা অন্য কোন অসামাজিক উদ্দেশ্যে নয়, কৈশোর স্মৃতি হিসেবে। কৈশোরে সে ঐ বাস্তুভিটের বড় বড় গাছে হাজার হাজার পাখিকে উড়ে আসতে আর বাসা বাঁধতে দেখত। প্রভাত সন্ধ্যায় তাদের

কাকলি-ধ্বনি তার স্মৃতিতে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। তাই জমিজমা বিক্রি করে লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বাড়ালেও এই পক্ষী-অধ্যুষিত অরণ্যনিবাসটি সে আর বিক্রি করতে পারেনি।

মাঝি আর মাঝির বউটিকে সে আশ্রয় দিয়েছিল। মাঝিটি সৎ আর পরিশ্রমী হলেও মাঝির বউটি সব সময় সেজেগুজে বাইরে বেরিয়ে যেত। সরল তার স্বাভাবিক স্বভাবধর্ম অনুযায়ী কারু ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইতো না। কিন্তু জঙ্গলমহালে যাওয়া আসার পথে সে লক্ষ্য করেছে প্রতিপক্ষের জমিদার পুত্রের মোসাহেব জাতীয় একটি লোকের সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে। যার অবধারিত পরিণতি ঘটেছে এই মাঝির হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে।

সরল উড়ো চিঠি পেয়ে ঘটনাটির সত্যতা পরীক্ষার জন্যে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু প্রতিপক্ষের সাজান ফাঁদে নিরপরাধ মানুষটিকে জড়িয়ে পড়তে হল।

ব্যারিস্টার এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, প্রতি বিষয়ে স্পষ্টবাদিতা যদি অপরাধ হয় তাহলে সরল সামন্ত অপরাধী। আর ডিগ্রিলাভ না করে শুধুমাত্র জ্ঞান পিপাসা যদি মানুষকে কোনরূপ শিক্ষা দিতে না পারে তাহলে সরল সামন্ত অশিক্ষিত। মহামান্য বিচারক মহোদয়ই এই চিরাচরিত প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসার যোগ্য ব্যক্তি বলে আমরা মনে করি।

শেষ বিচারে বেকসুর মুক্ত পেয়ে গেল সরল সামন্ত।

কটি হলুদ প্রজাপতি উড়ে গেল কলেজের উপদেষ্টা, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী আর মেম্বারদের ঘরে ঘরে। হলুদ খামে সোনালী আমন্ত্রণ। সবাই চিঠি পড়ল। হাতে ধরা রইল চিঠি। এমন অবাক বুঝি কেউ কখনো হয়নি। নিঃশব্দে সুমিতা সরল সামন্তের জন্যে চালিয়ে গেছে লড়াই। কেউ আঁচও পায়নি এই তরুণী অধ্যাপিকাটি শুধুমাত্র সত্যকে আশ্রয় করে এতবড় একটা জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। জয়ী হয়েছে সে অবশেষে, আর জয় করে নিয়েছে তার পরম ধনকে।

এক ছুটির দিনে কলেজ কোয়ার্টারে সরল এল সুমিতাকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে যেতে। মেয়েরা সাজিয়ে দিল তাদের অতি প্রিয় সুমিতাদিকে। ছেলেরা হোস্টেল ভেঙে বরযাত্রী হয়ে এল সরল সামন্তের সঙ্গে।

এস. ডি. ও সাহেব নিলেন বান্ধবীর বিয়ের আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার। স্বয়ং এস. ডি. ও সাহেব উপস্থিত থেকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, এ বিয়েতে যোগ না দিয়ে পরিত্রাণ আছে?

প্রেসিডেন্ট বাঁধান দু'পাটি দাঁত বিকশিত করে দুটি হাত তুলে এস. ডি. ও সাহেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বিয়ের প্যাণ্ডেলে ঢুকে পড়লেন।

———

আলোর ঠিকানা

এমনি করে সীমার দিনের শুরু। তখনো কলোনীর ঘরগুলোতে ভোরের কলরব ওঠেনি। ও বেরিয়ে এল দরজা খুলে রাস্তায়। কাঁধে ঝুলছে একখানা ব্যাগ। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। প্রায় দিনই এমনি করে তাকে দাঁড়াতে হয়। ও পথে বেরোলেই মানিকের যত দরকারী কথাগুলো মনে পড়ে যায়। এটা সীমার অভ্যেস হয়ে গেছে। রাত দশটায় সে যখন স্টেশান থেকে আধ মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফেরে তখন কারো সঙ্গে কোন কথা বলার মত শরীরের অবস্থা থাকে না। কোনরকমে দুটি ভাতে ভাত নামিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। তারপর ভোরের পাখি ডাকার আগেই বেরিয়ে পড়া। তাই ওকে থামতে হয়।

পেছন থেকে কথা ক'টি ভেসে আসে, তিন তিন মাসের মাইনে বাকী সে খেয়াল কারো নেই। কালকের ভেতর মাইনের টাকা না দিতে পারলে বের করে দেবে কলেজ থেকে। তাছাড়া এ্যানুয়েল পরীক্ষার ইতি হয়ে যাবে।

সীমা কোন কথা বলল না। শুধু শুনে নিল কথাগুলো। তারপর আবার পথ চলা।

সেই ছোট্ট মানিক আজ কত বড় হয়েছে। মায়ের মুখ ও যখন দেখেছে তখন জ্ঞান পড়েনি ওর। ওকে জন্ম দিয়েই মা মারা গেছেন। বাবা অসহায় দুটি ভাই-বোনকে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানিকের সব ভারটুকুই এসে পড়েছিল সীমার ওপর।

তারপর একদিন বাবাও চোখ বুজলেন। তখন কত আর বয়স সীমার। তারই ভেতর সে মানিককে লেখাপড়া শেখাতে লাগল, নিজেও শিখল।

আজকাল বড় হয়েছে মানিক। কলেজে পড়ছে। কি রকম আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর ভেতর। প্রয়োজন ছাড়া সে দিদির সঙ্গে একটিও কথা বলবে না। অভিমান সীমারও কম নেই। কথা না বলে বলুক। দিদির কর্তব্য সে ঠিকই করে যাবে।

কলোনীর সীমানা পার হয়ে এল সীমা। পথের বাঁকেই ছাইগাদার ওপর রোজকার মত শুয়ে ছিল সর্দার। কারা যে কবে কুকুরটার এই নামকরণ করেছিল তা আজ আর কারো মনে নেই, তবে এই নামেই সে পাড়ায় পাড়ায় পরিচিত। সীমাও তাই জানে। সর্দার রাতের বেলা প্রায়ই ঘুমোয় না। অপরিচিত প্রবেশকারীকে কলোনীর ঠিক মুখেই আটকাবার চেষ্টা করে। তর্জনগর্জন করে তার পেছনে পেছনে আসতে থাকে, তার উদ্দেশ্যটা মোটামুটি আঁচ করতে পারলে তবে পথ ছেড়ে দেয় তাকে। শেষমেশ পেছন থেকে একবার ডাক দিয়ে বলে, সাবধান, যা তা কিছু একটা করে বস না যেন।

সীমার পায়ের সাড়া পেলেই উঠে আসে সর্দার। গা ঝাড়া দিয়ে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে। তারপর দুটো পা সামনে আর দুটো পা পেছনে যদ্দূর সম্ভব টান টান করে আড়মোড়া ভেঙে নেয়। তারপর পেছন পেছন চলতে থাকে সীমার। একেবারে স্টেশানের কাছ বরাবর তাকে পেঁৗছে দিয়ে তবে ফেরা। সীমা দু'একবার বারণ করেছে। বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কে শোনে

কার কথা। সর্দার তার সর্দারি ছাড়েনি। ভাবটা এই, তুমি সোমত্ত মেয়েছেলে, দায়ে ঠেকে ভোর রাতে বেরিয়েছ, তা বলে আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিই কি করে! যতক্ষণ সর্দার আছে, ততক্ষণ জেনো তোমার গায়ে আঁচড় কাটে কার সাধ্যি।

আজকাল সর্দারের এই খবরদারি সীমা মেনে নিয়েছে। বরং ভালই লাগে তার সর্দারের সঙ্গ। এতটা পথ ওর সঙ্গে দিব্যি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সীমা সারাদিন ঘোরাঘুরির ভেতর যে খাবার কিনে খায় তার কিছু অংশ কাগজে মুড়ে ব্যাগের ভেতর রেখে দেয়। স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগে ব্যাগ থেকে সে খাবারটুকু বের করে সর্দারকে দিয়ে দেয়। এত পথ সঙ্গ দেবার এটুকু পুরস্কার।

ভোরের ট্রেনটা প্রায় ঠিক সময়েই আসে। হুইসল্ বাজাতে বাজাতে প্ল্যাটফর্মের ভেতর যখন ঢুকতে থাকে তখন সীমার শরীরের ভেতর দিয়ে কেমন যেন একটা জোয়ারের ঢেউ বয়ে যায়। আলস্যটা সে যেন এইখানে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তৈরী হয় সারাদিনের যুদ্ধের জন্যে।

এই ট্রেনে মর্নিং কলেজের মেয়েরাই আসে বেশী। ভেণ্ডারদের শাকসবজির গাড়ি ছাড়া প্রায় কামরাতেই কলেজের মেয়েদের ভিড়। এক একটা স্টেশান আসে আর নতুন নতুন মেয়েদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। যেন নতুন এক ঝাঁক হাঁস কলকল করতে করতে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামরার ভেতর।

এই যে এসো এসো গুলণ্ড। কিছু নতুন গুগগুল ছড়াও।

সবাই সরে বসে বিশেষ একটি মেয়েকে জায়গা করে দেয়।

কৌতুকে ভরা চোখগুলো জোড়ায় জোড়ায় তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

খুব গম্ভীর মুখ করে মেয়েটি বলে, কাল এক কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের পাড়ায়।

কি রকম? কি রকম?—মেয়েরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

রকম আবার কি, একেবারে যাচ্ছেতাই, নারীহরণ। মেয়ে নিয়ে ভর দুপুরে হাওয়া হচ্ছিল ভদ্রলোক।

একজন টিপ্পনী কাটল, ভদ্রলোক কিরে, মেয়েচোর আবার ভদ্রলোক হয় নাকি?

শোন্ না বলি। ঠিক দুপুরবেলা তেমাথার মোড়ে মেয়ে পুরুষে ধস্তাধস্তি। মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠতেই আশপাশের সব জানলাগুলো খটাখট খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখি ততক্ষণে লোকটা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করছে। আর যায় কোথা, জুটে গেল পাড়ার মস্তানরা। একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গেছে। মেয়ে নিয়ে পালাবে বাপধন। দৌড়ে গিয়ে উত্তমমধ্যম। মেরে আধমরা করার পর জানা গেল ভদ্রলোক কুণ্ডুবাড়ির জামাই। আর গায়ের জোরে যাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর লিগ্যাল ওয়াইফ্।

সে কি রে!

হাঁ, ঠিক তাই। রহস্যটা অবশেষে জ্ঞাত হওয়া গেল। শ্বশুরবাড়ি এসে তেমন তেমন খাতির নাকি পাননি জামাতা বাবাজী—এর ওপর আগুনে ঘি পড়ল শালীদের মন্তব্যে। ভদ্রলোক নাকি বেশ কিছুদিন ধরে নাইট ডিউটি দিচ্ছিলেন। তাই শালীরা নাকি বলেছিল, এমন রাতচরা হুতোম জানলে বোনটাকে বিয়েই দিতুম না। ব্যস আর যায় কোথা। শালীর বোনকে টানতে টানতে একেবারে রাস্তার বার। সে মেয়েও নড়বেন না, আর উনিও ছাড়বেন না। অবশেষে টাগ-অব-ওয়ারের কাছি গেল ছিঁড়ে। দুজনে পড়ল দু'দিকে ছিটকে। ঘা খেয়ে জামাইয়ের মাজা গেল ভেঙে, আর বউএর সেন্স গন।

একজন মন্তব্য করল, লোকটা এত মার খাচ্ছে দেখেও বউটা কিছু বললে না?

বলবে কি রে! মনে মনে ভাবলে হয়ত কিছু শিক্ষা হচ্ছে হোক। তারপর আর দেখতে না পেরে শোকে জ্ঞানহারা। হাজার হোক স্বামীরত্ন তো।

আবার কেউ বলল, পাড়ার মানুষগুলো কি কানা, জামাইটাকে চিনতে পারলে না?

দূর, চিনবে না কেন,—আরে মারের সুযোগ একটা যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে কি হেলায় হারান যায়। কথায় বলে না স্বভাব যায় না মলে। মস্তানির সুযোগ একটা পেলে তখন কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র। পেটাও, পেটাও, পেটাও। আগে ধোলাই পরে কথা। দোষ করলে ক্ষমা বলে তো একটা কথা আছে। মার দেবার পরে ক্ষমাটা চেয়ে নিলেই হবে।

জামাই এখন কোথা, শ্বশুরবাড়ি?

হাঁ, শ্বশুরবাড়ি, তবে আর একটা—লালবাজার। এখন অবশ্য লালবাজার থেকে হাসপাতাল।

লালবাজার আবার কেন?

জটলা দেখে পুলিসের আগমন। ওদের দেখেই মস্তানদের পলায়ন, তাদের পুলিসের গাড়িতে লালবাজার গমন।

একজন বলল, ওরেব্ বাবা, এ যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় ভেতর থেকে একটি মেয়ে বলল, কত পার্সেণ্ট রে?

মেয়েটি কপট ক্রোধে ফোঁস করে উঠল, ঐ জন্যেই তো চুপ করে থাকি; বিশ্বসুদ্ধ মানুষগুলো কি অবিশ্বাসী রে বাবা!

ওর কথা বলার ধরন দেখে সকলে হেসে উঠল।

সীমা এক কোণে বসেছে। এই সময়টুকুতে সে যে কোন একটা বইএর পাতায় চোখ বুলিয়ে নেয়। অবশ্য সারাক্ষণ চোখ রাখা যায় না পড়ার বিষয়ে, বিশেষ করে এই সময়টাতে।

সকালবেলা কাজে বেরোবার আগে পাখিগুলো যেমন গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কলরব করে নেয়, এ ঠিক তেমনি। সীমা জানে, এরপর একটানা কয়েক ঘণ্টা মেয়েগুলোকে ক্লাস করে যেতে হবে, তখন প্রায় মুখবন্ধ।

তাই যত পার কথা বলে নাও এখন।

সীমার চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা ছবি। কলেজের বন্ধুরা মিলে চলেছে ব্যান্ডেল চার্চে পিকনিক করতে। কত হাসি কত হুল্লোড়। কত গান। অধ্যাপক নেই, অভিভাবক নেই, এ যেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

অভিনয় শুরু করল ওরা। প্রথমে চেঁচামেচি শুরু হল। তারপর একটি মেয়ে হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিতে দিতে বলল, ওরে সুদর্শন চক্র, সুদর্শন চক্র।

প্রফেসার 'এস্-সি' অর্থাৎ সুদর্শনা চক্রবর্তী। ইংরাজী পড়ান।

একটি মেয়ে কোনা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগল মেয়েদের দিকে। মুখে রাজ্যের বিরক্তি। চশমার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো তার ঘুরছে। মেয়েটি প্রফেসার 'এস-সি'র ভূমিকায়।

মুখ বেঁকিয়ে বলল, ইডিয়েট, যত্তো সব ইডিয়েট। কয়েকটা মিনিট ঢুকতে দেরি হয়েছে, অমনি 'বার্কিং লাইক ডগ্স্'।

তেমনি মুখ বেঁকিয়ে বলেই চলল, কেন, কেন পড়তে আসা! ঘরের কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে? যাও শেয়ালদা স্টেশানে ঘুরে ঘুরে সাইনবোর্ড পড়োগে। ইংরাজী মাতৃভাষা নয়, এখানে মামার বাড়ির আবদার চলবে না। পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরের বেশী ওঠাতে গেলে কিছু রেস্ত চাই। এ তোমার সংস্কৃতো নয় যে খাতার পাতায় কালি ছিটিয়ে দিলেই পাস হয়ে যাবে।

সুদর্শনা দেবীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না সংস্কৃতের প্রফেসার প্রীতি ভট্টাচার্যের। তাই সঞ্চিত ক্ষোভটা এমনিভাবে সুযোগ পেলেই প্রকাশ করতেন সুদর্শনা দেবী।

দু'একটি মেয়ে কোনায় বসে ফিসফিস কি যেন কথা বলছিল, অবশ্য চোখ ছিল প্রফেসারের দিকে।

সুদর্শনা দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন,—ইউ স্ট্যান্ড আপ্।

একটি মেয়ে আশপাশে তাকিয়ে শেষে নিজেই উঠে দাঁড়াল।

আমাকে বলছেন দিদি?

খিঁচিয়ে উঠলেন সুদর্শনা দেবী,—তোমাকে নয় তো কি ওপাড়ার ময়রাণীকে,—যত সব নন্সেন্স। আগে এটিকেট শেখো তারপর পড়া।

সুদর্শনা দেবীর পার্ট শেষ হল, তিনি বসে পড়লেন।

মেয়েরা এবার গান জুড়ে দিলে,

সমবেত : মোদের হাড় জুড়োল ভাই
এখন সুখে নিদ্রা যাই,
একজন : ও ভাই চক্র সুদর্শন
এখন করেছেন গমন,
সকলে : বিপদবারণ মধুসূদন
এলে প্রাণটা পাই

একজন ঃ ঐ যে এলেন বলে ভাই।···

অমনি সুরের পরিবর্তন ঃ

মেয়েরা সমবেতভাবে ঃ 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—

এ পিরিয়ড মধুসূদনবাবুর।

একটি মেয়ে মধুসূদনবাবুর ভূমিকায় উঠে দাঁড়াল। মধুসূদনবাবু নাদুসনুদুস মানুষ। হাহা করে হাসেন কথায় কথায়।

রেজিস্ট্রি খাতাখানা ধরে ডাকতে থাকেন রোল। নাম্বার ওয়ান।

ইয়েস স্যার।

নাম্বার নাইন।

হিয়ার স্যার।

টুয়েন্টি-সেভেন।

প্রেজেন্ট স্যার।

ততক্ষণে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

স্যার রোল নাম্বার থারটিন ডাকলেন না তো ?

ইউ, আনলাকি থারটিন।

তারপরেই প্রফেসার 'এম, এম'-এর ঠা ঠা করে হাসি।

তুমি কি ক্ষেপেছ. আমি নাম্বার থারটিনকে কল করব। ঘুমোওগে, নাকে সরষের তেল ঢেলে ঘুমোও গে। 'এম, এম'-এর একটা পার্সেনটেজও খোয়া যাবে না। যতসব রাবিশ এই ইউনিভারসিটির কানুনগুলো। আরে বাপু রামগড়ুরের ছানা হয়ে হাস্য নট্ মুখ করে কতক্ষণ ক্লাসে বসে পুঁথির খসখসে পাতাগুলো ভক্ষণ করা যায়। তার চেয়ে দু'দণ্ড পার্কে বেড়ান, সিনেমায় লাইন দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ঢের ঢের হিতকর। দেখ না, শুধু পার্সেনটেজের ভয়ে কেমন সব মুখ শুকিয়ে বসে আছে ক্লাসে। আমার হাতে আইন থাকলে আগে কলেজ থেকে পার্সেন্টেজের বালাই আমি ঝেড়ে ফেলে দিতাম।

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, স্যার আপনি খুব ভাল স্যার।

মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে হাসিমুখে অধ্যাপক মধুসূদন মুখার্জী বললেন, এই কমপ্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এজন্যে বেশী নম্বর পাওয়ার আশা করো না যেন।

মেয়েরা হেসে উঠল। হাসি থামলে একটি মেয়ে বলল, স্যার গতদিন ইতিহাস আর পাতিহাঁস সম্বন্ধে কি যেন বলবেন বলেছিলেন।

মনে আছে দেখছি। একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করেছি, টক ঝাল খেতে আর হাসির কথা শুনতে মেয়েদের জুড়ি নেই।

হাঁ, কথাটা ঠিক, পাতিহাঁস আর ইতিহাস একই রকম জানবে। হাঁস যেমন দুধমেশান জল থেকে দুধটা তুলে নিয়ে জলটা ফেলে দেয়, যথার্থ ইতিহাসও আজেবাজে জঞ্জাল থেকে খাঁটি জিনিসটা বেছে নেয়।

একটি মেয়ে বলল, এ কথা কোনদিন ভুলব না স্যার।

প্রফেসার মধুসূদন ঃ অমনি ভুললেই হল। ইতিহাস ভুললে যে নিজেকে,

নিজের দেশকে, এ দুনিয়াকে ভুলতে হবে। জানবে হিস্ট্রি, 'সবার ওপরে হিস্ট্রি সত্য, তাহার উপরে নাই।'

মধুসূদনবাবু বসলেন। মেয়েরা কলহাস্যে ভেঙে পড়ল।

এর পর পি, সি। প্রফেসার প্রতুল চ্যাটার্জী।

মেয়েরা বলে উঠল, পিসিমা আসছে রে পিসিমা।

নিরীহ মানুষ প্রতুলবাবু। রোগা চেহারা। নাকী সুরে মেয়েলী গলায় কথা বলেন। এসেই ওঁয়ান, টু, থিু, ফোর করে একশো সাতান্নটা রোল নাম্বার বোধকরি একদমেই ডেকে যান। এ সময়টুকু তাঁর বড় অপচয় বলে মনে হয়। তবে মধুসূদনবাবুর মত তিনের নামতা ধরে ডাকেন না। নিয়মের নড়চড় নেই পি, সির কাছে। এক মিনিটও বাজে কথায় কাটাবার লোক নন তিনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ান। রেকর্ডে আলপিন বসিয়ে ফাস্ট চালিয়ে যান। ভাষায় কমা, পূর্ণচ্ছেদ থাকাটা তাঁর মতে মনে হয় অনাবশ্যক। সময়ের অকারণ অপচয়। শোন মেয়েরা, গোলমাল করছ কেন, কিংবা কাম ইন ইত্যাদি কথা পি, সিকে কখনও বলতে শোনা যায় না। উনি সামনের দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে বলে যান! আশপাশ কিংবা কোন বিশেষ মেয়ের দিকে তাকান না। কে গোলমাল করল, কে কার বিনুনি ধরে টানল এ সব ট্রাইফ্লিং ম্যাটারগুলোকে তিনি ওভারলুক করতেই অভ্যস্ত। পড়ানোর শুরুতেই গতদিনের জের টেনে বলতে লাগলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক কবিতা সেদিনের বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত, এখন হেমচন্দ্রের হাস্যরসের কবিতার কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। দেশলাই এমনি এক কবিতা।

'নমামি বিলাতী অগ্নি দেশলাই রূপী,
দেহখানি চাঁচাছোলা, শিরে বাঁধা টুপি!
যেমন ডেপুটীবাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড় রাগে দেহ ভরা।

নমামি সর্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য বিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার!
নিদ্রিতের গুপ্তচর, পাচিকার প্রাণ,
লম্বা দাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান!

নমামি কিরণদণ্ড কোপন স্বভাব,
রাজগৃহ চালাঘরে সমান প্রভাব!
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে, গাড়ি, ঘোড়া, রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য শশী ফেলে।'

হাস্যরসের কবিতা এমন কাঠ কাঠ শুকনো গলায় বলে গেলেন যে মেয়েরা তাঁর গলা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারল না।

এরপর এক মিনিটও না থেমে, এবার কবিবর নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র ছিলেন

দেশাত্মবোধ ও বিশ্বমানবতাবোধে উদ্দীপ্ত। পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস গ্রন্থগুলিতে তাঁর কবিপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আঠারোশ···

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। অমনি স্টপ। যেখানকার কথা সেখানে রইল। রেজেস্ট্রি খাতাখানা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন ঐ আঠারোশ-এর জের টেনে বলে যাবেন হয়ত—সাতাত্তর সালে নবীনচন্দ্র ··।

মেয়েদের মনে রাখতে হবে গতদিন উনি আঠারোশ বলেছিলেন সুতরাং আজ আর আঠারোশ উচ্চারণ করে সময় নষ্ট করবেন না। সাতাত্তর থেকেই শুরু করবেন।

এবার টিপটপ সাজের বহর নিয়ে উঠে দাঁড়াল একটি মেয়ে! কয়েকবার নিজের পোশাক আর মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল। উদ্দেশ্যটা, দেখ, আজ আবার কি রকম নতুন সাজে সেজে এসেছি। ইনি ডি, ডি। প্রফেসার দীপালী দত্ত!

মেয়েরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'ফর গেট মি নট' এসেছে রে।

একটি মেয়ে বলল, আজ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা অঙ্গে 'ভুলো না আমায়'এর এ্যাডভারটাইজমেণ্ট সেঁটে এসেছে।

মেয়েরা, 'প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকি' ছিল আগেকার দিনে আমাদের দেশের আদর্শ।

একটি মেয়ে অমনি পাশের মেয়েকে বলল, সে আপনাকে দেখেই মালুম হচ্ছে।

পাশের মেয়েটি অমনি বলল, আরে উনি তো আগে কি ছিল তাই বলছেন, এখন মা যা হয়েছেন তার ছবিটা দেখ ওঁর ভেতর।

ডি, ডি বলে চললেন, সে আদর্শ আজ আমরা হারিয়েছি, তাই দেশ জুড়ে এই অর্থনৈতিক হতাশা।

এর ভেতর অন্ততঃ বারতিনেক প্রফেসার দীপালী দত্ত নিজের সাজের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা গড়িয়ে নিলেন। পোশাকের কোথাও ভেঙেচুরে যাওয়া একেবারে তিনি পছন্দ করেন না।

স্টেশানে ট্রেন এসে থামল! হৈ হৈ করতে করতে মেয়েরা নেমে গেল।

সীমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কিন্তু সে যেন সত্যিই এক স্বপ্নের দিন। ভবিষ্যতের কত আশা কত কল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিল তারা। কোনদিন কেউ কাউকে ভুলতে পারবে না এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সেদিন তাদের কথার ভেতর কোন খাদ ছিল না। কিন্তু আজ কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেই বা কার খোঁজ রাখে। বুঝি এমনিই হয়। সব প্রতিশ্রুতি এমনি করে শুরু হয় আবার এমনি করেই কখন ভেঙে যায়। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সীমার বুক ঠেলে উঠে আসে।

সীমা সচকিত হয়ে দেখে তার চারদিক থেকে কখন উঠে চলে গেছে মেয়েরা। সে এই বিরাট সরীসৃপের মত গাড়িখানার গহ্বরে একাই বসে

আছে। পাশে পড়ে থাকা ব্যাগখানা তুলে নিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সীমা।

সকালের রাস্তা, অফিসের ভিড় শুরু হয়নি, মেয়েরাই চলেছে বেশী। হাতে বইপত্তর।

দিদি—

ডাক শুনে সীমা পেছন ফিরে তাকাল। সেদিনের সেই মেয়েটি। লজেন্স নিয়েছিল, কিন্তু পাঁচটা পয়সা দাম দিতে পারেনি। ব্যাগ খুঁজে হতাশ হয়ে বলেছিল, এই যাঃ, একেবারে শূন্য!

ততক্ষণে লজেন্সটা ও মুখে পুরে ফেলেছে।

সীমা ওর সলজ্জ মুখখানা দেখে বলেছিল, তাতে কি হয়েছে ভাই, আর একদিন দিয়ে দিও।

সীমা লক্ষ্য করেছে, মেয়েটি যেন সেদিন তার সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

সীমার কাছে মেয়েটি এগিয়ে এল। ব্যাগ খুলে পাঁচটা পয়সা হন্তদন্ত হয়ে বের করে সীমার হাতে দিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দিদি, দামটা দিতে বড় দেরি হয়ে গেল।

সীমা বলল, দরকার থাকলে আরও নিও, দামের জন্যে তাড়া নেই। ধীরে ধীরে শোধ দিলেই চলবে।

মেয়েটি মুখ নীচু করে বলল, লজ্জা করে দিদি, রোজ রোজ পয়সা না দিতে পারলে এতগুলো মেয়ের সামনে বড় লজ্জায় পড়তে হয়।

সীমা জানে, এসব মেয়েরা কি কষ্টে লেখাপড়া শেখে। স্টুডেণ্ট কনসেসনে কোনরকমে মান্থলি টিকিটখানা কেনে। তারপর সকালে কলেজে আসবার সময়ে কোনদিন শুকনো এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে আসে, কোনদিন বা তাও জোটে না। তারপর ক্লাস সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতে বারোটারও বেশী বেজে যায়। কলেজে মাঝে মাঝে ক্ষিদের জ্বালায় এরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

সীমা মেয়েটির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলল, আমার যদি ক্ষমতায় কুলত তাহলে তোমাকে রোজ রোজ এমনি লজেন্স খাওয়াতাম, কিন্তু তা যখন নেই, তখন দাম আমি তোমার কাছ থেকে নেব। তবে লজেন্স তুমি খুশিমত নিয়ে চলে যেও, দামের কথা আমি বলব না। সময় আর সুযোগ মত তুমি দামটা দিয়ে দিও।

মেয়েটি সীমার পাশে পাশেই চলতে লাগল। সীমা জানে মুখ ফুটে এসব মেয়ে চাইতে পারবে না। তাই নিজে থেকেই সে তার ব্যাগ খুলে দুটো লজেন্স বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, ব্যস্ত হয়ো না, এর দাম এখুনি আমাকে দিতে হবে না।

মেয়েটি কিছু প্রতিবাদ না করেই লজেন্স দুটো নিয়ে নিল।

সীমা বলল, একটা এখুনি মুখে ফেলে দাও তো দেখি।

মেয়েটি কাগজের মোড়ক খুলে লজেন্স একটা মুখে ফেলল। তার মুখ

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সীমা বলল, আজ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসায় তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, ঠিক বলিনি, বল ?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। তারপর বলল, তোমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই দিদি, আজ কোন খাবার ছিল না ঘরে। বাবা অনেকদিন রিটায়ার্ড করেছেন তো, তাই অসুবিধেয় চলছে। পাসটা করতে পারলে যাহোক একটা চাকরি পাব, তখন কিছুটা সামলে নিতে পারব।

সীমা হাসল। বড় কষ্টের ভেতরেও হাসি পেল তার। কত পড়াই তো সে পড়ল তবু একটা সামান্য চাকরিও কি জোটাতে পেরেছে। শেষে লজেন্স বিক্রি করে সংসার চালাতে হচ্ছে তাকে। আর এই দুঃখী মেয়েটা এখনও স্বপ্ন দেখে, পাস করলেই যাহোক কবে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে।

মেয়েটি এবার পা চালিয়ে চলে গেল। ফার্স্ট পিরিয়ডে তার ক্লাস।

সীমা ধীরে ধীরে রাস্তাটা পার হল। তারও ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু সে এখন খাবে না। আগে কিছু লজেন্স বিক্রি করবে তারপর যাহোক কিছু খাবে। কিছু না খেলে চলা যায় না, তাই।

সকালের একটি কলেজের ভেতরে সীমা এসে ঢুকল। তখনও ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়েনি। সীমাকে দেখে কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে এল। তারা কয়েকজন লজেন্স কিনল। ওরা সীমার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। কথা চাপা থাকে না। সীমা যে শিক্ষিতা হয়েও লজেন্স বিক্রির কাজে নেমেছে তা তারা জানে। তারা সীমাকে সমীহ না করলেও ভালবাসে। এর চেয়ে বেশী লাভের কথা সীমা ভাবতে পারে না। মেয়েগুলো যখন সীমাকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন সীমার বড় ভাল লাগে। তার মনে হয়, সে এখনও যেন বেঁচে আছে।

ঘণ্টা পড়তেই একঝাঁক চড়ুইএর মত ফরফর করে মেয়েরা উড়ে পালাল। সীমা নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। এবার অন্য একটি কলেজে তাকে যেতে হবে। পেছন থেকে একটা কর্কশ গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই সীমা ফিরে দাঁড়াল। সম্ভবতঃ কলেজের প্রিন্সিপাল ইনি।

তুমি এখানে কিজন্যে এসেছ ?

সীমা বলল, আমি মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করি।

আরও রূঢ় গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, এই যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে কি হয় তোমার ধারণা আছে ?

সীমা মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রমহিলা সমান উচ্চগ্রামে গলা তুলে বলে যেতে লাগলেন, তুমি একটু ভুল করেছ। না, এটা বাজার নয়, এটা লেখাপড়ার জায়গা। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে একটি মেয়ে ছুটে এল ভদ্রমহিলার কাছে।

কি হয়েছে রীতা ?

দিদি, সি সেক্সনের মেয়েরা টি. আর স্যারকে ক্লাসে ঢুকতে দিচ্ছে না।

টি. আর যত বলছেন, আমার পড়ান হয়ে গেলে তোমরা যা খুশি তাই কর, কিন্তু ওরা ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বক্তৃতা আর হাততালি দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মেয়েদের চীৎকার প্রবল হয়ে উঠল। সামনেই ইলেকশান। পাঁচটি পার্টি এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। নীচে দু'একটা পটকা কোন্ অজানা হাত ফাটিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাজার সরগরম। মেয়েরা এদিক ওদিক ভয়ে দৌড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে দৌড়লেন, বেয়ারা, দুবে সিং, কোলাপসিবল্ গেট লাগাও। মুহূর্তে কোথা থেকে যেন এক দক্ষযজ্ঞ বেধে উঠল।

সীমা নেমে গেল পায়ে পায়ে। একটু হাসল মনে মনে, বাজার থেকে জায়গাটা কি খুব বেশী দূরে ?

পথে নেমে কয়েক পা এগিয়েই চোখে পড়ল তার একটি বিরাট সাইনবোর্ড।

'বিষ্ণুশর্মা টিউটোরিয়াল হোম'

এখানে অভিজ্ঞ অধ্যাপক, প্রাক্তন পেপারসেটার ও হেড এগজামিনারের দ্বারা স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, পি. ইউ এবং ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিংএর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

সীমা আবার কি মনে করে যেন হাসল। কলেজে ঐ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, লেখাপড়ার জায়গায় ব্যবসাবাণিজ্য চলে না।

তার মনে পড়ল একটি কথা। তখন সে এম-এ ক্লাসের ছাত্রী। ফরেন একটি ইউনিভারসিটি থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসেছিল তাদের ইউনিভারসিটিতে। স্টুডেণ্ট ইউনিয়ান থেকে তাদের রিসিভ করা হল। তারা সমস্ত ইউনিভারসিটি ঘুরে ঘুরে দেখলে। তারপর বিদায় ভাষণে ওদেরই একজন বললে, আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, এখানে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছেলেমেয়েরা তো কথা শুনে তাজ্জব। শেষে নানা কথায় রহস্যের যবনিকা উঠল। ইউনিভারসিটির নীচের তলায় অনেকগুলো দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল আর সেই ঘরগুলো দেখেই ওরা ভেবে নিয়েছিল এখানে হাতে কলমে ছেলেদের ব্যবসা-বাণিজ্য শেখান হয়।

সীমা নিজের মনে মনে ভাবতে লাগল, সত্যিকারের অন্যায়টা তারই হয়েছে। প্রথমে রূঢ় কথাগুলো শুনে তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পথ চলতে চলতে তার ভাবনার মোড় ফিরল।

সত্যিই তো একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকে যে কোন জিনিস বিক্রি করা শুধু বে-আইনী নয় অসংগতও বটে। ভাবতে ভাবতে ভদ্রমহিলার কথাগুলো তার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে হল, আর একটু সুন্দর করে, সহানুভূতির সঙ্গে যদি উনি কথাগুলো বলতেন, তাহলে তার মনে কোন ক্ষোভই থাকত না। অবশ্য ফেরিওয়ালার এর চেয়ে বেশী প্রাপ্য কি আর থাকতে পারে।

সীমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এবার থেকে কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাড়া ভেতরে ঢুকে সে আর লজেন্স বিক্রি করবে না। সীমা কয়েকটি কলেজে ঘুরল। এ তার প্রভাতফেরি। তারপর ইউনিভারসিটি খুললে সে যাবে সেখানে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ চিপ ক্যানটিনে ঢুকে ভাত আর খানিকটা তরকারি খেয়ে নেবে। তারপর শুরু হবে তার কাজ। ইউনিভারসিটির ছেলেমেয়েদের অনেকেই তাকে চেনে। তারা কেউ কেউ কেনে, কেউ বা নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিক্রির ব্যাপারে সাহায্য করে।

সেদিন ইউনিভারসিটিতে গিয়ে শুনল, অধ্যাপক ব্যানার্জীর মৃত্যুতে শোকসভা হবে, তাই ক্লাস দু' পিরিয়ড হয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে ইউনিভারসিটি থেকে। সীমা চেয়ে চেয়ে দেখছে, ইউনিভারসিটি প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের কথা হাসি গান ভেসে আসছে। তাদের কাছে অধ্যাপক ব্যানার্জী এক অবয়বহীন অস্তিত্ব মাত্র। তারা আজ অধ্যাপক ব্যানার্জীর জন্যে একটা ছুটি পেয়েছে এইটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় লাভের ব্যাপার। শুকনো পুঁথির পাতার কচকচানি থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি মিলল। ম্যাটিনি শোতে বসে আজ আর পারসেণ্টেজ খোয়া গেল বলে মনঃক্ষোভ করতে হবে না।

ওরা চলে গেল। আজ সীমার আর বিক্রি হবে না লজেন্স, তবু সীমা চলে যেতে পারল না। ইউনিভারসিটির উত্তর দিকের পাম গাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঐ তো সেই ঘরখানা, যেখানে অধ্যাপক ব্যানার্জী বসতেন। রুক্ষ চেহারার মানুষ। কেউ গেলে চোখ কুঁচকে নাক মুখ সিঁটিয়ে থাকতেন, যেন রাজ্যের বিরক্তি সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে এসে জমা হল। তারা যখন ইউনিভারসিটির ছাত্রী তখন অধ্যাপক ব্যানার্জী ছিলেন কলাবিভাগের প্রেসিডেণ্ট। একটি দিনের স্মৃতি সীমার মনের ওপর ফুটে উঠল।

নাম কাটা গেছে, কারণ মাইনে বাকী পড়েছে অনেক। কেবল তার নয়, যারা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাদেরও। অবশ্য তাদের সঙ্গে সীমার এই মাইনে বাকী পড়ার তফাতটা অনেক। ঘরের পাঠান টাকা তারা এনতার খরচ করত, তাই মাইনে দেবার টাকাটা আর তারা কুলিয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সীমার পক্ষে মাইনের টাকা যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত।

সেবার নাম কাটা গেলে একটি দরখাস্তে নিজের অসহায় অবস্থার কথা লিখে ও ঢুকল সেক্রেটারীর ঘরে। সীমা জানত আগে যিনি সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় নতুন লোক এসেছেন। আগের সেক্রেটারীর দোষগুণ যাই থাক, তিনি ছাত্রদের সুখদুঃখের কথা বুঝতেন। নাম কাটা গেলে দু'এক মাসের মাইনেও বাদ দিয়ে একটা রফা করে নিতেন। কিন্তু নতুন সেক্রেটারী সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না সীমার। দরখাস্তটি হাতে নিয়ে আধ মিনিট চোখ বুলিয়ে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, পড়াশোনা আবদারের জিনিস নয়। নিয়ম হল নিয়ম। তার নড়চড় হয় না।

রি-এ্যাডমিশন ফি, বকেয়া পুরো মাইনে আর তার সঙ্গে ফাইন নিয়ে এসো তবেই নাম উঠবে খাতায়।

অনুনয় করে সীমা বলল, অনেক কষ্ট করে তিন মাসের মাইনে যোগাড় করে এনেছি স্যার। পাঁচ মাসের মাইনে দেবার সাধ্য নেই। রি-অ্যাডমিশন ফি আর ফাইন দিতে গেলে ইউনিভারসিটি ছেড়ে দিতে হবে স্যার।

আমরা তাই চাই, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল। তোমরা ইউনিভারসিটির বার্ডেন। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই।

সীমা অমনি বলল, তাহলে ডক্টর ব্যানার্জীর কাছে একবার যাই স্যার।

সীমা বুঝতে পারল না যে কথাটায় নতুন সেক্রেটারীর আত্মসম্মানে কতখানি ঘা লাগল।

তিনি সীমার হাত থেকে দরখাস্তখানা চেয়ে নিয়ে তার ওপর খসখস করে কতকগুলো টাকার হিসেব লিখে দিয়ে কোন্ ধারার কোন্ নিয়মে ঐ সব অঙ্ক ইউনিভারসিটির প্রাপ্য সে মন্তব্যও প্রেসিডেন্টের কাছে লিখে দিলেন। ভাবটা, এখন যাও, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওগে।

সীমা ওপরতলায় অধ্যাপক ব্যানার্জীর ঘরের দিকে যেতে যেতে সেক্রেটারীর মন্তব্যগুলো পড়ে নিলে। নাঃ পার পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই।

অধ্যাপক ব্যানার্জী ঘরেই ছিলেন। সুইং-ডোর একটু ফাঁক করে সীমা দেখল তিনি কি যেন একটা বই পড়ছেন। সীমার তখন যা মনের অবস্থা তাতে কোন কিছু না ভেবেই সে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

ঠিক স্বভাবমত কাজ করলেন অধ্যাপক ব্যানার্জী।

চোখ কুঁচকে রাজ্যের বিরক্তি মুখে ঢেলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, নাঃ, শান্তিতে যে একটু পড়াশোনা করব তার উপায় নেই। কি চাই?

ভয়ে ভয়ে সীমা দরখাস্তখানা এগিয়ে দিলে। অধ্যাপক ব্যানার্জী আধমিনিট পড়ে সেক্রেটারীর মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না। তিনি সবটুকু দরখাস্ত পড়লেন। সেক্রেটারীর মন্তব্যগুলো বিশেষ করে দেখলেন।

কি চাও?

স্যার···।

আর কিছু বলতে পারছিল না সীমা। তার চোখের সামনে ঘনিয়ে উঠছিল একটা মেঘ। এতক্ষণে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অধ্যাপক ব্যানার্জী যেন দেখেও দেখলেন না। তিনি তেমনি মেজাজী গলায় হেঁকে বললেন, কি করা হয়?

সীমা কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে তাকিয়ে রইল। আরও যেন ক্ষেপে উঠলেন অধ্যাপক ব্যানার্জী, টিউশনিফিউশনি করা হয়?

সীমাকে যেন কথা যুগিয়ে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জী।

সীমা বলল, হ্যাঁ স্যার।

একটা টিউশনি কর, না সংসার চালাতে আরও টিউশনি করতে হয়?

সীমা চুপ করে আছে দেখে নিজেই বলে চললেন, বুঝেছি, চার পাঁচটা

টিউশনি অন্ততঃ করতে হয়।

তারপর আপনমনে কিছুক্ষণ বকে চললেন, দেশ স্বাধীন হল, তবু যে দুঃখ সেই দুঃখই রয়ে গেল। অযোগ্য, সব অযোগ্য। নিজের নিজের ঘর সামলাচ্ছে।

দরখাস্তের ওপর নিজের মন্তব্য লিখে দিলেন। দু'মাসের মাইনে বাদ, রি-এ্যাডমিশন ফি আর ফাইনের টাকাগুলোও বাদ। তিনি এও লিখলেন, মেয়েটি অত্যন্ত দরিদ্র অথচ মেধাবী আর পরিশ্রমী।

দরখাস্তখানা সীমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আবার বই-এর ভেতর ডুব দিলেন।

সুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সীমা, পেছন থেকে আবার ডাক দিলেন, ওহে শোন।

কাছে যেতেই দরখাস্তখানা চেয়ে নিয়ে বললেন, ফাইন কিছু দিতে হবে বাপু। নইলে সেক্রেটারীর সম্মান থাকে না।

এই বলে নামমাত্র একটা টাকা ফাইন বসিয়ে দিলেন।

সীমা তখন পাখির মত হালকা হয়ে গেছে। সে প্রায় উড়েই এল নীচে সেক্রেটারীর ঘরে। দরখাস্তখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই যে নিন স্যার, টাকা জমা দেব, দয়া করে সই করে দিন।

সেক্রেটারী অধ্যাপক ব্যানার্জীর মন্তব্য পড়লেন। তাঁর তখন আর করার কিছু ছিল না। সীমা দেখল, রাগে প্রায় তিনি কাঁপছেন। অবশ্য এ রাগটা যে সীমার ওপর নয়, তা বেশ বোঝা গেল যখন তিনি ডক্টর ব্যানার্জীর ঐ এক টাকা ফাইনের অংকটাকে ঘচঘচ করে কেটে দিয়ে লিখে দিলেন, ফাইন এক্সকিউজ্‌ড্‌।

সীমা সেদিন সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি হাসাই না হেসেছিল। প্রেসিডেণ্টের ওপর একহাত নিতে গিয়ে সেক্রেটারী দোষীকেই মুক্তি দিয়ে দিলেন।

আজ অধ্যাপক ব্যানার্জী নেই। তাঁর শোকসভার আয়োজন হয়েছে। তিনি অনেকদিন ইউনিভারসিটি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাই ক্ষমতাহীন মানুষ সম্বন্ধে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করা হচ্ছিল। এই নিয়মরক্ষার ক্ষেত্রে হয়ত কয়েকজন আসবেন গণ্যমান্য। ফাইলের ওপর কলমটাকে খোলা রেখেই হয়ত চলে আসবেন কেউ। দু'এক মিনিট বসে থেকে, দু'চারটে মামুলী কথা বলে কাজের অছিলায় উঠে পড়বেন। তারপর একসময় সভা ভঙ্গ হবে। ওপরওয়ালাদের দেখাবার জন্যে যে কটি বশংবদ অতিকষ্টে বসেছিলেন, তাঁরা ততক্ষণে ছুটবেন ট্রাম বাস ধরতে।

নাঃ এ সভায় যাবে না সীমা। সে ঐ ঘরখানার দিকে তাকিয়ে, যেখানে একটি হৃদয়বান মানুষ কঠিন মুখ করে বসে বসে পড়াশুনা করতেন, একটি নমস্কার জানিয়ে পায়ে পায়ে চলে এল।

আজ আর সীমা তার বেসাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না। বিক্রি তার বেশী

হয়নি আজ। একটি ছাড়া আর কোন কলেজের চৌহদ্দিতে ঢোকেনি সে। বাইরে দাঁড়িয়েই বিক্রি করেছে। তাই জমার ঘরে বেশী কিছু পড়েনি তার।

সীমা ফিরে চলল বাড়ির পথে। আজ অনেক সকাল সকাল সে ঘরে ফিরছে। স্টেশানে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বড় তেষ্টা পেয়েছে তার। পাশেই একটা চায়ের দোকান। কোনদিন ঢোকেনি সে এই দোকানে। আজ পায়ে পায়ে তার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। সবে সন্ধ্যা হয় হয়। কলকারখানা ছুটি হয়ে গেছে। কালিঝুলিমাখা কয়েকটা লোক ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসে সুপ্সুপ্ চা গিলছে। দু'চারটে সবে গোঁফওঠা উঠতি মস্তান একজায়গায় বসে রাজনীতি করছিল। সীমাকে ঢুকতে দেখে নড়ে চড়ে বসল। সীমা অপরূপ নয় তবে সুন্দর। আর সুন্দর হয়েও সে বড় স্থির। তাই তাকে প্রথম দেখে আকৃষ্ট হলেও, কামনা উদ্বেল হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ চায়ের দোকান অন্য জগৎ। এখানে মস্তানরা বসে থাকে ট্রেনের মেয়ে যাত্রীগুলিকে দেখবার জন্যে। শুধু চোখের দেখা নয়, কিছু কিছু লাগসই মন্তব্য ছুঁড়ে মারবার জন্যে। মস্তানিতে এখানে শুরু হয় ওদের হাতেখড়ি। তারপর কিছুটা পোক্ত হলে মস্তান দাদারাই ওদের নিয়ে যায় নানারকম চোরাই কারবারের কাজে। ওয়াগন ব্রেকার হতে পারে তারা, যারা মার খেয়ে খেয়ে হাড়গুলোকে লোহা বানিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতা আর সাহসে পয়লা নম্বর হওয়া চাই।

সীমা ঢুকেই একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। একটা নোংরা অল্পবয়সী ছোকরা, চা-বানানেওলার কাছ থেকে ছিটকে চলে এল সীমার কাছে।

এক কাপ চা।

শুধু চা ? নেড়ে বিস্কুট লাগবে না ?

না।

ছেলেটা মাথা চুলকাল। ভাবলে, এইসব ভদ্রমহিলারা কুলিকামিনের মত নেড়ে বিস্কুট খায় না। ভাবনাটা মগজে আসতেই সে অমনি বলল, নানখাটাই আছে, একেবারে টাটকা নানখাটাই।

না, ওসব দরকার নেই।

ছেলেটা নিরাশ হয়ে অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

সীমা স্থির হয়ে বসে আছে। চা এল, ধোঁয়া উঠছে। সীমা তাকিয়ে আছে। এখন সে কোনকিছু ভাবছে না, কোনদিকে তাকাচ্ছে না। মনের এ এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা। চা একটু ঠাণ্ডা করে খাওয়াই সীমার অভ্যেস। একসময় সীমা সচেতন হল। চা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ও প্রায় একচুমুকেই চাটা গিলে ফেলল। এই পরিবেশে বেশীক্ষণ বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাওয়া যায় না।

সীমা ছোঁড়াটাকে হাতের ইশারায় ডাকল। সে আসতেই তার হাতে চায়ের পয়সা দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক সেই সময় মন্তব্য শোনা গেল, চাক্কু রে চাক্কু, ইস্পাতে বিজ্লী মারছে।

আর একজন কেউ বলল, ধর্ ধর্, চাক্কু মেরে কচ্ করে আমার কল্জেখানা কেটে নিয়ে পালালো রে।

সীমা পেছন ফিরে দাঁড়াল। সারা শরীর তার রাগে রী-রী করছে।

কিছু বলছেন ?

এই মুহূর্তে কারখানার সেই চাপায়ী লোকগুলো কোন্ মন্ত্রবলে যেন বোবা বনে গেছে।

সীমা আবার চলা শুরু করতেই কে যেন বলে উঠল, লে বাবা, কথা পড়ল সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।

আর একজন গেয়ে উঠল, দংশন কৈল কালনাগিনী, ক্যামনে প্রাণ বাঁচাই অভাগিনী।

সীমা ততক্ষণে পথে এসে নেমেছে। কারখানার ফিটারগুলো মাতব্বরি করছে দেখে ততক্ষণে উঠতি মস্তানদের সংবিৎ এল। তারা ওদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে এ যে শরম কী বাত। অতএব তারাও চেঁচিয়ে বিগলিত গলায় গান ঢালতে লাগল, 'মন মানে না, সখি। মন মানে না …'।

ছেলেগুলো মানিকের বয়সীই হবে। ইচ্ছে করছিল কান ধরে গালে একটি একটি করে চড় বসিয়ে দেয়। একটু থামল সে, ওরাও হঠাৎ থেমে গেল। সীমা আর না দাঁড়িয়ে জোরে পা চালাল বাড়ির পথে। ততক্ষণে জোর কোরাস চলেছে চায়ের দোকানে।

বাড়িতে এসে যখন পেঁছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। ভেতরে তখন কি একটা চেঁচামেচি চলছিল। সীমা বাইরেই দাঁড়িয়ে গেল।

মানিককে বলতে শোনা গেল, যারা পকেট মারছে, ওয়াগন ভাঙছে তাদের দোষী করবি কি করে। চাকরি নেই বাকরি নেই, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে কামিয়ে নাও দু'পয়সা যেদিক দিয়ে পার।

একটি ছেলে বলল, তার চেয়ে কোন একটা পয়সাকড়িওলা রাজনৈতিক দলে ভিড়ে যাওয়া ভাল। ক'দিন প্রেস্টিজ নিয়ে ঘোরাও হবে, আবার দাঁও বুঝে টু-পাইস মারাও যাবে।

হঠাৎ চুপ করে গেল ছেলেগুলো। বোধকরি সীমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। সামান্য সময় মাত্র। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে ছিটকে কে কোথায় বেরিয়ে গেল।

সীমা ঘরে ঢুকল। মুখ হাত ধুয়ে রান্না চড়াল। এগারটার ভেতরই খাওয়াদাওয়া সেরে, মানিকের জন্যে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে সে শুয়ে পড়ল।

ভোরের আগেই আবার পথে বেরল সীমা। আজ তার মনটা সত্যিই বিষণ্ণ। কাল সন্ধ্যায় মানিকের মত ছেলেদের মুখে সে যে কথা শুনেছে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওকে মানুষ করবার! নিজের এতটুকু সুখের দিকে সে তাকায়নি। তবে কেন মানিকের এ হতাশা।

সর্দার ততক্ষণে সঙ্গ নিয়েছে সীমার। সর্দার চলতে চলতে সীমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আজ যেন সীমা চলেছে একেবারে অন্যমনে।

ওরা কিছুক্ষণের ভেতর এসে পেঁছিল স্টেশানে। রোজকার মত ব্যাগ খুলে পাউরুটির টুকরো বের করতে গিয়ে সীমা জিভ কাটল। কাল

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছে, তাই বিকেলের জলখাবার সে খায়নি, রুটিও তাই কেনা হয়নি।

এখন কি করা যায়। সর্দার দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে গেলেও সিগন্যাল পড়েনি। সীমা আবার ফিরল। সর্দার চলল তার পিছু পিছু। সেই চায়ের দোকান। হোক কালকের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত তবু ওখানেই ঢুকতে হবে তাকে। এত পথ এসেছে সর্দার, কিছু না দিলে সে এমনি চলে যাবে, কিন্তু সারাদিন সে নিজেই শান্তি পাবে না মনে। আজ খাবার না পেলেও কাল সর্দার ঠিকই তার সঙ্গ নেবে, কিন্তু নিজের আত্মীয়েরা পান থেকে চুন খসলেই ব্যাজার করে থাকবে মুখ। সীমা চায়ের দোকানের মুখেই কালকের সেই ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে বলল, রুটি আছে?

আছে, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

না ভেতরে যাবার দরকার নেই, এই নাও পয়সা, একটা রুটি দাও।

ছেলেটা ভেতরে ঢুকল। কারা যেন ভেতরে বসে আছে বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এসে বাজল একটি কথা, কালকের সেই রে। দেমাক দেখিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রি ত করে লজেন্স, তার আবার প্রেস্টিজ কত। একখানা রুটি চিবিয়ে তো বাবা কাটাবে সারাদিন। ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কানটা গরম হয়ে উঠল সীমার। নিশ্চয় কালকের সেই কারখানাফেরত লোকগুলো। আজ কারখানায় যাবার আগে এখানে চায়ের আড্ডায় বসেছে। কিন্তু কি করে এরা জানল যে লজেন্স বিক্রি করে তার দিন কাটে। এরা সব জানে। পাড়ার পান দোকান থেকে রাস্তার চায়ের দোকান, প্রতিটি লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। সত্যি বাহাদুরি দিতে হয় এদের।

রুটি নিয়ে এল ছেলেটা। কি মনে করে তার হাত থেকে সীমা আর ফেরত পয়সাগুলো নিল না। এবার সে দোকানের দিকে পেছন ফিরে টুকরো টুকরো করে রুটিটা ছড়িয়ে দিলে পথে। সর্দার তাই কুড়িয়ে খেতে লাগল। সীমা হনহন করে হেঁটে চলল স্টেশানের পথে। সে জানে, যতক্ষণ সর্দার ছড়ানো টুকরোগুলো কুড়িয়ে খাবে ততক্ষণ দোকানের ভেতর বসে লোকগুলো তাই দেখবে। সীমা পথ চলতে চলতে এই মুহূর্তে কেমন একধরনের আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। ট্রেনে বসে বসে কত কথাই মনে পড়ে যায় সীমার! আজ কেন জানি না বিপিনবাবুর কথাটা তার মনে পড়ে গেল।

মাঝে মাঝে দুপুরের অবসরে সীমা প্রুফ দেখার একটা কাজ করত। একটি ছোট প্রেসে সে একদিন নিজেই ঢুকে পড়েছিল। বলেছিল, কিছু কাজ দিতে পারেন?

প্রেসের মালিক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। পরে একটু সামলে নিয়ে বলেছিলেন, কি কাজ জানেন আপনি, কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা?

না ওগুলোর কোনটাই আপাততঃ জানি না, তবে শিখে নিতে পারব।

সপ্রতিভভাবে কথাগুলো বলে গিয়েছিল সীমা।

হেসে বলেছিলেন মালিক ভদ্রলোক, আগে শিখে আসুন, তারপর কাজের

খোঁজ করবেন।

সীমা বলল, শেখার সুযোগই যদি না পেলাম তাহলে আর খুঁজব কি করে।

একটু থেমে তারপর বলেছিল, দিন না আমাকে একটু শেখার সুযোগ। আমি শেখার সময় নিশ্চয় কোন পারিশ্রমিক আপনার কাছ থেকে চাইব না।

ভদ্রলোক সীমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেছিলেন, পড়াশোনা?

সীমা কথাটার জবাব ঘুরিয়েই দিয়েছিল, প্রুফের ঠিক বানানগুলো কেটে তার জায়গায় আমি ভুল বানান বসিয়ে দেব না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ভদ্রলোক তাঁর নাকের নীচে ঝুলে পড়া চশমার ওপর দিয়ে আর একবার সীমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে আশপাশের কোন বাবুর নাম ধরে ডেকেছিলেন। পাশের ধুলোকালিভরা একচিলতে ঘরের ভেতর থেকে সেই বাবুটি একটি খোলা কলম হাতে বেরিয়ে এলেন। সীমা দেখল ভদ্রলোকের দশা তার চেয়েও করুণ। সত্তর আশী টাকা মাইনের অতি কনিষ্ঠ মাছিমারা কেরানীর মত অবস্থা। কোনমতে কণ্ঠাক্লিষ্ট প্রাণখানা যেন বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন।

সীমাকে দেখিয়ে মালিক বললেন, ইনি কাজ শিখতে চান। আপনি এঁকে টিফিনের ফাঁকে কোন একটা সময়ে একটু একটু করে প্রুফ-রিডিংএর কাজটা শিখিয়ে দেবেন।

ব্যস্। সেই থেকে সীমা ঐ প্রেসে দুপুরের দিকে যেতে শুরু করল, আর ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষাগুরুটি সীমাকে প্রুফ-রিডিংএর কাজ শেখাতে লাগলেন। কিছুদিনের ভেতর সীমা কাজটা নিখুঁতভাবে শিখে ফেলল। সীমাকে যিনি কাজ শেখাতেন সেই দরিদ্র ভদ্রলোকটির নাম ছিল বিপিনবাবু। লেখাপড়া খুব একটা জানা ছিল না ভদ্রলোকের। কোনরকম কাজ চালাবার মত প্রুফ দেখতেন। অবশ্য তাতেই চলে যেত। প্রকাশকের বই কম্পোজ করে একটি প্রুফ দেখে দিতেন এঁরা। তাতে ভুল কিছু কম হত। আর এমনিভাবে কম্পিটিশানের বাজারে কাজ পাওয়ার কিছু সুবিধে হত।

সীমা প্রুফ দেখা শিখে নিয়ে বিপিনবাবুকে সাহায্য করতে লাগল। বিপিনবাবু সীমার কাছে তাঁর সংসারের দুঃখের কথা বলতেন।

জানো মা, তোমার মত আইবুড়ো দু'দুটি মেয়ে আমার। লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই, বাপের গলগ্রহ হয়ে আছে। এই ক'টা টাকায় কি মা সারা মাস চলে।

মেয়েদের কিছু হাতের কাজ, সেলাই বোনাও তো শেখাতে পারেন, তাতে কিছু রোজগারও হয়।

সেলাই, কাটাই শেখাতে গেলেও তো টাকা চাই মা। এমনিতে তো কেউ শিখিয়ে দেবে না।

তাহলে এক কাজ করুন না, ওদের কিছু লজেন্স কিনে দিন, আর তাই

ওরা বেচুক স্কুল কলেজে গিয়ে। ওতে মোটামুটি কিছু রোজগার হতে পারে। একেবারে বসে থাকার চেয়ে ভাল।

হেসে উঠলেন বিপিনবাবু, কি বলছ তুমি, লজেন্স বিক্রির কাজ! গরীব হতে পারি মা তাবলে বামুন বাড়ির মেয়ে অত নীচু কাজ করতে পারবে না। সেলাই ফোঁড়াই একরকম, আর লজেন্স বিক্রির কাজ হল অন্য। ওতে মান পেরেস্টিজ বলে কিছু থাকে না।

সীমা সেদিন আর কিছু বলেনি বিপিনবাবুকে। শুধু তার মনে হয়েছিল, বিপিনবাবুর মত ডান হাত বাঁ হাতের লোকেরাও লজেন্স বিক্রির কাজকে কত হীন চোখেই না দেখে!

সীমাকে বিপিনবাবু কিন্তু খুব খাতির করত। সীমা বিপিনবাবুর হাতের কাজ হালকা করে দিত। জীর্ণ প্রৌঢ় মানুষটিকে দেখে সীমার অনেক সময় কষ্ট হত। সে দেখত, একখানা আধপোড়া রুটি, কোনদিন একটা কাঁচা লংকা, কোনদিন বা একটুখানি তেঁতুল দিয়ে বিপিনবাবু জলযোগ করছেন। মাংসহীন চোয়ালটা ওঠা নামা করত। বিপিনবাবু যখন ঐ রুটির একটুখানি টুকরো চিবুতেন তখন তাঁর চোখে মুখে একটা ভয়ংকর বুভুক্ষার ছবি ফুটে উঠত। প্রুফ দেখার ফাঁকে সীমা সে ছবিখানা দেখে মনে মনে কষ্ট পেত। খাওয়া শেষ হলে বিপিনবাবু একটা ময়লা এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে অন্ততঃ তিন গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেলতেন। যেদিন রুটির সঙ্গে এক ডেলা গুড় জুটত সেদিন বিপিনবাবুর মুখে চোখে সে কি আলোর জোয়ার। সেদিন বিপিনবাবু তাঁর বাপ ঠাকুর্দার কথা তুলতেন। তাঁর কোন্ পঞ্চম পূর্বপুরুষ নাকি জমিদারী সেরেস্তার হেড খাজাঞ্চীবাবু ছিলেন সে কথাও সবিস্তারে বলতে ভুলতেন না।

এহেন বিপিনবাবুকে একসময় বিপদে পড়তে হল। আর বিপদটার জন্যে পরোক্ষভাবে সীমাই হল দায়ী। সীমার প্রুফ-রিডিংএর কাজ যে নিখুঁত হচ্ছিল তা মালিকের চোখ এড়ায়নি। এতে প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু বেশী কাজ আর প্রশংসা জুটছিল তাঁর। সীমা ইদানীং কিছু কিছু করে কাজের পারিশ্রমিকও পাচ্ছিল। খাতিরও জুটছিল তার মালিকের কাছ থেকে।

মাঝে সপ্তাহ তিনেক অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেনি সীমা। তারপর এক দুপুরে প্রেসে ঢুকে দেখল মালিক নেই, কিন্তু বিপিনবাবু আছেন।

সীমাকে দেখে বিপিনবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে মা?

সীমা বলল, শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আসতে পারিনি।

বিপিনবাবু হঠাৎ উঠে গেলেন ঘর ছেড়ে। দরজার কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর ফিরে এসে নিজের হাতলভাঙা চেয়ারখানায় বসে পড়ে বললেন, তোমাকে মা বলে ডেকেছি, একটা কথা নির্ভয়ে বলব?

সীমা বলল, আমার কাছে কথা বলবেন তাতে ভয়-ভাবনার কি আছে। আপনি সোজাসুজিই বলুন।

চাকরিটা বুঝি আর আমার থাকে না মা।

বিপিনবাবুর গলা যেন বন্ধ হয়ে এল এই ক'টা কথা বলতে গিয়ে।

সেকি, এতদিনের চাকরি, হঠাৎ চাকরিটা চলে যাবার কি কারণ ঘটল!

বিস্ময় আর দুঃখে অভিভূত শোনাল সীমার গলা।

বিপিনবাবু বললেন, বুড়ো হচ্ছি মা, চোখে জল গড়ায়, করকর করে, ডাক্তার দেখাতে পারি না, তার ওপর শুদ্ধ করে প্রুফ দেখব কি করে বলো তো মা।

কেন, এতদিন তো এই চোখ নিয়েই একরকম করে দেখে যাচ্ছিলেন, কই চাকরি যাবার তো কোন কথা ওঠেনি।

সে তুমি ঠিক বুঝবে না মা। মালিকের আর আমার কাজ পছন্দ হচ্ছে না। কালকে নাকি একটি নামী প্রকাশক শুনিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাদের আর কাজ দেওয়া হবে না। এই দু'এক হপ্তার ভেতর কম্পোজ ম্যাটারে নাকি এত ভুল পাওয়া যাচ্ছে যাতে এ প্রেসে কাজ দেবার কোন মানেই হয় না।

একটু থামলেন বিপিনবাবু। তারপর সীমার আরও কাছে মুখটা সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, তোমার আসার আগে মা বরাবরই আমি প্রুফ দেখেছি। ঐ প্রকাশকের কাজ অনেকদিন ধরেই করছি। তখন তো এমন কথা ওঠেনি। আসল কথা কি জান মা, তোমার প্রুফ দেখার পর আর কারো কাজ কর্তার মনে ধরছে না।

সীমা কথাটা বুঝে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বিপিনবাবু বলে চললেন, আমি গোপনসূত্রে জেনেছি মা তোমাকে পাকাপাকি প্রুফ-রিডারের কাজটা দিয়ে আমাকে টাকা আদায়ের কাজে পাঠাবেন। মরে যাব মা, একেবারে মরে যাব। সারাদিন রোদ্দুরে জলে ঝড়ে প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হবে। খেটে মরব, একটা ভাল কথা জুটবে না। ওদিকে সব মুখ সেলাই করে বসে থাকবে আর এদিকে কর্তার কাছে মুখখিচুনি। এ ক'খানা হাড়ে কত সইবে মা।

সীমা বসে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বলল, আচ্ছা অধীরবাবু আসুন, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

বিপিনবাবু বললেন, আমি তোমাকে বলেছি যদি জানতে পারেন তাহলে এই দণ্ডেই আমাকে বিদেয় করে দেবেন। তার চেয়ে তুমি কিছু বল না মা, যা হবার হবে। টাকা আদায়, তাই সই। একেবারে চাকরি গেলে প্রাণে বাঁচব না মা।

সীমা বসে বসে প্রুফ দেখতে লাগল। তার মনে হল, বুঝি আর না এলেই ভাল হত। ইতিমধ্যে সে অসুস্থ বলে মালিককে একখানা চিঠিতে জানিয়েও ছিল। কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন দেখাটা না করে যাওয়া ঠিক হবে না।

মালিক অধীরবাবু এলেন। সীমাকে দেখে মনের খুশিটা লুকোতে পারলেন না।

অনেকদিন ধরে আসছেন না তাই বড় চিন্তায় ছিলাম। আপনার চিঠি

পেয়ে জানলাম অসুখে পড়েছেন। তা এখন থেকে কাজ করতে পারবেন তো? আর ভাবছি, আপনাকে হোল টাইম প্রুফ-রিডারই করে নেব। বিপিনবাবু থাকবেন আদায়ের কাজে।

সীমা বলল, আপনার দয়ার কথা কোনদিনই ভুলব না। তবে আমার বুঝি আর কাজ করা হবে না।

সীমা গলায় এমন হতাশার সুর ঢেলে বলল যে মালিক অধীরবাবু চমকে উঠলেন, কেন, কেন?

অসুখটা আমার চোখেরই। ডাক্তার বলেছেন, এ অসুখ হঠাৎ করে আমার সারবেও না। সে কথা জানাতেই আজ আপনার কাছে আসা। কিন্তু যদি একটু দয়া করেন তাহলে আমার অনেক উপকার হয়।

অধীরবাবু হঠাৎ মুষড়ে পড়েছিলেন, একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, কি বলুন, অসাধ্য না হলে করতে চেষ্টা করব।

আপনি বিপিনবাবুকে আদায়ের কাজটা দিতে চাইছেন, ওটা কি আমাকে দিতে পারেন না?

আপনি করবেন টাকা আদায়ের কাজ! পারবেন?

না পারার কি আছে বলুন। ঘোরাঘুরিই তো আমার কাজ।

হাসলেন অধীরবাবু, এ শুধু ঘোরাঘুরির কাজ নয়।

একটু থেমে বললেন, বক দেখেছেন? না, আকাশ দিয়ে যে বক উড়ে যায় আর আপনারা কাব্যি করেন, সে বক নয়। জলার ধারে একটি পা তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে যে বক, সেই বক। টাকা আদায় হল সেই বকের কাজ। টাকা থাকলেও সহজে কেউ তা ট্যাঁক থেকে বের করবে না। অসীম ধৈর্যে আপনাকে বসে থাকতে হবে। কোনদিন জুটবে, কোনদিন জুটবে না। তবু দেঁতো হাসি হেসে নমস্কার করে বলতে হবে, দয়া করে বলুন, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সীমা বলল, একবার কাজটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন, না পারলে আপনার বিবেচনা মত ব্যবস্থা করবেন।

সেই ব্যবস্থাই হল। আপাততঃ বিপিনবাবু পুরোনো পদেই বহাল রইলেন। সীমা নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাগাদায় বেরোতে লাগল। প্রথম প্রথম দু'একটা জায়গায় ভদ্রমহিলা দেখে কর্মচারীরা বিলপত্র তাড়াতাড়ি পাস করে দিলে। কিন্তু গোল বাধল অধীরবাবুর এক বড় পার্টির কাছে। তারা সারা বছর কাজ যোগায় কিন্তু পেমেণ্টের বেলায় শম্বুকগতি। ও পার্টিকে উগরোনোও যায় না, গেলাও যায় না।

সীমা প্রথম দিন তাগাদায় যেতেই প্রকাশক ভদ্রলোক হাঁ করে কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন জীবনে এই প্রথম মেয়েমানুষ দেখছেন। তারপর গলায় অদ্ভুত সুর তুলে বললেন, শেষে অধীরবাবু প্রকাশক নিধনে প্রমীলা সৈন্য নিয়োগ করলেন?

হাহা হাহা করে সে কি হাসি লোকটির। শেষে বললেন, আসবেন,

আসবেন, শত্রুভাবে নয় মিত্রভাবে। পাবেন, তবে ঘনঘন তাগাদা মেরে লাভ নেই। আমাকে বাঁচতে দিন, তবে আপনারাও বাঁচবেন।

দু'তিনবার ধৈর্যের সঙ্গে সীমা এই লোকটির সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু শেষে একদিন ধৈর্যের সীমা আর রাখা গেল না।

তখন পুজো আসি আসি করছে। অধীরবাবুরও টাকার বিশের দরকার। তাই ঘনঘন তাগাদায় পাঠাচ্ছেন তিনি। সীমা সেই বিশেষ প্রকাশকটির কাছে যেতেই তিনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, টাকা কি গড়ের মাঠের গাছে ফলে যে আঁকশি দিয়ে টানলেই ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। অধীরবাবুকে বলবেন. তাঁর বাপ মা নামটা রেখেছেন সার্থক। তবে এও বলে দেবেন, ঘনঘন তাগাদায় কাজ হয় না।

সীমা অধৈর্য হয়েই বলল, ভদ্রলোকের নাম নিয়ে কথা বলছেন কেন, দয়া করে বলে দিন আবার কবে আপনার কাছে আসব ?

ফোঁস করে উঠলেন প্রকাশক, কথা বলে এই শর্মার কাছ থেকে পার পাবে না কেউ, কথা বেচেই খাই আমি। তা ভালমানুষের মেয়ে বলেই তো মনে হত আপনাকে। এখন দেখছি চক্করও আছে।

সীমা বলল, ওসব আজেবাজে কথা রাখুন, কোন্ সময় নাগাদ পাওনাটা দিতে পারবেন শুধু সেই কথাটাই আমাকে বলে দিন।

দেখুন সময় কারো বাবার চাকর নয় যে ডাকামাত্রই এসে হাজির হবে। যেদিন দয়া করে সুসময় আমার ভাগ্যে এসে উদয় হবেন, সেদিনই অধীরবাবু তাঁর পাওনাটা পেয়ে যাবেন।

সীমা উঠে আসছিল, পেছন থেকে ভদ্রলোক ডাক দিলেন, শুনুন।

সীমা ফিরল।

লেখকদের আমরা দুইয়ে খাই, আর আমাদের আপনারা দুইয়ে খান। বলবেন অধীরবাবুকে, বাজার মন্দা। বই কাটছে, তবে সেটা পোকায়। লেখকদের বাঁটে দুধ নেই, শুধু জল। তাই এখন আমাদের দুইতে এলেই কেবল জল পাবেন, আসল মাল পাবেন না।

সীমা একটিও কথা না বলে চলে এসেছিল। অধীরবাবুর কাছে এসে হুবহু ঐ কথাগুলো বলেছিল। তাতে অধীরবাবু সীমাকেই দোষী করেছিলেন।

সীমা বলেছিল, আমার মনিব বলুন যাই বলুন আপনি। কর্মচারীর কাছে মনিবের নাম ধরে কেউ গালমন্দ করলে সেটা কোন কর্মচারীরই সহ্য করা উচিত নয়।

অধীরবাবুর এবার সত্যিই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ জন্যেই মেয়েদের এ কাজে পাঠাতে চাই না। প্রেস্টিজ বড় টনটনে আপনাদের। পার্টি জুতো মারলে সে জুতো আমাদের বাঁধিয়ে রেখে দিতে হয়, জানেন। সে হল লক্ষ্মীর জুতো, মাথায় ঠেকিয়ে পুজো করতে হয়।

সীমা বলল, আপনি পুজো করুন, আমার দ্বারা এ কাজ আর হবে না।

এই রইল আপনার বিল, তাগাদার কাগজপত্র। আমি চললুম।

তা যান, কিন্তু আমার পার্টিটাকে বিগড়ে দিয়ে গেলেন তো।

সীমা কোন কথা না বলে দু'হাত তুলে নমস্কার করে পথে বেরিয়ে এল। ঘৃণায় তার সারাটা শরীর রী-রী করছিল। সন্ধ্যার আলো জ্বলে গিয়েছিল পথে। সীমার মনে হচ্ছিল, এখন একটু অন্ধকারের নির্জনে হাঁটতে পারলে ভাল হত। লোকজনের সঙ্গ সেই মুহূর্তে সে যেন আর সহ্য করতে পারছিল না।

কিছু পথ এগিয়ে এসেছিল সীমা, পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন ডাকলে।

সীমা ফিরে দাঁড়াতেই দেখল বিপিনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছেন। কাছে এসে বিপিনবাবু বললেন, মা, কি সব্বোনাশটাই না হয়ে গেল!

সীমা বলল, কেন কি হয়েছে?

কি হয়েছে! চাকরিটা গেল। আর এজন্যে আমিই হলাম দায়ী।

সীমা ম্লান হেসে বলল, আপনি দায়ী হতে যাবেন কেন, আমি নিজেই তো ছেড়ে দিলাম।

না মা না, এ বলে ছেলের দোষ তুমি ঢাকতে পারবে না। প্রুফ-রিডিংএর কাজটা আমার জন্যেই তো তুমি ছাড়লে মা। ওটা থাকলে আজ তোমার চাকরি ছাড়ায় কে!

সীমা বলল, আপনি নিজেকে অপরাধী ভাববেন না, তাতে জানবেন আমারই অসোয়াস্তি। আমি মনে-প্রাণে অধীরবাবুর কাজ থেকে রেহাই পেতে চাইছিলাম।

বিপিনবাবু বললেন, তাহলে সংসার তোমার কি করে চলবে মা?

লজেন্স বিক্রি করে।

এ তোমার অভিমানের কথা হল মা।

সীমা বলল, একদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার মেয়েরা লজেন্স বিক্রি করতে পারে। আপনি সেদিন আমার কথায় মনে মনে দুঃখই পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ সত্যি করে বলি, লজেন্স বেচে পয়সা রোজগার করাই আমার কাজ।

বিপিনবাবু কোন কথা না বলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সীমা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল।

আজ ট্রেনে বসে সেই পুরোনো ছবিগুলোই তার মনে পড়ছিল। একটু আগে সে চায়ের দোকানের ছোকরাগুলোকে বলতে শুনেছিল, লজেন্স বিক্রি করে, তার আবার দেমাক। ঠিক ওভাবে না বললেও বিপিনবাবুর মত লোকও লজেন্স বেচে পয়সা রোজগার করাটাকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন।

মনে মনে হাসল সীমা। তাকে বাঁচতে হবে! আগে বাঁচুক তো সে যেমন করে হোক, তারপর ভাববে, কেমন করে বাঁচা যায়।

সীমা রোজকার মত লজেন্স বিক্রি করল, তারপর দুপুরের দিকে গিয়ে দাঁড়াল একটি ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল কপাট।

ভেতরে কোন একটি পার্টির মিটিং চলছিল। একটি ভদ্রলোক উঠে এসে সীমাকে পাশের একটি রুমে নিয়ে গেলেন। খসখস করে একটা চিঠি লিখে সীমার হাতে দিয়ে বললেন, হেডমিস্ট্রেসের হাতে এটি দিও। খুব অসুবিধে না হলে তিনি চাকরিতে তোমাকে বহাল করবেন।

সীমা চিঠি নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক তাকে ডেকে বললেন, শোন সীমা, দু'একটা কথা আছে।

সীমা কাছে এল।

ভদ্রলোক সীমাকে বললেন, তুমি তো কলেজ, ইউনিভারসিটির ছেলে-মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে বেড়াও, আমাদের একটা কাজ করে দিতে পারবে ?

বলুন কি কাজ ?

আমাদের এই নতুন পার্টির কিছু প্রচারপত্র ঐ সঙ্গে যদি বিলি করে দাও।

সীমা বলল, ও কাজ পারব না অরিন্দমদা, মাপ করবেন। অন্য কিছু বলুন।

ভদ্রলোক একটু ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, কেন পারবে না বল ?

সীমাও কঠিন হল, আমি যে পার্টি সম্বন্ধে কিছু জানি না তার কাজ করব কি করে। আর তাছাড়া আপনি তো জানেন কোন পার্টিরই ভেতর নেই আমি।

অরিন্দমবাবু বললেন, পড়ে দেখো আমাদের প্রচারপুস্তিকাগুলো। আমাদের আদর্শ একদিন তোমারও আদর্শ হয়ে যাবে।

সীমা বলল, মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। আপনাদের পার্টির নীতি যে খুবই পরিচ্ছন্ন সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই নেই। তবে এর পরেও আমার একটি কথা থেকে যায়।

কি কথা বল ?

আমি কৌতূহলে অনেক পার্টিরই প্রচারপুস্তিকা পড়ে দেখেছি। সেগুলির যুক্তি এমনি অকাট্য যে আমি তা চেষ্টা করেও খণ্ডন করতে পারিনি। যে-কোন এক পার্টির বই পড়ি, আর মনে হয়, এরাই তো ঠিক কথা বলছে। এখন বলুন, খারাপ ভালর বিচার করি কি করে ?

অরিন্দমবাবু বললেন, কাজ দেখে বিচার করতে হবে।

সীমা বলল, অরিন্দমদা, একটা কথা বলি, প্রতিটি দলই নিজের পথে কাজ করে যাচ্ছে। কাউকে ছোট কাউকে বড় করে দেখার বুদ্ধি এখনও আমার হয়নি। সশস্ত্র বিপ্লব আর অহিংস বিপ্লব দুটো পথেই হয়ত দেশকে উন্নত করা যায়, কিন্তু পরস্পরে যদুবংশধরদের মত মারামারি করে যদি মরে তাহলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

সে তুমি বুঝবে না সীমা। জীবজগতের নিয়মই হচ্ছে 'Survival of the fittest'. অর্থাৎ শক্তিমানেরাই টিকে থাকবে শেষ অবধি।

তা থাকুক, আপত্তি নেই আমার, এখন আমার বাঁচার একটু পথ আপনি

করে দিন।

যাও, চিঠি তো দিয়ে দিলাম। তবে ভেবে দেখ আমার প্রস্তাবটা। তোমার বাবা আমার মাস্টারমশায় ছিলেন, স্নেহ করতেন, তাই তোমার ওপরও আমার একটা দাবি রয়ে গেছে।

সীমা মাথা নীচু করে সেখান থেকে চলে যাবার আগে বলল, যদি কোনদিন মনের থেকে এ কাজে সাড়া পাই তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন আপনার আদেশ মাথা পেতে নেব অরিন্দমদা।

চলে এল সীমা। আজ 'ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যায়তনে' শিক্ষিকা নেবার জন্য ইনটারভিউ। সীমা আগে থেকেই আবেদনপত্রখানা পাঠিয়েছিল। অরিন্দমবাবুর বিশেষ পরিচিত এই হেডমিস্ট্রেস। তাই চিঠি একখানাও সঙ্গে নিয়েছে সে। ইস্কুলের গেট দিয়ে ঢুকে সে বরাবর হেডমিস্ট্রেসের ঘরের দিকে পা চালাল। সামনেই দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ইনটারভিউ আপনার, তবে ঐ পাঁচ নম্বর ঘরে গিয়ে বসুন।

আমি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এখন তো দেখা হবে না। উনি ব্যস্ত রয়েছেন।

আমার ইনটারভিউ আছে, কিন্তু একখানা চিঠি হেডমিস্ট্রেসকে দিতে হবে।

তিনি বলে দিয়েছেন, ইনটারভিউ যাঁদের আছে তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না এখন। তবে চিঠিখানা দিন, আমি তাঁকে দিয়ে আসছি।

সীমা দারোয়ানের হাতে অরিন্দমবাবুর লেখা চিঠিখানা দিয়ে দিল।

ওদিকে হেডমিস্ট্রেস সুহাসিনী দেবী দারোয়ানের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন। ফোনটা বেজে উঠল। সুহাসিনী দেবী ফোন তুললেন। ওপার থেকে অরিন্দমবাবু কথা বলছিলেন।

সুহাসিনী দেবী,—হ্যালো, অরিন্দম, কি ব্যাপার, নতুন রিক্রুট নাকি?

অরিন্দম,—চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এখনও বঁড়শির নাগালের বাইরে।

তুমি তো দেখছি একপাতা প্রশংসাপত্র লিখে পাঠিয়েছ।

ওকথা থাক। সামনে এলে সবার মন যোগাতে হয়। তাই তো ফোন করতে হল। ইমপরটেন্স দেবার কোন দরকার নেই। বুঝে শুনে নিও কাউকে, যাকে দিয়ে পার্টির কাজ চলতে পারে।

অত কাঁচা কাজ আমি করি না অরিন্দম, তেমন ক্যাণ্ডিডেট যোগাড় না করে কি এমনি ইনটারভিউ ডেকেছি। আচ্ছা, তাহলে ছাড়ছি।

অরিন্দম,—হাঁ শোন, একটা কথা বলে রাখি, মেয়েটার রেজাল্ট খুবই ভাল। ওকে কোশ্চেন করে ঠেকান দায় হবে। ইনটারভিউ বোর্ডের অন্যান্যদের মত ফিরে যেতে পারে।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। কাজ হাসিল আমি ঠিকই করে নেব।

ইনটারভিউতে প্রথমেই ডাকা হল সীমাকে। সীমা ভাবলে চিঠিতে কিছু কাজ হয়েছে।

সে নমস্কার করে ইনটারভিউ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

হেডমিস্ট্রেস একখানা নির্দিষ্ট চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

সীমা বসল।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আপনার কোয়ালিফিকেশন যা দেখছি তাতে আমাদের বলার কিছু নেই।

সেক্রেটারী, যিনি টাকার জোরে এই পদে বহাল রয়েছেন, তিনি হেড-মিস্ট্রেসের কথার মাঝেই বলে বসলেন, আচ্ছা বলতে পারেন এর মানে,

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে।'

সীমা বলতে শুরু করল, দুঃখকে ভয় পেলে চলবে না। দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মনের শক্তি বাড়বে, তখন সুখ লাভ করা খুব কষ্টকর হবে না। আগে চাই দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি।

সেক্রেটারী উচ্ছ্বসিত হলেন, ঠিক কথা, যথার্থ কথা।

হেডমিস্ট্রেস দেখলেন সেক্রেটারীর মন ভিজেছে, অমনি তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

আচ্ছা দেশের ধনীদের সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই কিছু একটা ধারণা আছে। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু যদি বলেন।

সেক্রেটারী একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তিনি এ অঞ্চলের জমিদার।

সীমা বলল, সত্যি কথা বলতে কি নিজের সংসার চালানোর চিন্তায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ধনীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাববার সুযোগ পাই না। তবে এটুকু বলতে পারি, তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে খুব বেশী বুদ্ধিমান। অবশ্য সে বুদ্ধির বেশীর ভাগই দুষ্টুবুদ্ধি।

সেক্রেটারী যে মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত আগে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, এবার অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস আবার বললেন, জোর করে জমিদারের কাছ থেকে জমি কেড়ে দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার যে হিড়িক পড়েছে, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

দেখুন আমি বাংলার ছাত্রী। আর বাংলা পড়াবার জন্যেই আপনারা শিক্ষিকা চান। এ প্রশ্নগুলো ভূমিনীতি বা অর্থনীতির প্রশ্ন।

একটু থেমে সীমা বলল, তবু এ সম্বন্ধে আমার সাধারণ জ্ঞান যা বলে তাতে মনে হয়, ওভাবে ভূমিহীনদের ভেতর জমি বিলি করে দেওয়া ঠিক নয়।

সেক্রেটারী আবার উৎসাহিত হলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন।

হেডমিস্ট্রেস ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, কেন বলুন?

সীমা বলল, জমিদারের জমি কেড়ে নিন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যে মানুষগুলো জমি পেয়ে গেল, তাদের পাওয়াগুলো লটারীর টাকা পাওয়ার মত হয়ে গেল যে।

আপনি তাহলে কিরকম সমাধান করতে চান?

সরকার সব জমির ভার নিন। কৃষক দিয়ে চাষ করিয়ে তাদের পরিশ্রমের

উপযুক্ত মূল্য দিন।

হেডমিস্ট্রেস সেক্রেটারীর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, কিন্তু এই জমিদারদের তাহলে কি হবে? তাঁরা তো আর নিজের হাতে চাষ করতে পারবেন না।

তাঁরা যে ধরনের কাজ পারেন, সরকারকে মোটামুটি সেই ধরনের কিছু কাজে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে। সোজা কথা বসে বসে অনেক পাওয়ার লোভ ছাড়তে হবে, খেটে খেতে হবে।

সেক্রেটারী মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস শেষ প্রশ্ন করলেন, এর আগে কাজের কি এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার?

আমি কোন স্কুলেই আগে চাকরি করিনি।

কোনকিছু কাজ করেন না আপনি?

আগে টিউশনি করতাম।

ওটা অভিজ্ঞতার কোন কোয়ালিফিকেশন নয়। আমি বলছি, এখন সংসার চালান কি করে? দরখাস্তে দেখছি, আপনার একার ওপরে সংসার নির্ভর করছে।

আজ্ঞে হাঁ। আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজের মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে বেড়াই।

ঘরে যেন বোমা পড়লেও এতখানি চমক লাগত না। ইনটারভিউ বোর্ডের সবাই বড় বড় চোখ করে তাকিযে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আই সি। আচ্ছা এখন আপনি আসতে পারেন।

সীমা নমস্কার করে চলে আসতে আসতেই শুনতে পেল, হেডমিস্ট্রেস বলছেন, যে মেয়ে লজেন্স বিক্রি করে সে কর্মী হতে পারে, কিন্তু আদর্শবাদী হতে পারে না। শিক্ষকের প্রধান গুণ হবে আদর্শ, উচ্চ আদর্শ। আদর্শ উচ্চ না হলে ছেলেমেয়েরা শিখবে কি! লজেন্স বিক্রি হবে আমাদের মেয়েদের আদর্শ। হোপলেস।

সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেসের কথায় জোরে জোরে মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগলেন। মেয়েটির জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে কথাগুলো তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি।

সীমা আবার সেই পথে। ক্ষীণ আশার যে আলোটুকু দেখছিল তা হঠাৎ নিভে গেল। আজকাল কাজে বড় ক্লান্তি এসেছে তার। যে স্বাধীন কাজের প্রেরণা থেকে সে লজেন্স বিক্রি করাকে হীন চোখে দেখেনি, আজ সকলের কাছ থেকে ঘৃণা কুড়োতে কুড়োতে সে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু পা চালাতে হয়। ভোরের ট্রেনের বাঁশি বাজে। দৈনন্দিনের কাজ শুরু হয় তার।

সেদিন সে চলছিল পথে। ভোরবেলা, তখনও লোকজনের তেমন সমারোহ ছিল না। বাস ট্রামও পথচারীদের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি।

সীমা।

মেয়ে গলায় কে যেন ডাকলে।

পেছন ফিরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সীমা আবার সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় পাশের একটা চায়ের দোকান থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে তাকে প্রায় টানতে টানতে দোকানের ভেতর নিয়ে গেল।

বোস, চিনতে পারলি না তো ?

উগ্র প্রসাধন করা মেয়েটিকে সত্যিই প্রথমে সে চিনতে পারেনি। একরকম হকচকিয়ে গিয়েছিল।

তারপর স্মৃতিতে যখন এল, তখন হেসে বলল, লোপামুদ্রা না ?

চিনতে পারলি তাহলে। তবে এখন আর এতবড় নামটা নেই। কেউ বলে লোপা, আবার কেউ বলে মুদ্রা।

সীমা বলল, বলে দে আমি কি বলে ডাকব।

তুই লোপা বলেই ডাকতে পারিস, কিন্তু আজকাল আমার মুদ্রা নামটাই পছন্দ।

হেসে বলল, মুদ্রা ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার।

একটু থেমে আবার বলল লোপামুদ্রা, জানিস আমার অফিসের অন্য মেয়েরা আড়ালে আমায় বলে 'মুদ্রারাক্ষস'। স্রেফ জেলাসী। এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার মুখার্জী সাহেব আমার কাজ ভালবাসেন, তাই তাঁর ঘরে আমার ঘনঘন ডাক পড়ে, এই হয়েছে ওদের জ্বালার কারণ। আচ্ছা তুই বল সীমা, টাকা ছাড়া কি এক পাও চলা যায় দুনিয়ায় !

সীমা একটা সম্মতিসূচক হাসি হাসল।

বেয়ারা, দু' কাপ চা, দুটো ডবল ডিমের অমলেট।

সীমা অমনি বারণ করলে, না ভাই আমি কিছু খাব না।

সে কি রে, নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরছি সবে, কিছু টাকাও পেয়েছি উপরি, তার ওপর বহুদিনের বন্ধুকে দেখলাম, একটু সেলিব্রেট করতে দিবি না !

সীমা বড় বেশী সাবধানী। জীবনে একটি দিনের জন্যেও সে উৎসব করতে চায় না। একদিন কোনকিছু ভালমন্দ খাওয়া কিংবা ভালমন্দ দেখার মাসুল দিতে হয় অনেক। ঐসব ভালকিছুর ছোঁয়া লাগে মনে, মাঝে মাঝে সেই ছোঁয়া তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চায়। আর তা ছাড়া যে একদিন তাকে কিছু দেয়, অন্যদিন তার কাছেও থাকে তার পাওনা। সে পাওনা শোধ দিতে না পারলে জাগে অকারণ মনঃক্ষোভ। তাই সীমা এসব লেনদেনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়।

তবু লোপামুদ্রার আমন্ত্রণকে সে একেবারে উপেক্ষা করতে পারল না। বলল, কিছু মনে করিসনে ভাই, এখন খেলে আমার সইবে না, অমলেট তুই খা, আমি বরং চা-টা খাব।

অগত্যা তাই হল। একটা অমলেটের অর্ডার কাটা হল।

লোপামুদ্রা বলল, এখন বল তোর কথা।

সীমার সঙ্গে কলেজে পড়েছে লোপামুদ্রা। বি-এ পাসের আগেই কলেজ

ছেড়েছিল। তখন লোপামুদ্রার অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তবে যা ছিল ওর, তা অনেকেরই থাকে না। তাকানোর ধরন আর কথা বলার কায়দা অনেককেই আকৃষ্ট করত। তখন শাড়ির বাহার কিংবা প্রসাধনের চাকচিক্য কোনটাই ছিল না ওর। এখন সেটাও উগ্রভাবে ওর স্বভাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সন্দেহ নেই, লোপামুদ্রা ঐ জোরেই এখন দিগ্বিজয় করে ফিরছে।

সীমা লোপামুদ্রার কথার উত্তরে বলল, এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

লোপামুদ্রা কপালে চোখ তুলে বলল, সে কি রে, চাকরিবাকরি।

হেসে বলল সীমা, একটা চাকরি করি,—লজেন্স বিক্রি। কিছু কমিশন পাই।

লোপামুদ্রার চোখ বিশেষ একটা মুদ্রায় স্থির হয়ে রইল। একসময় বলল, এই কাজ! পড়াশোনা কদ্দুর চালিয়েছিলি?

এম-এ পাস করেছি।

লোপামুদ্রা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, তাই এই দশা। যত বেশী পড়বি, চাকরি খোঁজার সময় তত কম পাবি। আমার মত হল, মোটামুটি একটা পাস দিয়ে নাও, তারপর গরু খোঁজার মত চাকরি খোঁজ। ব্যস।

তারপর একটুখানি থেমে সকরুণ একটা ধিক্কারের সুরে বলল, অন্ততঃ পাঁচ ছ'টা বছর পড়া আর পরীক্ষায় নষ্ট করলি। এই মহামূল্য দিনগুলো চাকরির খোঁজে কাটালে এতদিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত তোর। উচ্চশিক্ষার পোকা। একবার এ পোকা মাথায় ঢুকলে আর নিস্তার নেই। পুঁথির অক্ষরগুলোকে কেটে কুঁচিয়ে ঐ মগজের ভেতর ভরতে থাকবে। তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখবি তোকে পথে বসিয়ে মাথা ফুঁড়ে ওগুলো বেরিয়ে গেছে।

সীমা ওর কথা বলার ধরন দেখে হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। কি নির্মম সত্যগুলোকে ও অবলীলায় বলে যাচ্ছে। আজ পরীক্ষায় পাস না করেও লোপামুদ্রা সংসারের কঠিন যুদ্ধটায় জয়ী হয়েছে। সীমা লোপামুদ্রার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইল। ওর ঐ উগ্র প্রসাধন এখন আর সীমাকে পীড়িত করল না। ওর স্বচ্ছন্দ জীবনটা এই মুহূর্তে সীমার কাছে অনেক বেশী লোভনীয় বলে মনে হল।

পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে লোপামুদ্রার খুশি আজ যেন উপচে পড়ছিল। সে অনর্গল কথা বলে গেল। সীমা প্রায় নীরব শ্রোতার ভূমিকায় রইল। একসময় মনে হল, বড় কষ্ট হচ্ছে যেন তার। ঠিক বিয়েবাড়ির সানাই আর রোশনাইএর পাশ দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে কোন শবযাত্রা চলে গেলে যেমন মনে হয়।

সীমার আর ভাল না লাগলেও সে উঠতে পারল না। সে জানে কলেজের ফার্স্ট পিরিয়ড ওভার হয়ে গেছে। এখন তার লজেন্স বিক্রির সময়। তবু ঐ অজুহাতে সে লোপামুদ্রাকে ফেলে চলে যেতে চাইল না।

একটুখানি চুপ করে থেকে লোপামুদ্রা হঠাৎ বলল, অফিসে চাকরি করবি?

সীমার মনে হল, সে যেন দৈববাণী শুনছে।

কি বললি ?

কথাটা ভাল করে আর একবার শুনতে চায় সীমা।

যদি চাকরি করার ইচ্ছে থাকে তোর তাহলে ঝটপট একখানা দরখাস্ত লিখে ফ্যাল দেখি।

লোপামুদ্রা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দিলে। তাদের অফিসে এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের পি-এ নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে মিঃ মুখার্জী লোপামুদ্রাকেই নেবার পক্ষপাতী। তবু যাতে কোন দিকে কোন কথা না ওঠে সেজন্যে লোক-দেখানো এ্যাডভারটাইজমেণ্ট করে ইনটারভিউ নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লোপামুদ্রার কথা শুনে সীমা হেসে বলল, তুই যাবি যে পোস্টে সেখানে আমি ইনটারভিউ দিতে যাব কোন দুঃখে।

দেখ, সীমা, লেখাপড়া শিখেছিস, কিন্তু এখানটাতে তোর (সীমার মাথার বিশেষ একটা জায়গায় আঙুল তুলে দেখালে) এক ফোঁটা ঘিলু জমেনি। আরে তোর দরখাস্ত হবে পি-এর জন্যে। ইনটারভিউএর ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কিন্তু পোস্টটা আমারই হবে।

একটু থেমে লোপামুদ্রা বলল, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে, তাই না ? তবে আসল কথাটা শোন, আমি পি-এ হয়ে গেলে আমার পোস্টটা খালি পড়বে, তখন ঐ একই ইনটারভিউতে তুই যাতে আমার ছেড়ে আসা পোস্টটা পেয়ে যাস, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

হেসে বলল, মুখার্জী সাহেবের কাছ থেকে কাজ আদায়ের ভারটা আমারই রইল।

যন্ত্রচালিতের মত একখানা দরখাস্ত লিখে ফেলল সীমা। লোপামুদ্রার হাতে দিয়ে বলল, এ নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। তুই যা বুঝিস তাই করিস।

সীমা চলল কলেজে তার দৈনন্দিন লজেন্স বিক্রির কাজে। এ কাজ তাকে যিনি দিয়েছিলেন তিনি বুঝিয়েছিলেন, লজেন্স খেয়ে কেউ শরীর হঠাৎ খারাপ করে বসবে না। সুতরাং সেদিক থেকে ভাবনা নেই। তারপর আজকাল কলেজে পড়া মেয়েদের তিন ভাগ গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। তারা পাঁচটা পয়সা দিয়ে একটা লজেন্স বেশ কিছু সময় মুখে রাখতে পারবে। তাছাড়া অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাও লজেন্স খেতে ভালবাসে। তাই ব্যবসার দিক থেকে এর জুড়ি নেই।

সীমা তখন প্রায় কলের জল খেয়েই কাটাচ্ছিল। সে তাই লজেন্স বিক্রির প্রস্তাবটাকে অথৈ সমুদ্রে একটা ভেসে চলা কাঠের টুকরোর মত ধরে ফেলেছিল। ডুবে যেতে যেতে সে বেঁচেছে। যদিও সে এখনও ভরসাহীন সমুদ্রে ভেসে চলেছে তবু একেবারে তলিয়ে তো আর যায়নি। সীমা বাইরে কোথাও লজেন্স বিক্রি করে না, যা কিছু বিক্রি তার সবই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতর। সবকিছু হারিয়ে গেলেও কোথায় যেন তার শিক্ষাজগতের সঙ্গে একটুখানি যোগ থেকে গেছে।

কয়েকদিন পরের কথা। সীমা একখানা অফিসিয়াল খামের চিঠি পেয়ে খুলে দেখল, তাকে ইনটারভিউএর জন্যে ডাকা হয়েছে।

সীমার মনে আবার ক্ষীণ আশার আলো একটা জ্বলে উঠল। লোপামুদ্রা তাহলে মিথ্যে করে তার কাছ থেকে দরখাস্তখানা লিখিয়ে নেয়নি। যদি চাকরিটা নাও হয়, তাহলেও সে কৃতজ্ঞ থাকবে লোপামুদ্রার কাছে। কত দরখাস্তই তো সে পাঠিয়েছে কত জায়গায়, কিন্তু ক'টা ইনটারভিউতেই বা তার ডাক পড়েছে।

তারিখটা ভাল করে দেখে নিল সীমা। আগামী কাল দুপুর দু'টোয় ইনটারভিউ নেওয়া হবে তার। সীমা একটু চঞ্চল হয়েই পড়ল। কাপড়চোপড় আজ রাতেই কেচে ফেলতে হবে। কাল সকালে সে আর রোজকার কাজে বেরোবে না। অনেক কাজ তার ঐ সময়টুকুর ভেতর করে নিতে হবে। কাপড় ইস্ত্রি থেকে নিজেকে সম্ভবমত পরিপাটি করে তৈরি করে নেবার জন্যে যত রকমের ছোট বড় কাজ।

সীমা যথাসময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিকানা খুঁজে সে হাজির হল একটি নামকরা অফিসের সামনে।

এই যে আয়, তোকে রিসিভ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

লোপামুদ্রা হাসতে হাসতে এসে ওর হাত ধরল। তারপর সীমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে তোকে চিরদিনের মত চাকরি দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতাম। আর সে সুযোগ যখন নেই তখন পরের হাতেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

সীমা হাসল। হাসলে সীমাকে আরও সুন্দর দেখায়।

লোপামুদ্রা একটু থেমে বলল, এখন শোন, ঐ সামনের ঘরে গিয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে বোস। ডাক পড়লে যাবি মুখার্জী সাহেবের কামরায়। ইনটারভিউ হয়ে গেলে ভুলে যাবি না যেন। ঐ ঘরেই আবার ফিরে এসে বসবি। আমি এলে তবে উঠবি, তার আগে নয়।

সীমা বলল, তোর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, তুইই চাকরি দেবার আসল কর্তা।

লোপমুদ্রা চলে যেতে যেতে বলল, দেখ না কি হয়। আগে চাকরিটা হাতে আসুক, তারপর নাহয় ডাকিস কর্তা বলে।

যেখানে সীমারা বসে ছিল, তার পাশের ঘরটিই মুখার্জী সাহেবের। সামনে বসে আছে বেয়ারা। নাদুসনুদুস বেয়ারাটি বেশ মজার লোক। ইনটারভিউ আরম্ভ হতেই, সে এক একজনকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়। সীমা লক্ষ্য করল বেয়ারাটা আপাদমস্তক মেয়েটিকে দেখে নেয়। তারপর মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটিয়ে তোলে। কখনো বা তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে বলতে চাইছে, হবে না বাপু, মিছে মেহনত। আবার কখনো বা যেন বলতে চায়, দেখ চেষ্টা করে হলেও বা হতে পারে।

সবার শেষে এল সীমার ডাক। সীমা কৌতূহলের দৃষ্টি মেলে তাকাল

বেয়ারাটার দিকে। ওর মুখে একটা গদগদ ভাব ফুটে উঠেছে। মুখার্জী সাহেবের দরজার সামনে আসতেই ও হঠাৎ বলল, ভুলে যাবেন না যেন এই অধমকে। অধমের নাম ভোলানাথ কর্মকার। এইখানে পনেরটা বছর কেটে গেল। 'এলো গেলো' সব সাহেবদেরই আমি চিনি। হবে, মনে হচ্ছে আপনার হবে।

সীমা কোন কথা না বলে একটু হেসে ঘরের ভেতর ঢুকল। হাত জোড় করে নমস্কার করল। তখনও বোধকরি তার মুখে হাসির রেশটুকু লেগে থাকবে। মুখার্জী সাহেবের দৃষ্টি এড়াল না।

বসুন।

সামনের মুখোমুখি চেয়ারখানা দেখিয়ে দিলেন সীমাকে।

সীমা বসল। মিঃ মুখার্জী সুপুরুষই বলতে হবে। মুখ দেখে বয়সের আন্দাজ করা সম্ভব নয়। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের ভেতর বলেই মনে হয়।

সীমা বসলে মুখার্জী সাহেব কিছুক্ষণ নিজের ফাইলপত্রে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন। দু'এক জায়গায় সইও করলেন। দু'এক মিনিট মাত্র। তারপর সব কিছু বন্ধ করে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন সীমার দিকে।

সীমা মুখ নামাল।

মুখার্জী সাহেব হঠাৎ বললেন, আপনার বান্ধবীর কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। আপনার কথা বলতে গিয়ে মিস সেন তো পঞ্চমুখ। বেশ তাহলে কাল থেকেই কাজ বুঝে নিন।

সীমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

হাঁ, আর একটা কথা।

সীমা মুখার্জী সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখ মেলে।

দেখুন, দশটা পাঁচটা অফিসের সময় মেনে চললে আমার কাজ চলবে না। জরুরী দরকারে আপনাকে হয়ত অফিস আওয়ার্সের বাইরেও কাজ করতে হতে পারে। আবার কোনদিন কাজ না থাকলে আগেই চলে যেতে পারবেন। এসব সুবিধে অসুবিধের কথা বুঝে নিন, তারপর ··।

সীমা বলল, পরিশ্রম করার অভ্যেস আমার আছে। প্রায় রাত দশটায় কাজ সেরে আমি বাড়ি ফিরি।

মাই গুডনেস্! এ্যাতো রা—ত!

সীমা বলল, তিন বছর ধরে আমাকে তাই করতে হয়েছে স্যার।

বেশ, আমার এমনি লোকেরই দরকার।

সীমা এবার নমস্কার করে উঠল। মুখার্জী সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তিনি ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি, কাল তো ছুটির দিন, আর পরশু সানডে। আপনি এক কাজ করুন, একেবারে মানডেতে চলে আসুন, এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার সেইদিনই দিয়ে দেব। কাজও শুরু হবে আপনার সেইদিন থেকে।

মুখার্জী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করবার ভঙ্গীতে টেবিলের ওপার

থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সীমা হাত ধরল। একটুখানি ঝাঁকানি দিয়ে মিঃ মুখার্জী হেসে বললেন, উইশ ইউ গুড্ লাক্।

সীমা চলে এল ঘরের বাইরে। নিজেকে সে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না। বুকের পাথরখানা সরিয়ে কে যেন তাকে হালকা করে দিলে। সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল লোপার কথা। সে যে বসতে বলেছিল পাশের ঘরে। আবার উঠে এল ওপরে। সিঁড়ির মুখেই কিন্তু দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল লোপামুদ্রা।

কি রে চাকরি পেয়ে বন্ধুকে একেবারে ভুলে গেলি?

সীমা সত্যি লজ্জিত হল।

কিছু মনে করিসনে ভাই, খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

লোপা বলল, কেমন দেখলি বসকে?

আমার তো মনে হল খুব ভাল লোক।

দারুণ?

লোপামুদ্রা একটা চোখ কুঁচকে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল।

সীমা বলল, সে তুই জানিস, আমার তো এই কয়েক মিনিটের দেখা। মোটামুটি মানুষটিকে খারাপ লাগল না।

লোপামুদ্রা বলল, এখন তোর চাকরি প্রাপ্তি প্রায় নিশ্চিত, সুতরাং সিনেমা দেখাতে পারিস।

বল কবে দেখবি?

লোপা বলল, সেই তো আসবি তুই কতদূর থেকে। তাহলে রোববার ম্যাটিনি শোএর টিকিট কেটে রাখব লাইটহাউসে। সিনেমা দেখে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে তারপর বাড়ি ফিরব।

সীমা বলল, সব খরচটাই কিন্তু আমার।

এখন যা, সে দেখা যাবে পরে।

সীমার হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। সে বলল, হাঁরে, মুখার্জী সাহেব যে সোমবার আমাকে কাজে যোগ দিতে বললেন, তা কাজটা তোর পোস্টেই তো?

লোপা বলল, মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে সেরকম কথাই তো আমার হয়েছে। আমি প্রমোশান পাব ওঁর পি-এর পোস্টে, আর তুই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাবি আমার পোস্টে। অবশ্য আমরা দুজনেই থাকব মুখার্জী সাহেবের ডিপার্টমেণ্টে।

সীমা লোপামুদ্রার হাত ধরে বলল, কলকাতার পথের ওপর অনেক চোখের জল পড়েছে ভাই, আজ ভাবছি কোনকিছুই অকারণে যায় না। তোর কথা কোনদিনও ভুলব না।

সীমার গলাটা ধরে উঠল। মাথা নীচু হল। টপটপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ার আগেই সে আঁচল টেনে তা মুছে ফেলল।

আরে, তুই তো দেখছি ভারী সেণ্টিমেণ্টাল সীমা। জীবনে সুখদুঃখ দুটোকেই যে মুঠো করে ধরে রাখতে পারে সেই তো বাজি জেতে রে। আমার

জীবন দিয়ে তাই দেখছি সীমা।

একটু থেমে লোপামুদ্রা বলল, আজ আয় তাহলে। ভুলিস না রোববারের কথা। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

সীমা হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানাল সে আসবে।

নেমে গেল সীমা নীচে। লোপামুদ্রা তাকিয়ে রইল তার চলে যাবার পথের দিকে। সীমা চলে গেলে লোপা গিয়ে ঢুকল মিঃ মুখার্জীর কামরায়।

আজ এই প্রথম লোপামুদ্রা লক্ষ্য করল, মিঃ মুখার্জী কাজের মাঝে ডুবে গিয়ে তাকে যেন দেখেও দেখলেন না। লোপা অবাক হল। যে মুখার্জী সাহেব লোপার ঘরে ঢোকামাত্র সব কাজ ফেলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে তাকাতেন, তাঁর আজকের ব্যবহার লোপার একটুও ভাল লাগল না। মুখার্জী সাহেবের অনেক সন্ধ্যার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হতে হয়েছে তাকে। কত কথাই না শুনতে হয়েছে তাকে এজন্যে। কিন্তু একমাত্র টাকা রোজগারই ছিল লোপামুদ্রার লক্ষ্য, তাই সে গ্রাহ্য করেনি কাউকে। কিন্তু আজ যেন কোথায় একটা তার কেটে গেছে বলে মনে হল তার।

লোপামুদ্রা চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়েই রইল।

কিছুক্ষণ কাজের ভেতর মগ্ন থাকার পর মিঃ মুখার্জী চোখ তুলে তাকালেন।

এই যে কখন এলে ?

লোপামুদ্রা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আমার বন্ধুকে চাকরি দেবার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

এবার মিঃ মুখার্জী বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, আরে বোস বোস দাঁড়িয়ে রইলে যে।

লোপামুদ্রা বসল।

মিঃ মুখার্জী বললেন, তোমার নির্বাচনকে তারিফ না করে পারছি না মিস সেন। তোমার বান্ধবীটি এককথায় অনবদ্য।

লোপামুদ্রা বলল, সে তো আপনাকে আমি বলেইছিলাম।

তোমার বলার চেয়েও বোধকরি বেশী।

হাসলেন মিঃ মুখার্জী। তারপর সহসা মুখখানা গম্ভীর করে বললেন, কিন্তু ভেরি সরি মিস্ সেন, তোমাকে পি-এর পোস্টে প্রমোশান দিয়ে নেওয়া যাবে না। ডাইরেক্টরের স্ট্রিক্ট নির্দেশ, অফিসের কাউকে যেন প্রমোশান না দেওয়া হয়। নানান ঝামেলায় পড়তে হবে শেষকালে।

লোপামুদ্রা মুহূর্তে বুঝে নিল, সীমাকে মিঃ মুখার্জীর মনে ধরেছে, আর তাই এই অজুহাত সৃষ্টি। আজ সকালেই ফোনে মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে তার পাকাপাকি কথা হয়েছিল, পি-এর পোস্টে সেই আসছে আর তার পোস্টে আসছে সীমা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ভেতর ডাইরেক্টরের কড়া নির্দেশ এসে যাবে এ অসম্ভব। তাছাড়া লোপা ভাল করেই জানে ডাইরেক্টর রয়েছেন সিমলার অফিসে।

লোপামুদ্রা মিঃ মুখার্জীর কাছে নিজের সম্বন্ধে কোন তদ্বির আর করল না। শুধু চলে আসার সময় বলল, আমার ওপর এতদিন যেটুকু কৃপা দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, আর বিশেষ কৃতজ্ঞ আমার বন্ধুকে চাকরি দেবার জন্যে। তবে এটুকু মনে রাখবেন, সকলে লোপামুদ্রা নয়।

লোপামুদ্রা মুখার্জী সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

রোববার লাইটহাউসের সামনে দেখা হল দু'বন্ধুতে। আগেই টিকিট কেটে রেখেছিল লোপা। দুজনে বসে বসে সিনেমা দেখল। নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের লাইফ নিয়ে গড়ে উঠেছে এ বই। সামাজিক আইনে অনেক সময় যাকে দোষণীয় বলে ঘোষণা করা হয়, ইসাডোরা চিরদিনই সে আইন ভেঙেছে জীবনের সত্যকে খুঁজতে গিয়ে।

মন ভরে দেখবার মত ছবি। সীমা পর্দায় ফেলা আলোর ঝলকে হঠাৎ দেখল তার পাশে বসে গালে হাত দিয়ে ছবি দেখছে লোপা, তন্ময় হয়ে দেখছে।

ছবি শেষ হল। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। তখনও যেন লোপা নিজের তদগত ভাবখানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সীমা দেখল, লোপার চোখে জল চিকচিক করছে।

ওরা গাড়িতে উঠল না। গড়ের মাঠের গাছগুলোর নীচে পায়ে-চলা পথ ধরে হাঁটতে লাগল। গরম পড়েছে খুব, তাই ফাঁকা মাঠের হাওয়াটা ভালই লাগছিল।

প্রথমে কথা বলল লোপা, দেখ, আজ রেস্টুরেণ্টে খাবার কথা ছিল, কিন্তু মনটা ভাল লাগছে না রে ভাই।

সীমা বলল, তাতে কি হয়েছে, আর একদিন নাহয় খাওয়া যাবে। এখন তো রোজই তোতে আমাতে দেখা হবে।

লোপা হাসল। বলল, যাবি একটু গঙ্গার ধারে?

সীমা বলল, চল, আমার এখন কোন তাড়া নেই।

ওরা গঙ্গার ধারে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। সামনে সন্ধ্যার গঙ্গায় তরল অন্ধকারের স্রোত। বড় বড় দুটো জাহাজে আলো ঝলমল করছিল। জলে পড়েছিল সেই আলোর ঝলক। ওরা দেখছিল। কতক্ষণ কোন কথাই কেউ বলল না।

একসময় লোপা বলল, তোকে একটা কথা বলব বলে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম।

সীমা লোপার দিকে তাকাল।

তুই চাকরি পেয়েছিস, তোর চেয়ে আমি কম খুশী হইনি সীমা।

সে আমি জানি লোপা। পথের থেকে তুই আজ আমাকে তুলে নিয়ে এলি অনেক ওপরে।

লোপা বলল, সেইখানেই আমার ভয় সীমা। আমি মাঝে না থেকে যদি তুই নিজে চাকরিতে আসতিস, তাহলে আমার কোন ভয় বা দায় থাকত না। আজ তাই চাকরিতে যোগ দেবার আগে তোকে আমার একটু সাবধান করে

দেওয়া দরকার।

সীমা বলল, আমি একেবারে অজানা জগতে ঢুকছি ভাই, তোর সাহায্য ছাড়া হয়ত আমার চলাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

না সে কথা নয়। আমি বলছি, যে কোম্পানিতে তুই চাকরি করতে ঢুকছিস, আর যার কাছে বসে রোজ কাজ করবি সেখানে তোকে মনে মনে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সীমা কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

লোপামুদ্রা বলল, প্রাইভেট অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা তোর নেই, তাই এত কথা বলা। সব প্রাইভেট অফিসের কথা আমি বলছি না কিন্তু আমাদের অফিস সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, তাই বলছি। চাকরি রাখতে হলে বসের মন যুগিয়ে চলতে হবে সব সময়। তাকে সবরকমে খুশী করতে না পারলে তোমার উন্নতি নেই,—উন্নতি তো দূরের কথা চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যেতে পারে।

সীমা অবাক হয়ে বলল, সবরকমে বসকে খুশী করা মানে, তুই কি বোঝাতে চাইছিস?

লোপা বলল, এই সহজ কথাটা বুঝলি না। দরকার হলে বসের সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট কারে করে এই গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়ার জন্যে আসতে হবে।

সীমা বলল, অসম্ভব।

লোপা বলল, মানুষের প্রয়োজন সব অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেয় সীমা। আমি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম, এত সহজে কাউকে সঙ্গ দিতে পারব।

সীমা বলল, আমাকে খুলে বল ভাই, অন্ধকারে রাখিসনে।

লোপা বলল, এতদূর এগিয়ে এসে আর পেছনো যায় না সীমা। তার চেয়ে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করিস। দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারবি।

সীমা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তা বলে নিজেকে বিক্রি করে আমি বড়লোক হতে চাইনে।

হাসল লোপা।

তোর প্রয়োজন হয়ত অনেক কম সীমা, কিন্তু এমন প্রয়োজনও থাকে মানুষের, যার জন্যে সবরকম কাজ করতেই সে প্রস্তুত থাকে।

সীমা কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

লোপা বলল, মিঃ মুখার্জীর তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। তাই তিনি চান তাঁর পি-এর কাজে তোকেই দেখতে।

সীমা লোপার কথার ভেতরেই বলে উঠল, সে কি করে হয়। কাজ পেলে আমি বেঁচে যাই এ কথা যেমন ঠিক, অন্যের কাজ কেড়ে নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না, এ কথা তেমনি সত্য। আর বিশেষ করে যেখানে তোর আমার প্রশ্ন।

লোপা বলল, কাজ করতে এসে সেণ্টিমেণ্টাল হোসনে এই আমার অনুরোধ। মুখার্জী সাহেব একটি ক্ষুধিত নেকড়ে। ওকে সব সময়ে নজরে

রেখে চলবার চেষ্টা করবি, আমার এইটুকু সাবধান করে দেওয়া।

আমি এ পরিস্থিতির ভেতর কাজ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না লোপা।

লোপা বলল, আমি তো পারছি।

সীমা বলল, তুই যে ছবি তুলে ধরলি, তাতে নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কাজ করা কি সম্ভব ?

লোপা বলল, সম্ভ্রম কাকে বলিস তোরা জানি না, তবে আমার সংসারের প্রয়োজনগুলো এমন হাঁ করে গিলতে আসে, যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমাকে অনেক সময় ছদ্মবেশ ধরতে হয়।

ছদ্মবেশ !

বিস্মিত হল সীমা।

হাঁ ছদ্মবেশ। যে আমি আমার সংসারের আমি, তাকে অফিসে আসার সময় ঘরে ফেলে আসি। অফিসের আমির আর এক চেহারা। আমার জীবনটা কি রকম জানিস, একদিকে সংসারের ঘরণী, অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চের নায়িকা।

সীমা বলল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। কোনদিন এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। তুই যা পারিস, আমার পক্ষে সে পারা প্রায় অসম্ভব।

একটু চুপ করে থেকে সীমা বলল, দু'দিন দেখব, তেমন তেমন মনে হলে কাজ ছেড়ে দেব।

লোপা বলল, দেখ সীমা, মুখে আমি রঙ মাখি ; মুখার্জী সাহেবের ঘরে যাই বাড়তি রোজগারের ধান্দায়, সে আমার বিলাসের জন্যে নয়। টাকা থাকলে লোকে বিলাসিতা করে আবার টাকার জন্যেও বিলাসিতার ছদ্মবেশ ধরতে হয়। শেষের বিলাসিতাটা আমার জন্যে সীমা।

সীমা কিছু বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তের মত বসে রইল। তার মনে হল লোপামুদ্রার এমন কি প্রয়োজন যার জন্যে সে নিজেকে একটা নেকড়ের কাছে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

লোপা সীমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, তুই হয়ত আমার কথাই ভাবছিস। আর ভাবছিস নিশ্চয়ই, মেয়েটা কি নোংরা। এর সঙ্গে দেখা না হলেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু আমার সব ছবিটুকু না দেখে আমাকে বিচার করিসনে ভাই। অন্যে তো আমার সম্বন্ধে কত কথাই না ভাবে, তারা আমাকে হয়ত টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরে বেড়ান একটা বিলাসিনী মেয়ে ছাড়া কিছুই ভাবে না। আমি তাদের ভুল ভেঙে দিই না কোনদিন। ওটুকু বাড়তি কাজ করার সময় কই আমার। কিন্তু তোর কাছে আজ কিছু লুকোবো না সীমা। তুই আজ চল আমার সঙ্গে আমার ঘরে। হয়ত তোর কষ্ট হবে, কিন্তু আমি একটু শান্তি পাব ভাই।

সীমা কিছুই বুঝল না, সে লোপামুদ্রার সঙ্গে চলল তার বাড়ি। ওরা বাস থেকে এসে নামল দক্ষিণ কলকাতার একটা বস্তি অঞ্চলে। সীমা লোপার সঙ্গে সেই বস্তির একখানা টালি-ছাওয়া ঘরের ভেতর এসে ঢুকল।

সীমা ভাবতেই পারল না যে লোপামুদ্রা এই বস্তিতেই বাস করে।

লোপার বেশবাস পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা কোনকিছুর সঙ্গেই যেন সংগতি নেই এর।

দু'খানি ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি। একখানার ভেতর রান্নার সরঞ্জাম থেকে বাক্স বিছানা গাদাগাদি হয়ে আছে। অন্য ঘরখানা ভেজান।

লোপামুদ্রা একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে দিল সীমাকে বসতে। তারপর হেসে বলল, এই আমার রাজাসন, বোস এখানে। এখন কি খাবি বল ?

সীমা বলল, খাবার কথা তো ছিল না, সে আর একদিন হবে এখন।

কেন, আমার রাজ্যপাট দেখে বুঝি তোর ক্ষিদেও পালিয়েছে।

এ কথা কেন ভাই। আচ্ছা যা তোর খুশি তাই খাওয়া। তবে বাইরে থেকে কিছু আনিসনে যেন।

লোপা বলল, আমি এই আসছি, ততক্ষণে তুই আমার সংসারটায় একটু চোখ বুলিয়ে নে।

লোপা ছোট্ট একচিলতে বাথরুমের ভেতর ঢুকল। বেরিয়ে যখন এল তখন অন্য এক লোপামুদ্রা। লালপাড় একখানা সাদা শাড়ি পরেছে সে। সীমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তুই একটু বোস ভাই, আমি চুলে চিরুনিটা দিয়ে নি।

লোপামুদ্রা চুলে আলতো করে চিরুনি বুলিয়ে নিল। তার পরে সিঁদুরের কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে কপালে আঁকল বড় এক টিপ। সিঁথি ভরে টানল সিঁদুরের রেখা।

সীমা অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেখে লোপামুদ্রা মুখ টিপে হেসে বলল, কি রে, কোন্‌টা আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারছিস না ?

সীমা বলল, তুই বিয়ে করেছিস !

মাথায় যে চিহ্ন এঁকেছি, তা দেখে কি মনে হয় ?

আমি ভাবতেও পারিনি লোপা, যে তুই বিবাহিতা।

শুধু কি বিবাহিতা, আমি মহারানী, আর দেখবি আয় আমার মহা-রাজাকে।

লোপা পাশের ভেজান দরজাটা খুলে ফেলল।

সীমা দেখল একখানা খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। পাশে টিপয়ে ফ্লাওয়ার ভাসের ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বিছানায় উঁচু দু'তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত একটি মানুষ। দুটি চোখ শুধু প্রাণের লক্ষণ ঘোষণা করছে, তাছাড়া সমস্ত দেহ পাথরের মত নিশ্চল।

দেখ, আমার রাজাকে দেখ।

সীমা কি বলবে ভেবে পেল না। হাত তুলে সেই নিশ্চল পাথরের মূর্তিটিকে নমস্কার করল।

এতক্ষণে একটুখানি প্রাণের সাড়া যেন প্রকাশ পেল সেই মূর্তিতে। ঠোঁট দুটো একটু যেন নড়ে উঠল।

লোপা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার কলেজের বন্ধু সীমা। অনেকদিন পরে

রেখে চলবার চেষ্টা করবি, আমার এইটুকু সাবধান করে দেওয়া।

আমি এ পরিস্থিতির ভেতর কাজ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না লোপা।

লোপা বলল, আমি তো পারছি।

সীমা বলল, তুই যে ছবি তুলে ধরলি, তাতে নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কাজ করা কি সম্ভব?

লোপা বলল, সম্ভ্রম কাকে বলিস তোরা জানি না, তবে আমার সংসারের প্রয়োজনগুলো এমন হাঁ করে গিলতে আসে, যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমাকে অনেক সময় ছদ্মবেশ ধরতে হয়।

ছদ্মবেশ!

বিস্মিত হল সীমা।

হাঁ ছদ্মবেশ। যে আমি আমার সংসারের আমি, তাকে অফিসে আসার সময় ঘরে ফেলে আসি। অফিসের আমির আর এক চেহারা। আমার জীবনটা কি রকম জানিস, একদিকে সংসারের ঘরণী, অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চের নায়িকা।

সীমা বলল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। কোনদিন এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। তুই যা পারিস, আমার পক্ষে সে পারা প্রায় অসম্ভব।

একটু চুপ করে থেকে সীমা বলল, দু'দিন দেখব, তেমন তেমন মনে হলে কাজ ছেড়ে দেব।

লোপা বলল, দেখ সীমা, মুখে আমি রঙ মাখি; মুখার্জী সাহেবের ঘরে যাই বাড়তি রোজগারের ধান্দায়, সে আমার বিলাসের জন্যে নয়। টাকা থাকলে লোকে বিলাসিতা করে আবার টাকার জন্যেও বিলাসিতার ছদ্মবেশ ধরতে হয়। শেষের বিলাসিতাটা আমার জন্যে সীমা।

সীমা কিছু বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তের মত বসে রইল। তার মনে হল লোপামুদ্রার এমন কি প্রয়োজন যার জন্যে সে নিজেকে একটা নেকড়ের কাছে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

লোপা সীমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, তুই হয়ত আমার কথাই ভাবছিস। আর ভাবছিস নিশ্চয়ই, মেয়েটা কি নোংরা। এর সঙ্গে দেখা না হলেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু আমার সব ছবিটুকু না দেখে আমাকে বিচার করিসনে ভাই। অন্যে তো আমার সম্বন্ধে কত কথাই না ভাবে, তারা আমাকে হয়ত টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরে বেড়ান একটা বিলাসিনী মেয়ে ছাড়া কিছুই ভাবে না। আমি তাদের ভুল ভেঙে দিই না কোনদিন। ওটুকু বাড়তি কাজ করার সময় কই আমার। কিন্তু তোর কাছে আজ কিছু লুকোবো না সীমা। তুই আজ চল আমার সঙ্গে আমার ঘরে। হয়ত তোর কষ্ট হবে, কিন্তু আমি একটু শান্তি পাব ভাই।

সীমা কিছুই বুঝল না, সে লোপামুদ্রার সঙ্গে চলল তার বাড়ি। ওরা বাস থেকে এসে নামল দক্ষিণ কলকাতার একটা বস্তি অঞ্চলে। সীমা লোপার সঙ্গে সেই বস্তির একখানা টালি-ছাওয়া ঘরের ভেতর এসে ঢুকল।

সীমা ভাবতেই পারল না যে লোপামুদ্রা এই বস্তিতেই বাস করে।

লোপার বেশবাস পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা কোনকিছুর সঙ্গেই যেন সংগতি নেই এর।

দু'খানি ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি। একখানার ভেতর রান্নার সরঞ্জাম থেকে বাক্স বিছানা গাদাগাদি হয়ে আছে। অন্য ঘরখানা ভেজান।

লোপামুদ্রা একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে দিল সীমাকে বসতে। তারপর হেসে বলল, এই আমার রাজাসন, বোস এখানে। এখন কি খাবি বল?

সীমা বলল, খাবার কথা তো ছিল না, সে আর একদিন হবে এখন।

কেন, আমার রাজ্যপাট দেখে বুঝি তোর ক্ষিদেও পালিয়েছে।

এ কথা কেন ভাই। আচ্ছা যা তোর খুশি তাই খাওয়া। তবে বাইরে থেকে কিছু আনিসনে যেন।

লোপা বলল, আমি এই আসছি, ততক্ষণে তুই আমার সংসারটায় একটু চোখ বুলিয়ে নে।

লোপা ছোট্ট একচিলতে বাথরুমের ভেতর ঢুকল। বেরিয়ে যখন এল তখন অন্য এক লোপামুদ্রা। লালপাড় একখানা সাদা শাড়ি পরেছে সে। সীমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তুই একটু বোস ভাই, আমি চুলে চিরুনিটা দিয়ে নি।

লোপামুদ্রা চুলে আলতো করে চিরুনি বুলিয়ে নিল। তার পরে সিঁদুরের কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে কপালে আঁকল বড় এক টিপ। সিঁথি ভরে টানল সিঁদুরের রেখা।

সীমা অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেখে লোপামুদ্রা মুখ টিপে হেসে বলল, কি রে, কোন্‌টা আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারছিস না?

সীমা বলল, তুই বিয়ে করেছিস!

মাথায় যে চিহ্ন এঁকেছি, তা দেখে কি মনে হয়?

আমি ভাবতেও পারিনি লোপা, যে তুই বিবাহিতা।

শুধু কি বিবাহিতা, আমি মহারানী, আর দেখবি আয় আমার মহারাজাকে।

লোপা পাশের ভেজান দরজাটা খুলে ফেলল।

সীমা দেখল একখানা খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। পাশে টিপয়ে ফ্লাওয়ার ভাসের ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বিছানায় উঁচু দু'তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত একটি মানুষ। দুটি চোখ শুধু প্রাণের লক্ষণ ঘোষণা করছে, তাছাড়া সমস্ত দেহ পাথরের মত নিশ্চল।

দেখ, আমার রাজাকে দেখ।

সীমা কি বলবে ভেবে পেল না। হাত তুলে সেই নিশ্চল পাথরের মূর্তিটিকে নমস্কার করল।

এতক্ষণে একটুখানি প্রাণের সাড়া যেন প্রকাশ পেল সেই মূর্তিতে। ঠোঁট দুটো একটু যেন নড়ে উঠল।

লোপা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার কলেজের বন্ধু সীমা। অনেকদিন পরে

দেখা, তাই নিয়ে এলাম।

আবার ঠোঁট দুটো নড়ল। লোপা সীমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই এসেছিস বলে খুব খুশী হয়েছে ও। তোকে আদরযত্ন করতে বলছে।

এবার লোপা সীমাকে নিয়ে আগের ঘরে এসে বসল। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। কোন কথা না বলে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে কয়েকটা আম কাটলে। একটা প্লেটে সাজিয়ে সীমাকে খেতে দিলে। সীমা দেখল খুব সুন্দর আর একখানা প্লেটে কয়েক টুকরো আম নিয়ে লোপা পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, তুই খেতে থাক ভাই, আমি এখুনি আসছি।

দরজাটা খোলাই ছিল। সীমা দেখল, ঐ মানুষটিকে লোপা যত্ন করে আম খাওয়াচ্ছে। ডান হাত দিয়ে খাওয়াচ্ছে, আর বাম হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। অস্ফুটে কিছু যেন বলছে। হয়ত দীর্ঘসময় পরে আসার জন্যে আদর জানাচ্ছে।

সীমার মনে হল, একটি অসহায় শিশুকে তার মা পরম স্নেহে খাইয়ে দিচ্ছে।

খাওয়ান শেষ হলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এল লোপামুদ্রা। সীমা তাকিয়ে দেখল, কি পরিতৃপ্তি লোপার চোখে মুখে।

লোপা বলল, তুই খাসনি এখনও, বসে আছিস প্লেট নিয়ে।

তুই আয় একসঙ্গে খাব।

লোপা এসে বসল সীমার পাশে। দুবন্ধুতে খেতে খেতে কথা শুরু হল।

লোপা বলল, খুব অবাক লাগছে না রে ? এই আমার সংসার, এই আমার জীবন।

সীমা বলতে যাচ্ছিল, তোর স্বামী…।

লোপা বলল, হাঁ ভাই আমার স্বামী, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। আর ওকে সারিয়ে তুলব বলে আমি আজ চারটে বছর পাগলের মত টাকা কুড়িয়ে বেড়িয়েছি।

সীমা বলল, কিছু উপকার হয়েছে ওঁর ?

তুই তো নিজের চোখেই দেখলি ভাই। দিনে দিনে আমার ভাঁড়ার শূন্য হয়েছে আর ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

সীমা চুপ করে বসে রইল। লোপা উঠে কয়েকখানা ছবি তোরঙ্গ থেকে বের করে এনে সীমার সামনে রেখে বলল, দেখ তো দেখি, চিনতে পারিস ?

লোপার ছবি, কিন্তু কি জীবন্ত! উজ্জ্বল অথচ কোমল রঙে প্রতিটি ছবি অপরূপ হয়ে উঠেছে। কোন ছবি, জলভরণে চলেছে লোপা, অস্তসূর্যের আভা এসে রাঙিয়ে দিয়েছে মুখ। কোন ছবিতে বসন্তের পলাশবনে ফুল কুড়িয়ে খোঁপায় গুঁজছে লোপা। আবার আকাশভরা মেঘের দিনে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কপালের ওপর হাত রেখে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। এ যেন অন্য এক জগৎ বলে মনে হল সীমার।

সত্যি আশ্চর্য সুন্দর।

সীমা ছবি দেখা শেষ করে মন্তব্য করল।

এ আমার রাজার দান ভাই। পথে পথে একদিন ঘুরে ফিরছিল মডেলের সন্ধানে। পরিচয় হল। পয়সা ছিল না ওর হাতে। বললাম, যদি আমাকে দিয়ে কাজ চলে তাহলে আমি বিনি পয়সার মডেল হতে রাজী আছি।

আমাকে নিয়ে পাগলের মত ছবির পর ছবি এঁকে চলল। একদিন ছবির মানুষ ঘরের মানুষও হল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল ভাই কাল ব্যাধিতে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল আমার শিল্পী। যার ছবির এগজিবিশন দেখে কত বড় বড় লোক বাহবা দিলে, কত খবরকাগজের আর্ট ক্রিটিক প্রশস্তি করে লিখলে তারা কেউ একটি পয়সা নিয়ে এগিয়ে এল না এই অসুস্থ মানুষটাকে সাহায্য করতে।

রাগ করে একদিন আমার রাজা বলল, দাও সব ছবি বিক্রি করে, যা পাওয়া যায় তাই ভাল। ভীষণ জেদী মানুষ, যা বলবে তাই করতে হবে। কিন্তু তুই বল ভাই, প্রাণ ধরে এসব ছবি আমি বিক্রি করতে পারি। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম চাকরির ধান্দায়। শেষে এই কোম্পানিতে মুখার্জী সাহেবের নজরে পড়ে গেলাম। চাকরি হল, উপরি রোজগারও হল। ওকে এসে বলতাম, সারাদিন ঘুরে তোমার এই ছবিখানা বিক্রি করেছি। বানিয়ে গল্প বলতাম। মাইনের আর উপরি রোজগারের টাকাগুলো দেখাতাম, ওর ছবির মূল্য বলে। ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। দীর্ঘ দু'চার মাস পরে পরে আবার ছবি বিক্রির টাকা বলে ওর হাতে অনেকগুলো করে টাকা তুলে দিয়েছি। তুই ভাবতে পারবি না ভাই এ চার বছর ধরে আমি ওর সঙ্গে ছবি বিক্রির সেই অভিনয়ই করে চলেছি।

একটু থামল লোপা, গলাটা তার ধরে এসেছিল। একসময় বলল, বড় ডাক্তারে বলে গেছে আর বেশীদিন ওকে ধরে রাখা যাবে না।

হাসল লোপা। কান্নার মত শোনাল সে হাসি।

লোপা হাসতে হাসতেই বলল, আমার অভিনয়ের দিনও ফুরিয়ে এসেছে ভাই। যার জন্যে পাঁককে চন্দন বলে গায়ে মাখলাম, তাকে হারালে আমার আর কি রইল বল?

সীমা কি উত্তর দেবে এর। সে শুধু বলল, আমার অনেক ধারণা আজ বদলে গেল লোপা। তোকে দেখে আজ মনে হচ্ছে, তুই সত্যিকারের পদ্ম। পাঁকের ভেতরে আছিস তবু গায়ে তোর পুজার গন্ধ লেগে আছে।

পরের দিন সোমবার। সীমার কাজে যোগ দেবার দিন। সেজেগুজে সীমা বেরিয়ে গেল নতুন অফিসে। সিঁড়ি ভেঙে উঠল ওপরে। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকল মুখার্জী সাহেবের কামরায়।

আসুন, আসুন মিস বোস। ভেরী পাংচুয়াল। খুব খুশী হলাম। দেখুন কাজ করতে এসে যারা দেরি করে আর ঘনঘন ছুটি নেয় তাদের আমি একেবারেই দেখতে পারিনে। কাজ না থাকলেও বসে থাকুন নিজের কাজের জায়গায়। তবেই তো বলব কাজের মানুষ।

খুব খুশী হলাম আপনার কথা শুনে মিঃ মুখার্জী।

সীমার কথা শুনে মুখার্জী সাহেব বিগলিত হলেন।

এই যে আপনি স্যার স্যার না করে প্রথম দিনেই মিঃ মুখার্জী বলে সম্বোধন করলেন, এতে জানবেন আমি একটুও দুঃখিত হইনি, বরং আনন্দ পেলাম প্রচুর।

একটু থেমে মুখার্জী সাহেব বললেন, দেখুন, যার সঙ্গে কাজ করবেন, তাকে যদি আপনার করে নিতে না পারলেন তাহলে কাজ করবেনই বা কিসের জোরে।

সীমা বলল, আপনার কথাগুলো ভারী ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে চাকরিটা করতে পারলে লাভই হত আমার।

মুখার্জী সাহেব হঠাৎ যেন কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর বললেন, কি বলছেন মিস্ বোস। চাকরিটা করতে পারলে মানে?

দুঃখিত মিঃ মুখার্জী, আমার পক্ষে চাকরিটা নেওয়া সম্ভব হবে না। আর দয়া করে এ কথাটা আপনি আমার বান্ধবী লোপামুদ্রাকে জানিয়ে দেবেন। লোপা হয়ত রাগ করবে, কারণ তার কথাতেই আপনি আমাকে চাকরিটা দিয়েছিলেন।

এমন একটা চাকরি হাতে পেয়েও আপনি ছেড়ে দেবেন, বাজারে চাকরির অবস্থা দেখেছেন!

ভেবে দেখলাম, চাকরির প্রয়োজন আমার যতখানি তার চেয়ে অন্য একজনের প্রয়োজন অনেক বেশী হতে পারে। তাই বলতে পারেন, নিজে সরে গিয়ে অন্যকে সুযোগ করে দিলাম।

মুখার্জী সাহেব বললেন, মিস্ সেনের কাছে শুনেছিলাম, লজেন্স বিক্রি করে নাকি আপনার সংসার চলে। আমাদের কোম্পানির কাজটা কি তার চেয়ে ছোট বলে মনে করেন? তাছাড়া উপরি আছে।

সীমা বলল, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। তবে কি জানেন সব কাজ সকলের সয় না। অনেক ভেবে দেখলাম, লজেন্স বিক্রি করাই আমার ভাল। কোনদিন ইচ্ছে হল কাজ করলাম, কোনদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

মুখার্জী সাহেব এবার তাঁর শেষ টোপ ফেললেন, কাজের ভয় করছেন মিস বোস? প্র্যাকটিকেলি কাজ এখানে কিছু নেই। শুধু হাজিরা দেওয়া। বসে গড়িয়ে মাসের শেষে মাইনেটা নেওয়া। ফর শো একজন পি-এর দরকার। ডাইরেক্টর সাহেবের মর্জি। বলতে পারেন, রাজ্য নেই তবু রাজঠাট।

হা হা করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন মিঃ মুখার্জী।

সীমা বলল, না ঠিক তা নয়, আমাকে এতটা অকর্মণ্য ভাববেন না। তবে ভেবে দেখছি, বসে বসে মাইনে নেওয়া আমার ধাতে সইবে না। হেঁটে চলে রোজগার করে অভ্যেসটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

মুখার্জী সাহেব এবার স্বমূর্তি ধরলেন, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। যতসব বিড়িওলা, পানওলা, ফেরিওলারাই এখন দেশের সামনে উচ্চ আদর্শ। শিক্ষিত

বেকারগুলো দেখছি সব সেদিকেই ছুটছে।

সীমা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, লেখাপড়া না থাকলে হয়ত আপনার এই কাজকেই মাথায় তুলে নিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার কয়েকটা ডিগ্রি রয়ে গেছে। তাই পারলাম না বলে দুঃখিত। নমস্কার।

সীমা বেরিয়ে এল মিঃ মুখার্জীর ঘর থেকে। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে যেমন ক্ষুধিত নেকড়ে আক্রোশে গজরাতে থাকে মুখার্জী সাহেব একা ঘরের ভেতর বসে বসে তেমনি গজরাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, নতুনের চেয়ে পুরোনোই ভাল। মিস সেনকেই কাজটা দিয়ে দেওয়া যাক্। মেয়েটা সাবমিসিভ।

মুখার্জী সাহেব হাঁকলেন, বেয়ারা, মিস সেন।

আবার পথ। পথ চলার যেন আর বিরাম নেই সীমার। এমনি চলতে চলতে একদিন এক বুক স্টলে ও দেখতে পেল একটি মাসিক পত্রিকা। পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়ল অনির্বাণ চৌধুরীর একটি গল্প।

কলকাতার কোন এক বিশিষ্ট কলেজে তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন, তাছাড়া ইউনিভারসিটিতেও পার্ট টাইম অধ্যাপনা করেন ডক্টর চৌধুরী। সীমারাও ওঁর কাছে পড়েছিল। শুধু তাই নয় অধ্যাপক চৌধুরী একজন বিশিষ্ট লেখকও।

সীমা বোধহয় জীবনে এই প্রথম একটি টাকা খরচ করে ঐ মাসিক পত্রিকাটি কিনল। কারণ কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজন ছাড়া টাকা খরচ করার মত অবস্থা কোনদিনই তার ছিল না।

কলেজ স্কোয়ারে একটি ছায়ার আশ্রয়ে বসে সে গল্পটি প্রায় একনিশ্বাসেই পড়ে ফেলল। কি অদ্ভুত লেখার কলম অধ্যাপক চৌধুরীর! যেন প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা চোখের সামনে মিছিল করে চলেছে।

সীমা গল্পটা পড়ে ঠিকানা খোঁজ করে অধ্যাপক চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে একদিন উঠল।

অধ্যাপক চৌধুরী সীমাকে চিনতে পারলেন, আরে এস এস, কি খবর?

সীমা প্রণাম করে বসল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী বসে ছিলেন। পাশে একজন ভদ্রলোক কি যেন লিখছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। তাঁর লেখা বুঝি শেষ হল সেই মুহূর্তে।

তিনি বললেন, পড়ব স্যার?

পড়ুন, পড়ুন।

ভদ্রলোক পড়তে লাগলেন, যখন গিয়ে পৌঁছলাম লেখক অনির্বাণ চৌধুরীর বাড়িতে তখন দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি গ্রন্থ পাঠ করছেন। এত নিবিষ্ট ছিলেন যে আমার পায়ের সাড়া পেলেন না। হঠাৎ একসময় মুখ তুলে আমার পরিচয় পেয়ে হেসে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর সেই বিশ্বজয়ী হাসি দিয়ে তিনি মুহূর্তেই আমার হৃদয় জয় করে নিলেন।

বললাম, আপনি আর্টসের লোক, সাহিত্য নিয়ে কাটালেন চিরদিন, কিন্তু আপনার হাতে দেখছি বিজ্ঞানের বই ?

হা হা করে সেই ভুবনজয়ী হাসি হেসে তিনি বললেন, স্বামী স্ত্রীতে কথাকাটাকাটি হয় বলেই কি এক ঘরে বাস করব না। বরং বাইরের আপাত বিরোধ অন্তরের গভীর মিলনকেই প্রকাশ করে। আর্টস আর সায়েন্স ঠিক তাই।

কথাগুলো যখন শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখের ওপর দেখছিলাম একটা গভীর বিশ্বাসের ছবি। তিনি কথা বলে চলেছিলেন, কখনো বিজ্ঞান, কখনো ধর্ম, কখনো বা সাহিত্য সমাজ নিয়ে। কি অনায়াস গতি তাঁর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার। আমার মনে হল যেন তাঁর ললাটে নতুন সূর্যের উদয় দেখলাম। মনে হল, আমাদের সৌরমণ্ডলে এক সূর্য, এ বিজ্ঞানের সত্য, কিন্তু সাহিত্যের সূর্য বারবার ফিরে ফিরে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে দেখে সেদিন আমার মনে সেই বিশ্বাসই জেগে উঠল।

এত বড় লেখক হয়েও তিনি কিন্তু আমাকে চলে আসার সময় চা জল-খাবারে আপ্যায়িত করতে ভুললেন না। বেয়ারাকে চলে যেতে বলে নিজের হাতেই তিনি চা পরিবেশন করলেন। এ সৌজন্য তাঁর সহজাত। তাই পথে নেমে মনে হল. তিনি স্রষ্টা হিসেবে যেমন দরদী, ঠিক তেমনি সৌজন্যের বেলাতেও অকৃত্রিম। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা যেন মিশে গেছে তাঁর মধ্যে অভিন্ন হৃদয়ে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে না দেখলে এ কথার সত্য উপলব্ধি হবে না।

অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, অনেক বাড়িয়ে লিখলেন আমার সম্বন্ধে।

সে কি কথা স্যার, এই তো আমাদের কাজ। এ আমার তৃতীয় সাক্ষাৎকার। দেখবেন, 'বিশ্বহিতৈষী' পত্রিকায় যে ক'টি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে সব ক'টির সুর ভাষা ব্যঞ্জনা আলাদা। এ না করতে পারলে রিপোর্টার কি স্যার।

কিন্তু এখনও আপনার চা খাওয়া হয়নি সুজিতবাবু।

সে তো হবে জানি স্যার, তাই আগেভাগেই লিখে রাখলাম।

চা এল। সীমার জন্যেও এল এক কাপ। চা খেতে খেতে হালকা গল্প হচ্ছিল। অধ্যাপক চৌধুরী সীমার দিকে ফিরে বললেন, আজকাল কাজকর্ম কি করছ ?

লজেন্স বিক্রি করছি স্যার।

লজেন্স বিক্রি !

যেন আকাশ থেকে পড়লেন অধ্যাপক চৌধুরী।

তোমার রেজাল্ট তো খারাপ ছিল না, স্কুল কলেজে একটা চাকরি জোটাতে পারতে।

পেলাম কই স্যার।

অধ্যাপক চৌধুরী সেদিক দিয়ে আর হাঁটলেন না। তিনি রিপোর্টার ভদ্রলোককে বললেন, দেখুন, ভালভাবে এম-এ পাস করে বসে আছে মেয়েটি,

একটি চাকরি নেই তার সামনে। সারাদিন লজেন্স নিয়ে ঘুরছে। 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'।

রিপোর্টার উচ্ছ্বসিত হলেন, দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার লাইন দিয়েই ক্যাপসান বানাব।

তারপর সীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার নাম ?

সীমা বোস—

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আনম্যারেড।

আজ্ঞে হাঁ।

রসিকতা করলেন রিপোর্টার ভদ্রলোক, কিছু মনে করবেন না, আজকাল বিয়েকরা মেয়েরা নিজেদের কুমারী বোঝাবার জন্যে সিঁদুরকে শিরোধার্য না করে চুলের অরণ্যে নির্বাসন দিচ্ছেন।

তারপর বললেন, হাঁ বলুন দিকি আপনার পোষ্য ক'টি ?

সীমা বলল, একটি ভাই আর আমি।

শুধু লজেন্স বিক্রির ওপর সংসার চলে ?

না, ছোটখাট কিছু কাজ কখনোসখনো পেলে করি। এই যেমন প্রুফ দেখা, দু'একটা পাণ্ডুলিপি কপি করে দেওয়া।

এরপর একগাদা প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। খাতা বন্ধ করে ভদ্রলোক বললেন, নমস্কার, অদ্ভুত সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম। আমাদের বিশ্বহিতৈষীর শনিবারের সংখ্যা দেখবেন। 'জীবন-যন্ত্রণা' বিভাগে আপনার কথাই লেখা হবে। হয়ত দেখবেন ভাগ্য খুলে যেতে পারে।

রিপোর্টার ভদ্রলোক উঠলেন। সঙ্গের ক্যামেরাখানা তাক করলেন অধ্যাপক চৌধুরীর দিকে। অধ্যাপক চৌধুরী পকেট থেকে পেনটা টেনে নিয়ে হাতে ধরলেন, তারপর সেই পেনসহ হাতখানা ডানদিকের গালে স্থাপন করে চিন্তাবিদের পোজ করলেন। ক্লিক্ করে ছবি তোলা হয়ে গেল।

এবার আপনার।

সীমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। সীমা সংকুচিত হল, না, না, আমার কেন।

আমাদের পাবলিসিটির নিয়মই হচ্ছে তাই। কেবল ছবি তোলার সময় হাসবেন না প্রচলিত প্রথা মত। তাতে 'জীবন-যন্ত্রণা'র ভাবটা প্রকাশ পাবে না।

সীমার আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক তার একখানা ছবি তুলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বিদায় নিলেন। অন্য কোথায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দেরি হয়ে গেল।

ভদ্রলোক চলে গেলে অধ্যাপক চৌধুরীর মুখোমুখি হল সীমা।

আপনার গল্প পড়লাম স্যার।

কোন্ গল্প ?

ঠগ্।

অধ্যাপক চৌধুরী যেন স্মরণে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন, ঠগ্, ঠগ্।

সীমা বলল, ঐ যে স্যার যে গল্পটাতে একটি মেয়ে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছিল। মেয়েটি শিক্ষিতা কিন্তু চাকরি পায় না, প্লুরিসি হয়েছে। মেয়েটি টাকা চায়নি, তবু তার করুণ অবস্থা দেখে লেখক তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, ঠিকানা রেখে যান চেষ্টা করে দেখব। শেষে একদিন একটা চাকরি যোগাড় করে ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখা গেল, সব ভুয়ো।

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, অনেকদিনের লেখা ফেলে রেখেছিলাম। সেদিন হঠাৎ 'ও-স্বর্গ' পত্রিকার সম্পাদক এসে ছিনে জোঁকের মত ধরে লেখাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তা লেখাটা লাগল কেমন?

ভাল স্যার। আর তাই বলতেই আমার এ্যান্দুর আসা।

খুব খুশী হলাম।

কিন্তু একটা কথা বলার আছে স্যার।

বল?

অনেক মা-বাপ-হারা মেয়ের চাকরির দরকার আছে। তারা অনেকেই লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তাদের সকলেই ঠগ নয়। আমি এইটুকু জানাতেই আপনার কাছে এলাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন অধ্যাপক চৌধুরী।

আরে তুমি যে দেখছি সব সত্যি বলেই ভেবে নিলে।

আপনাদের কথা আমাদের বিশ্বাস করাই ধর্ম। সমাজের সত্য ছবিটাই আপনাদের কলম থেকে বেরোবে, লোকে এই আশাই করে।

হেসে বললেন অধ্যাপক চৌধুরী, পড়নি কবিগুরুর এই কবিতা:

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নয়।'

লেখক সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। তারা মনের কারবারী, ঘটনার সত্যই সব সময় তাদের কাছে সত্য নয়।

সীমা মর্মাহত হয়ে বলল, এ আমার বুদ্ধির বাইরে স্যার।

অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, দেখ সীমা, মিথ্যাকে সত্যের মত করে যিনি দেখাতে পারেন, তিনি যে কৃতী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেটা তাঁর রচনার কৃতিত্ব হতে পারে কিন্তু তা সত্য নয়।

শোন তাহলে বলি, খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন বেরোলো, অমুককে মন্ত্রী করা হয়েছে। সাতসকালে রিপোর্টাররা তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলেন, বলুন স্যার আপনার রি-এ্যাকসন কি?

সদ্যঘোষিত মন্ত্রীপদপ্রাপ্ত মানুষটি বললেন, এই প্রথম আপনাদের কাছ থেকে আমি খবরটা পেলুম। আমার মনোভাব আমি কি জানাব আপনাদের, সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমাকে অবাক করে দিয়েছে। খবরটা পাকাপাকি এসে পৌঁছলে আমার সাধ্যমত জনগণের সেবার চেষ্টা করব আমি।

সেই ঘুঘু ব্যক্তিটিকে আমি জানি। বহু মহামানবের অবসর বিনোদন যাতে মধুর হতে পারে সে ব্যবস্থা বহুদিন ধরে তিনি করে এসেছেন। এবং এই

পুরস্কার প্রাপ্তির কথা তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন। তদ্বিরের ত্রুটি ছিল না।

আরও শোন, কাগজ পড়ে কত ভুলই না আমরা করে থাকি।

অমুক লেখক 'বোধিদ্রুম' পুরস্কার পেয়েছেন। রিপোর্টাররা তাঁর কাছে গিয়ে ভিড় করেছেন। কারণ এই পুরস্কারের নগদ মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।

লেখক স্মিতহাস্যে বললেন, এইমাত্র আপনাদের আসার আগে সংবাদপত্র মারফত জানতে পারলাম আমার পুরস্কার প্রাপ্তির খবর। এ পুরস্কার পেয়ে আমার কেবল মনে হয়েছে, এ প্রাপ্তি আমার নয়, যাঁরা আমার লেখাকে ভালবেসে আজ আমাকে এই সম্মানের অধিকারী করেছেন তাঁদের। আজ অযাচিতভাবে এই পুরস্কার পেয়ে আমি তাই আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করছি আমার বাংলাদেশের পাঠক জনসাধারণকে।

এই যে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এত কথা বললেন, জেনে রেখো তাঁর কত জোড়া চটির সুকতলা ক্ষয় হয়েছে, কত ফোনের বিল উঠেছে, কত চা-চক্রে পুরস্কার প্রদান কমিটির ধুরন্ধরদের আপ্যায়ন করতে হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

একটু থেমে আবার অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, তোমরা লেখা পড়ে শুধু বিশ্বাস করে যাও, কিন্তু তার আড়ালে যে কত সুকৌশল পাবলিসিটির কাজ চলে তার খোঁজ পাও না। এ দুনিয়াটা চলেছে তদ্বির আর পাবলিসিটির জোরে সীমা।

সীমা বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল। আপনি এমন করে অন্ধকারের ঢাকাটা সরিয়ে না দিলে এসব মিথ্যাকে আমি পুরোপুরি সত্য বলেই বিশ্বাস করতাম।

অধ্যাপক চৌধুরীকে প্রণাম করে সীমা বেরিয়ে আসছিল। অধ্যাপক চৌধুরী পেছন থেকে হেঁকে বললেন, তোমার ঠিকানাটা কই রেখে গেলে না, বল, লিখে রাখছি।

সীমা ঠিকানা বলল। যদিও সে জানে, এ ঠিকানা রাখাটাও কেবলই সান্ত্বনা দেবার একটা ছলনা হতে পারে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখা যেতে পারে। হাঁ শোন, আর একটা কথা। লজেন্স বিক্রির কাজটা যত তাড়াতাড়ি ছাড়তে পার ততই মঙ্গল। কারণ ওটা জানাজানি হয়ে গেলে ভাল জায়গায় চাকরি পাওয়া মুশকিল হবে।

সীমা বলল, মনে রাখব স্যার, তবে চাকরি না পেলে একে ছাড়ব কি করে। একমুঠো খাবারের যোগাড় এই লজেন্স বিক্রি করেই আমাকে করতে হচ্ছে।

সীমা পায়ে পায়ে পথে নেমে এল।

কয়েকদিন পরের কথা। এ ক'দিন সারা কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি কারণে যেন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বন্ধ। তাই সীমাও বেরতে পারেনি তার লজেন্স বিক্রির কাজে। ঘরে বসে থাকা

সীমার কাছে আরও অস্বস্তিকর। ভাইটা একেবারে বয়ে গেছে। আগে তবু ওকে আড়াল করে কিছু করত, আজকাল চোখের সামনে দিয়েই কোথায় যেন যায় আসে। সীমা দেখেও না দেখার ভান করে।

আজ পথে বেরিয়ে সীমার ভারী ভাল লাগল। পথ চলতে চলতে সে যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলল। পড়াশোনা করে সে একটা চাকরি পায়নি, মনের ভেতর সেজন্যে ব্যথার একটা অদৃশ্য কাঁটা বিঁধে থাকে সারাক্ষণ, তার ওপর কর্মহীন দিনগুলোয় ঘরে বসে থাকলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। এই যে কিছু একটা কাজ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তাতে নিশ্বাসটা সহজ হয়ে আসে।

সকালের কলেজগুলোতে বিক্রির কাজ সেরে সীমা নিয়মমত দুপুরের দিকে গিয়েছিল ইউনিভারসিটিতে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অঞ্জনার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে এম-এতে পড়ত অঞ্জনা। বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। রোজ গাড়িতে করে আসা যাওয়া করত। সুভদ্র সরকারের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে অনেক কথা রটনা হয়েছিল সে সময়। সুভদ্র সীমাদের সঙ্গেই পড়ত। ভাল ছেলে। অবস্থা ভাল ছিল না। প্রায় রোজ অঞ্জনার গাড়িতে করে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরত ও। অঞ্জনাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যেত বাড়িতে। ওর কাছ থেকে পড়া বুঝে নিত। হাবেভাবে প্রকাশ পেত ওর ভালবাসা। পাস করার পর অঞ্জনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি সীমার।

সীমাকে দেখে অঞ্জনা উচ্ছ্বসিত হল। হাতে ধরা একগোছা কার্ড থেকে একটি কার্ড টেনে নিয়ে নাম লিখল সীমার। তারপর সীমার হাতে কার্ডখানা দিয়ে বলল, আসিস কিন্তু। আমি স্যারেদের কার্ড দিতে বেরিয়েছি। একাকে এদিকটা সারতে হচ্ছে, বড় ব্যস্ত আছি ভাই।

অঞ্জনা চলে গেল। সীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কার্ডখানা খুলল। না, কোথাও সুভদ্র সরকারের নামটা তার চোখে পড়ল না। বিয়ের ব্যাপারে অঞ্জনা হিসেবী মেয়ে। জনৈক শুভ্রাংশু মিত্র, আই-এ-এস-এর নাম কার্ডে অঞ্জনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সীমার কি জানি কেন মনটা ভারী হয়ে উঠল। তার মনে হল সুভদ্রের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হলেই বুঝি সে সবচেয়ে খুশী হত।

অঞ্জনার বিয়ের দিন সে ঠিকানা খোঁজ করে দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বিয়ে হয়ে গিয়েছিল গোধূলি লগ্নে। সন্ধ্যায় ও যখন পৌঁছল তখন বর বধূ দু'পক্ষের বন্ধুবান্ধব সমারোহে মজলিশ জমিয়েছে বাসরঘরে।

সীমা একটি সুন্দর প্ল্যাস্টিকের কৌটো কিনেছিল, আর তার ভেতর ভরে দিয়েছিল নানারকমের লজেন্স। বাসরঘরে ঢুকতেই তার দেখা হয়ে গেল অনেক পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। কেতকী চিরদিনই ছিল অঞ্জনার পার্শ্বচারিণী। সীমা দেখল, কেতকী প্রেজেন্টেশনের জিনিসগুলোর নাম সরবে ঘোষণা করে লিখে রাখছে।

সীমা অঞ্জনার হাতেই তার সামান্য প্রেজেন্টশানটুকু তুলে দিলে। কেতকী প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে সীমার দেওয়া কৌটোটা নিয়ে খুলে ফেলতেই কয়েকটা লজেন্স ছত্রাকার হয়ে ছিটকে পড়ল। অমনি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ল ঘরখানা।

কেতকী ততক্ষণে সরবে ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে, সীমা বোস—লজেন্সের কৌটো।

মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা লজেন্সগুলো কেউ তুলল না। ওগুলো যেন সীমার দীনতার সাক্ষী হয়ে সবার চোখের ওপর জেগে রইল।

বর নিজেই জিজ্ঞেস করল অঞ্জনাকে, এঁকে তো চিনতে পারলাম না।

অঞ্জনা বলল, পড়ত একসময় আমার সঙ্গে।

সীমার মনে হল অঞ্জনা তার পরিচয়টা বরপক্ষের কাছে দিতে লজ্জা বোধ করছে।

গৌরী বসে আসর মাতাচ্ছিল। সে এগিয়ে এল সীমার কাছে।

হাঁরে আজকাল কি করছিস তুই, শুনেছিলাম যেন কোথাকার একটা ইউনিভারসিটিতে কাজ করিস?

চিরদিনই কেতকীর ঠোঁটকাটা বলে সুনাম আছে। সে এগিয়ে এসে গম্ভীর হয়ে বলল, সীমা এখন কাজ করছে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে।

সকলে কথাটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই কেতকী বলল, কলকাতা ইউনিভারসিটিতে কাজ করছে লজেন্স বিক্রির।

হা হা হা হা করে হাসির রোল উঠল।

হাসি থামলে সীমা অনুত্তেজিত গলায় বলল, কার্ড দিয়ে বড় ভুল করেছিস ভাই অঞ্জনা। তখন ভাবতে পারিসনি যে আমি আসব। এখন ভারী আপসোস হচ্ছে মনে মনে, তাই না? তবে তুই হয়ত জানিস না আমি যা, তার বাইরে নিজেকে কোনদিনই আমি জাহির করি না। ময়ূরের পাখা যোগাড় করে আনলে দাঁড়কাক শুধু যে ময়ূর হতে পারে না তা নয়, নিজের জাতি থেকে সে ছিটকে পড়ে। চেষ্টা করলেও ভাই আমি আমার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আর পাঁচজনের মত পাল্লা দিয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সাজতে পারব না।

সীমা উঠে দাঁড়াল। বাসরঘর নিস্তব্ধ। চলে যাবার আগে বরের দিকে হেসে তাকিয়ে নমস্কার করে বলল, ক্ষমা করবেন রসভঙ্গ করলাম বলে। আমার বন্ধু অঞ্জনাকে এই রসকষহীন বন্ধুটিকে ডাকার জন্যে গঞ্জনা দেবেন না এই আমার একান্ত অনুরোধ।

সীমা বাসরঘর ছেড়ে চলে গেল। সবাই তাকিয়ে রইল তার চলে যাবার পথের দিকে। কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

সেদিন ঘরে ফিরতে সীমার বেশ কিছু রাতই হয়ে গেল। স্টেশানে সে যখন নামল তখন রাত এগারোটা। চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ। সীমা আপনমনে হেঁটে চলছিল। অঞ্জনার বিয়ের বাসরের ঐ ঘটনাটাকে সে কিছুতেই মনের

থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। মানুষ যে এমন হৃদয়হীন হতে পারে, তাদের পরিহাস যে এত নীচু মানের হতে পারে তা যেন ভাবতে পারছিল না সীমা। আবার নিজের ওপর দুঃখও হল তার। সে গরীব আর ওরা বড়লোক, এই অসম বন্ধুত্ব কখনও যে হতে পারে না, এটা বোঝা অন্ততঃ তার উচিত ছিল।

নানা কথা ভেবে ভেবে একমনে পথ চলছিল সীমা, হঠাৎ পেছনে একটা সাইকেল রিক্‌শার ঘণ্টা বেজে উঠল।

সীমা পথের ওপব থেমে গিয়ে রিক্‌শাটাকে চলে যাবার পথ দিল। সীমার পাশাপাশি এসে রিকশাটা থেমে গেল। রিক্‌শা থেকে নেমে পড়ল তার চালক। সে আবছা অন্ধকারে সীমাব দিকে তাকিয়ে বলল, রিক্‌শাতে উঠুন দিদি, আমি পেঁাছে দিয়ে আসছি।

সীমা বলল, এটুকু পথ দিব্যি আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব।

রিক্‌শাওয়ালা বলল, আপনি তো বলছেন, আমি চলে যেতে পারব, কিন্তু এত রাতে আমি আপনাকে একা যেতে দিই কি করে বলুন তো। যদি না দেখতাম তাহলে একরকম হত, কিন্তু দেখা যখন হয়ে গেল।

সীমা কোনদিন রিক্‌শাতে ওঠে না। তবে রিক্‌শাওয়ালারা প্রতিদিন তাকে ঐ রাস্তায় আসা যাওয়া করতে দেখে, তাই হয়ত ওরা সীমাকে চেনে।

সীমা বলল, সত্যি কথা বলি ভাই রিক্‌শাতে যাবার মত পয়সা আমার নেই।

রিক্‌শাওয়ালা অমনি বলে উঠল, তাতে কি হয়েছে, আমি এত রাতে যে কোন খদ্দের পাব এ আশা করিনি। আর পেলে স্টেশানেই দু' একটি যা পেতাম, পথে পাবার আশা করিনি এত রাতে। আপনি উঠুন তো দিদি, পয়সার কথা ভাববেন না। পয়সা মানুষ ঢের রোজগার কবে।

সীমা বলল, তোমার পয়সার পবোয়া নেই, কিন্তু আমার তো আছে ভাই। তুমি নেবে না ঠিক, কিন্তু আমি না দিয়ে উঠি কি করে।

রিক্‌শাওয়ালা বলল, দিদি আপনি যখন উঠবেনই না তখন আমিও আর রিক্‌শায় উঠছি না। চলুন আপনার পাশে হেঁটে হেঁটেই যাই।

সীমা হাঁটতে শুরু করেই বলল, সে কি করে হয়, হাঁটা আমার কাজ, কিন্তু তা বলে, আমার জন্যে আর কেউ কষ্ট পাবে এ আমি চাই না।

হেসে উঠল রিক্‌শাওয়ালা, কষ্ট কি বলছেন দিদি, বরং আপনাকে এত রাতে পথে পেছনে ফেলে চলে গেলে রাতে ঘুমুতে পারব না। জায়গাগুলো বড় বিচ্ছিরি কিনা, তাই বলছি।

সীমা বলল, তবে ওঠ রিক্‌শায়, আমিও উঠছি, যখন তুমি আমার কথা একবারে শুনবেই না।

মনে হল রিক্‌শাওয়ালা খুশী হয়েছে। সীমা তার রিক্‌শায় গিয়ে বসল।

এইটুকু পথ আসতে আসতে সীমার সঙ্গে অনেক কথা হল রিক্‌শাওয়ালার।

রিক্‌শাওয়ালা বলল, ওদিকের পুব কলোনীতে শুনেছি কয়েকটা ছোঁড়া খুব মস্তান হয়েছে। ওরা দল তৈরি করেছে। রাত বারটার পর এ অঞ্চলগুলো,

ওদের রাজ্য। আপদবিপদে কোন পথচারী গেলে তাদের কাছ থেকে যা পায় কেড়ে নেয়। তাছাড়া স্টেশানের কাছে সিনেমা হাউস থেকে রাতের শোয়ে বই দেখে এদিকের কোন যাত্রী যখন ফেরে তখন তার সব কেড়েকুড়ে নেয়। অবশ্য এত রাতে এদিকের যাত্রী বড় একটা থাকে না।

সীমা বলল, এরা কি শুধু এই ছিনতাই-এর কাজই করে ?

না দিদি, কেবল ঐটুকু কাজের জন্যে ওরা পথে বেরোয় না, রাত গভীর হলে ওরা ওয়াগন ভাঙার কাজ করে।

সীমা বলল, পুব কলোনীর ছেলেদের কথা বলছ ?

হাঁ দিদি। আগে একদল পেশাদার বদমায়েশ ভাঙত, এখন ঐ ছোঁড়াগুলো ঐ কাজে হাত পাকাচ্ছে।

সীমা বলল, বল কি ?

রিক্‌শাওয়ালা বলল, মারামারি প্রায় লাগে ওদের দুদলে। তবে উঠতি দলটা বোমবাজিতে ওস্তাদ, তাই পুরোনো দলটা একটু বেকায়দায় পড়েছে। ওরা সাবেক কালের ছোরাছুরি নিয়ে চোরাগোপ্তাই জানে।

বোমবাজির কথা শুনে সীমার বুকখানা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সীমা বলল, তাহলে দু'দল চোরাকারবারীতে মারপিট লেগেই আছে বল।

রিক্‌শাওয়ালা বলল, মজার ব্যাপার কি জানেন, ওদেয় মারামারিয় ভেতর যদি রেল পুলিস এসে পড়ে তাহলে তাদের আর নিস্তার নেই। তখন দু'দলের মারামারি এক নিমেষে থেমে যায়। ওরা তখন একজোট হয়ে পুলিসকে তাড়া করে।

দুঃখের ভেতরও সীমার হাসি পেল।

সীমা বলল, দেখ, এইসব ছেলেরা যদি কিছু লেখাপড়া শিখত তাহলে এতটা নীচু কাজ হয়ত করতে পারত না।

রিক্‌শাওয়ালা বলল, পড়ে শুনে কি হবে বলুন, চাকরিবাকরির দফা শেষ। এই তো আমাদের রিক্‌শা এ্যাসোসিয়েশনে তিনজন মেম্বার আছে, গাড়ি চালায়, তারা কলেজে পাস দিয়েছে।

একটু থেমে রিক্‌শাওয়ালা আবার বলল, এই যে ছোঁড়াগুলোর কথা বলছিলাম, ওয়াগন ভাঙে, ওদের একজন নাকি কলেজের ছাত্র।

সীমার মনে হল তার মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে গেল।

মানিক এ কাজ করে না তো! সে যে বোমা বানাচ্ছে আজকাল, তা পাড়াপ্রতিবেশীর কথা থেকেই সে আঁচ করেছিল। তবে সেটা হয়ত রাজনৈতিক কোন কাজের উদ্দেশ্যে। সেখানে তার সমর্থন থাক বা না থাক, কাজটা খুব গর্হিত বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ওয়াগন ভাঙছে মানিক আর সেজন্যে বোমা তৈরি করছে, এ কথা ভাবতে গিয়ে সারা শরীরটা তার অসাড় হয়ে এল।

সীমা রিক্‌শাওয়ালার কথার উত্তরে ওকেই আবার প্রশ্ন করে বসল, তুমি জানলে কি করে যে ওদের ভেতর একজন কলেজের ছাত্র ?

কথা হাওয়ায় ওড়ে দিদি। কবে ওয়াগান ভাঙা হবে, কারা ভাঙছে সব

খবর আমাদের কানে এসে বাজে।

সীমা বলল, তোমরা যদি আগেভাগে জানতে পার তাহলে পুলিসকে খবর দাও না কেন?

রিক্শাওয়ালাটি রিক্শা চালাতে চালাতে প্রায় থেমে গেল, কি বলছেন দিদি, আমরা দেব পুলিসকে খবর! তাহলে আর এ তল্লাটে রিক্শা চালিয়ে খেতে হবে না। হয় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, না হলে প্রাণটা ওদের হাতেই তুলে দিতে হবে।

সীমা বলল, এমনি ভয়ের ভেতর কতদিন তোমরা কাজ করতে পারবে?

যে ক'দিন ওদের না ঘাঁটিয়ে চলে দিদি। শুধু কি তাই, বিনি ভাড়ায় দরকার হলে ওদের চোরাই মালও বয়ে দিয়ে আসতে হয।

তোমরা নিজেরা দল গড়ে প্রতিরোধ করতে পার না?

পারতে গেলে বোমা চাই। বোমার জবাব বোমাতে না দিলে আমাদের হার। এখন বলুন সারাদিন ঘরে বসে বসে বোমা বানাব না ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে দু'পয়সা রোজগার করব।

সীমা হয়ত কোন উত্তর দিতে পারত, কিন্তু সে উত্তর তাহলে হয়ে যাবে দার্শনিকসুলভ। বাস্তব সমস্যার সঙ্গে হয়ত তার কোন যোগ থাকবে না।

সীমা বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়ল।

বলল, এইখানেই নামব ভাই।

রিক্শাওয়ালা রিক্শা থেকে নেমে দাঁড়াল। সীমা ব্যাগ খুলে পয়সা দিতে যেতেই সে বলল, সে কি দিদি, আমি নিজেই তো আপনাকে ডেকে তুললাম।

তা হোক, এতটা পথ তুমি এসেছ, একেবারে পয়সা নেবে না, এ কি করে হয়।

রিক্শাওয়ালা রিক্শাতে উঠতে উঠতে বলল, দিদি বলে ডাকলাম, আমাকে পয়সা দিয়ে পর করে দেবেন।

সীমা আর পয়সা দিতে পারল না। সে শুধু বলল, এ কথা কে বলে ভাই। যেখানে পয়সার ওজনে মানুষের ওজন হয় সেখানে তোমার এই হিসেব আজকের দিনে অচল।

তারপর সীমা তার ব্যাগ থেকে গোটাকয়েক লজেন্স বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, এগুলো তোমার দিদির দান বলে নিলে খুব খুশী হব।

রিক্শাওয়ালা সীমার দেওয়া লজেন্সগুলো মাথায় ঠেকিয়ে নিল, তারপর গাড়িখানা চালিয়ে চলে গেল।

সীমা অনেক রাতেই আজ ঘরে ঢুকল। মানিক আজকাল ঘরে থাকে না বললেই হয়। সীমা কর্তব্যের খাতিরে মাসের প্রথম দিকে কিছু টাকা ওর বিছানার ওপর রেখে দিয়ে আসে। উদ্দেশ্য, দিদি যে তার কর্তব্য ঠিকই করে চলেছে তা সে বুঝুক।

আজ ঘরে ঢুকে সীমা দেখল, তার বিছানার ওপর একখানা চিঠি পড়ে

আছে। চিঠিখানা অবশ্য কোথাও থেকে আসেনি। এই বাড়িতে বসেই পত্রলেখক এই চিঠি রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ মানিকই চিঠিখানা রেখে দিয়েছে এখানে।

চিঠি পড়ে সীমা বুঝল, 'বিশ্বহিতৈষী' পত্রিকায় তার সম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছিল তা পড়ে কোন একটি কোম্পানির লোক তার খোঁজে এসেছিল। তারা সীমাকে চাকরি দিতে চায়।

সীমার মনটা চাকরির ওপর হঠাৎ যেন বিষিয়ে উঠল। সে চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। না, সে আর চাকরির পেছনে ছুটবে না। তার চেয়ে কিছু না করাও ঢের ভাল। সীমার মনটা আজ বড় ক্লান্ত ছিল। সে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। পরের দিন যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সূর্য অনেকখানি উঠে গেছে। সে আর ঘরের বাইরে বেরবে না বলেই ভেবে নিল।

রোজ সে খুব ভোরে ভোরেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে, তাই দিনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার পরিচয় বড় কম। ফেরে সেই রাত্তিরে। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘরে আটকে পড়ে সেদিন তাকে একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল।

তখনও মানিক ঘুমুচ্ছিল। কত রাতে সে ঘরে ফিরেছে সীমা কিছুই জানে না। সে বাইরে পায়চারি করছিল। একদল লোক সেখানে এসে হল্লা শুরু করে দিলে।

এ্যায় মানিকবাবো, বাহার আইয়ে।

সীমা এগিয়ে গিয়ে বলল, কি দরকার তোমাদের এখানে?

মানিকবাবোর কাছে টাকা পাওনা রইয়েছে।

সীমা দেখল এরা অবাঙালী। ভাঙা বাঙলাতেই কথা বলার চেষ্টা করছে।

কিসের টাকা পাওনা?

আরে দিদি, হামলোগকো বলল, তুমলোগ হামাদের পার্টির প্রশেসানমে চলো। মাথাপিছু তিন রুপেয়া করকে মিলেগা। হামলোগ বললে, ওদিন আউর এক পার্টিকা প্রশেসানমে লাইন লাগাকে হামলোগোকো চার রুপেয়া করকে মিলা। তো মানিকবাবো বলা, পহিলে লাইন লাগাও, পিছু জরুর মিলেগা। ও পার্টিসে এ পার্টি বহুৎ দেনেবালা। মানিকবাবোকা বাতসে হামলোগ লাইন লাগায়া। আজ চার রোজ হইয়ে গেলো এক রুপেয়া ভী নেহি মিলা। রোজ বলতা দেগা, দেগা, আভি তক্ নেহি মিলা।

ততক্ষণ মানিকবাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি জেগেই বুঝতে পেরেছেন, দিদি ঘরের বাইরে আজ যায়নি।

মানিক ঘুমজড়ান লাল লাল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে হামলা করছ কেন? যাও এখান থেকে।

ওদের দলের পাণ্ডা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, রুপেয়া দে দো, হামলোগ জরুর চলা যায়েগা।

কাল বটতলার পাশে সন্ধ্যায় এলে টাকা পেয়ে যাবে। বাবু নিজে এসে

তোমাদের টাকা দিয়ে দেবেন।

হামলোগ কই বাবুকো নেহি জানতা, তুমলোগোকো রুপেয়া দেনে পড়েগা।

আচ্ছা, এখন যাও, বললাম তো কাল পাবে।

লোকগুলো গজরাতে গজরাতে শাসিয়ে চলে গেল।

সীমা বলল, কিসের টাকা মানিক?

সে তুমি বুঝবে না।

সীমা বলল, ওরা যা বলে গেল তা যদি ঠিক হয়, তাহলে পার্টি'র প্রশেসানে লোক সাপ্লাই করার দালাল হয়েছ তুমি।

কি বললে, দালাল। হাঁ তাই যদি হয়ে থাকি, তাতে তোমার কি। ক'টা টাকা মাস মাস দিচ্ছ বলে মাথা কিনে রেখেছ নাকি।

সীমা উত্তেজিত হয়ে বলল, এ কাজ করতে মাথাটা নীচু হয়ে আসছে না তোর! ওয়াগন ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছিস নাকি রে?

ইস্পাতের ছুরির মত ঝিকিয়ে উঠল মানিকের চোখ, বেশ করি ওয়াগন ভাঙি। বুদ্ধির জোরে, কব্জির জোরে ভাঙি। সারাদিন পথে পথে ঘুরে ঐ লজেন্স বিক্রির মত ছুঁচো কাজ করি না।

কি বললি, লজেন্স বিক্রি ছুঁচো কাজ!

নয় তো কি, রাস্তায় ঘাটে লোকে আমাকে বলে, তোর দিদি লজেন্সওয়ালী। গর্বে তো বুকখানা আমার এত বড় হয়ে যায়! যা যা, আর মেলা বকাসনে।

সীমা আর কোন কথা বলল না সমস্ত শরীর যেন তার অসাড় হয়ে গেছে।

ঘরের ভেতর বসে তার মনে হল, এই ভাইকেই সে খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করেছে। কত আশা ছিল তার, ভাই বড় হবে। হয়ত কোথাও একটা চাকরি করবে। একটা দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসবে ঘরে। কতদিন এমনি কত কল্পনা করেছে সে। কিন্তু আজ সব ভাবনা তার শেষ হয়ে গেল। আবার মনে হল সীমার, সত্যিই তো সে লজেন্সওয়ালী। তার বেশী সে কিছু নয়। সকলেই তো তাকে ঘৃণা করে। সে যে শিক্ষিতা হয়েও লজেন্স বিক্রির সামান্য কাজটুকুকে বেছে নিয়েছে সেজন্যে কে তাকে কবে প্রশংসা করেছে। ভাবতে ভাবতে সীমার মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল, সবাই যেন তাকে চারদিক থেকে তাক করে করে রাশি রাশি লজেন্স ছুঁড়ে মারছে। সবাই যেন তার কানে তালা লাগান চীৎকারে বলছে, লজেন্সওয়ালী, লজেন্সওয়ালী, লজেন্সওয়ালী!

সীমা মাথা ঘুরে ঘরের দাওয়ায় পড়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে যখন দুটি লোক এল তার কাছে, তখন সীমা একটু সুস্থ হয়েছে। ওরা বাইরের দাওয়ায় বসল শতরঞ্জের ওপর।

সীমা নমস্কার করে বলল, বলুন কি চাই আপনাদের?

কাল আমরা আপনাকে না পেয়ে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলাম, আশা করি পেয়েছেন।

সীমা কাল হলে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় করে দিত হয়ত, কিন্তু আজ সে তা করল না। সে মাথা নেড়ে জানাল যে চিঠি সে পেয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন তখন বলল, কাগজে আপনার শিক্ষাদীক্ষা আর কাজকর্মের সম্বন্ধে কিছু খবর বেরিয়েছিল। তাই দেখে আমাদের কোম্পানির মালিকপক্ষ আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করার জন্যে পাঠিয়েছেন।

বলুন আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্যে ?

ওদের মধ্যে আর একজন বলল, না না, আপনার কিছু করার ব্যাপার নয়। আমাদের কোম্পানি নতুন একটি কাজে সম্প্রতি হাত দিয়েছে। কয়েকটি প্রোডাক্ট ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে। আবার অতি সম্প্রতি 'মলিন মুক্তি' বলে একটি গুঁড়ো ধোলাই সাবান তৈরী করেছে। আর এ জন্যেই আপনার কাছে আসা।

সীমা বলল, আপনারা আমার সম্বন্ধে ভেবেছেন বলে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আপনাদের ঐ সাবান নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরি করে বেড়াতে পারব না।

প্রায় জিভ কেটে একজন বলল, আপনি আমাদের আসার আসল কারণটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি, তাই এমন করে বলছেন।

একটু থেমে লোকটি বলল, আপনি গুঁড়ো সাবান ফিরি করে বেড়াবেন কোন্ দুঃখে। আমাদের কোম্পানির ডাইরেক্ট বাহাদুরের ইচ্ছে, আপনি এই প্রোডাক্টগুলোর প্রচারের পুরোপুরি দায়িত্ব নিন। যাকে বলে পাবলিসিটি অফিসার। আপনার আণ্ডারে বহু মেয়ে প্রচারের কাজ করে বেড়াবেন।

সীমা বলল, অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে না দিয়ে আপনাদের ডাইরেক্টর বাহাদুর আমাকেই বা পাবলিসিটি অফিসারের পদটি দিতে চাইছেন কেন ?

লোকটি বলল, আমাদের ডাইরেক্টর বাহাদুর বড় গুণগ্রাহী মানুষ। তিনি মনে করেন, যিনি এত বড় শিক্ষিতা হয়েও লজেন্সবিক্রির কাজকে ছোট কাজ বলে মনে করেন না, তিনি দেশের কাছে আদর্শ। এমন একজন মহিলা তাঁর ফার্মে থাকলে শুধু তাঁরই উন্নতি হবে না, সারা দেশ ব্যবসায়িক দিক থেকে উন্নত হবে।

সীমার মনে হল, এতদিনে অন্তত একটি লোকও তাকে মর্যাদা দিল।

বেশ, রাজী আছি আমি, এখন কি করতে হবে বলুন ?

এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার সঙ্গে করেই এনেছি, কিন্তু আপনাকে একবার কলকাতার বাইরে ডাইরেক্টর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। খরচপত্র সব কোম্পানির।

আগে বাইরে কোথাও যাবার কথা শুনলে হয়ত ভয় করত তার, কিন্তু আজকের ঘটনার পরে সে বাইরে যাওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করল।

সীমা পথঘাটের হদিস জেনে নিল লোকগুলির কাছে। ভোর সাতটাতে একটা ট্রেন আছে। সে ট্রেন নির্দিষ্ট স্টেশানে পেঁছিবে দুটোর কাছাকাছি। ঐ ট্রেনেই সীমা যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল।

ওদের ভেতর একজন বলল, আমি আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি, সুতরাং আপনার কোন অসুবিধেই হবে না। কাল স্টেশানে থাকব আমি।

সীমা স্টেশানে নেমেই দেখতে পেল লোকটিকে। স্টেশানের বাইরে এসে

দেখল ঝকঝকে একখানা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

লোকটি আপ্যায়ন করে সীমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে চলল। ছোট ছোট দু'একটা টিলা তার মাঝ দিয়ে পথ। বনের ছায়া কোথাও পথে এসে পড়েছে। কালটা নাতিশীতোষ্ণ। ফাল্গুনের কাছাকাছি। কয়েকটা শালগাছের জটলা পেরিয়ে এল ওরা। মঞ্জরী এসেছে শালের শাখায়। সীমা ভুলে গেল তার ট্রেনের ক্লান্তি। বুক ভরে সে নিশ্বাস টানতে লাগল। আঃ, এত মুক্তিও ছিল তার জন্যে সঞ্চিত।

ঐ তো একটা ছোট্ট নদী টিলার কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে। সাঁওতালদের বসতি মনে হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেগুলো খেলা করছে উঠোনে। কুকুরগুলোও খেলছে তাদের সঙ্গে। কি শান্ত জীবন। উদ্বেগহীন প্রসন্নতা যেন ছড়িয়ে আছে এখানকার আকাশে মাটিতে। সীমার মনে হল, এমন সুন্দর একটা জায়গায় সে সারাজীবন যে কোন একটা কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

গাড়িটা সীমাকে এনে পৌঁছে দিল একখানা প্রাসাদের মত বাড়ির সামনে। গেট খুলে দিল বন্দুকধারী দরোয়ান। লনের পাশ দিয়ে গাড়িটা বাড়ির বাঁ দিকের একটা জায়গায় এসে থামল। সীমা গাড়ি থেকে নেমে দেখল সামনের লনে নানারকমের রঙ-বেরঙের সিজ্‌নু ফ্লাওয়ার ফুটে আছে।

লোকটিকে অনুসরণ করে সীমা এল একতলার একখানা ঘরে। এটি অফিসঘর বলেই তার মনে হল। মূল বাড়ি থেকে এ ঘরটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সীমাকে লোকটি বলল, আপনি বসুন, সাহেবকে আমি খবর দিচ্ছি।

লোকটি চলে গেলে সীমা দেখল, ঘরখানা ফাইল-পত্রে বোঝাই।

একটু পরেই লোকটি ফিরে এসে বলল, সাহেব এখন ফ্যাক্টরীতে রয়েছেন, আপনি সামনের গেস্ট হাউসে চলুন, নাওয়া খাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন, রাত আটটা নাগাদ উনি ফিরবেন, তখন ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

লোকটি সীমাকে গেস্ট হাউসে এনে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সীমা ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ঘরখানা ছবির মত সাজান। সীমা এমন একখানা পরিপাটি করে সাজান ঘর কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। ঘরের দেয়াল জুড়ে বিলিতি সব ছবি। একদিকের দেয়ালে একখানা জাপানী ক্যালেন্ডার ঝুলছে। সীমা উলটে দেখল, ছ'খানা নারীমূর্তি। ঘরের কোণে আর একখানা পাথরের মূর্তি। সীমা কাছে গিয়ে দেখল, মূর্তিখানা গ্রীকদেবতা এ্যাপোলোর। শ্বেতপাথরে গড়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে সীমা সত্যিই মুগ্ধ হল। এমন পৌরুষ আর লাবণ্যের মিশ্রণ বুঝি আর কোন মূর্তিতে নেই। আকর্ষণ করার মত দেহভঙ্গিমা বটে। সীমা সারা ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জানালা খুলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল একটা প্রসারিত জলাশয়ের ওপর। নীচে ছোট সাদা রঙের একখানা নৌকো। কি সুন্দর জায়গাটা। সীমা হঠাৎ চোখ বন্ধ করল, তারপর আবার চোখ খুলল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, স্বপ্ন দেখছে না তো। ঘরখানা আগেই বন্ধ করেছিল। এখন সে স্নানের ঘরের দরজাটা খুলল। স্নান করে নেবে।

ট্রেনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সে গা এলিয়ে দেবে এই সুখ-শয্যায়। হোক একদিনের পাওয়া, তবু জীবনে যে সুখ সে কোনদিন অনুভব করেনি, আজ যখন অযাচিতভাবে সে সুখ-ভোগের সুযোগ এসেছে তখন সে তা হারাবে না। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সীমা স্নান করতে লাগল। তার মনে হল, মুক্তোর দানার মত জলের ধারাগুলো তার সর্বাঙ্গে ঝরে ঝরে পড়ছে, দেখ, সুখ কত সুন্দর, কত তৃপ্তি এনে দেয়।

স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না সীমার, কারণ ঘরের দরজা সে ভেতর থেকে বন্ধ করেই রেখেছিল। একটু খারাপ ছিল বুঝি বাথরুমের দরজাখানা, ভেজিয়ে দিতে গেলেই খুলে যায়। থাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তার।

এদিকে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটছিল সীমার পাশের ঘরে।

যে লোকটি সীমাকে ঘরখানা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল, সে সীমার পাশের ঘর থেকেই দৃষ্টি রেখেছিল সীমার ওপর। সীমার ঘরের ওপরের ঘুলঘুলি দিয়েই সে তীক্ষ্মভাবে চেয়ে ছিল সীমার দিকে। দেখছিল তার প্রতিটি আচরণ। যখন স্নান করছিল সীমা, তখনও সে দেখছিল সীমার স্নানলীলা!

কিছুক্ষণ পরে সে লোকটি নেমে এল ওপর থেকে। বাইরে বেরিয়ে যাবে এমন সময় তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখে লোকটি বলল, এই যে দেবী সঞ্চারী, অসময়ে অধীনকে মনে পড়ল!

মেয়েটির দেহের গড়ন দর্শনীয়, রঙও উজ্জ্বল, কিন্তু সারা মুখে বসন্তের গভীর দাগ তার সব আকর্ষণই নষ্ট করে দিয়েছে।

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, ও ঘরে নতুন আমদানী বুঝি?

লোকটি বলল, দেখেছ তাহলে। কিন্তু আমি কি করব বল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

তা ভাল। পছন্দ হয়েছে তোমার। মেয়েটিকে সুন্দরী বলেই মনে হল।

লোকটি হেসে বলল, আমার পছন্দ যে ভাল তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। আজ বসন্তের কোপে না পড়লে তোমার নখের যুগ্যি হতে পারত ঐ মেয়েটা।

মেয়েটি প্রশংসায় গলে গেল না। সে তেমনি স্থির গম্ভীর গলায় বলল, আমার মত ওকেও কি স্বামীর সংসার থেকে ছিনিয়ে আনলে নাকি?

লোকটি বলল, আনকোরা নতুন, কপালে এখনও সূর্যোদয় হয়নি।

তবু ভাল। দুঃখটা একতরফাই হবে। একাই মেয়েটা কাঁদবে।

আচ্ছা সঞ্চারী, আজ নাহয় ভগবানের মারে তুমি তোমার মর্যাদা হারিয়েছ, কিন্তু সত্যি করে বল, এতদিন সাহেব তোমাকে পেয়ার করেনি।

অশেষ দয়া তার। এখন একেবারে তাড়িয়ে না দিয়ে রান্নার কাজে লাগিয়েছেন।

তুমি কেন ভাবছ সঞ্চারী। আমি থাকতে তোমাকে কোনরকম দুঃখই পেতে দেব না। তুমি এতদিন সবার ছিলে, এখন শুধু আমার হবে। বিশ্বাস কর

আমি তোমাকে আগের মতই ভালবাসি।

সঞ্চারীর মুখে একটুকরো বাঁকা হাসি খেলে গেল।

সে বলল, এখন চললে কোথায়, সাহেবকে খবর দিতে ?

হাঁ তাই। ভয় ছিল মেয়েটা বাগ মানবে কিনা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভাববার কিছু নেই।

কি করে বুঝলে ?

ঐ তোমার ঘবের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখলাম। তোমার বেলা যেমন কবে দেখেছিলাম, ঠিক সেই কায়দায়।

কি দেখলে ?

মেয়েটা একটা একটা কবে জাপানী মেয়েগুলোর ছবি ওলটালো। তারপর ঐ উলঙ্গ এ্যাপোলোর মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। এরপর বোঝার কি বাকী থাকে বল। এখন টোপ ফেললেই গিলবে।

মেয়েটি বলল, যাও আর দেরি কর না। জীবনে অনেক কিছু দেখলে, অনেক কিছু পেলে। তবু দেরি করা ঠিক নয়। পুরস্কারটা হাত ফসকে যেতে পারে।

অদৃশ্য কোনকিছুর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে লোকটি বলল, পুরস্কারের কথা বলতেই হবে না। কাজটা মনের মত হলেই সাহেব একেবারে মা বাপ। তখন টাকাকে টাকা জ্ঞান থাকে না। বলেন, একেবারে দু'হাত ভরে নাও যত বাণ্ডিল নোট ওঠাতে পার। এমন লোক দেখেছ কখনো ?

মেয়েটি বলল, সত্যিই নমস্য।

লোকটি চলে যেতে যেতে বলল, একটু লক্ষ্য রেখ। নতুন শিকার তো, যা চাইবে তাই দেবার চেষ্টা করো। আমি গাড়ি নিয়ে আবার আসব সাড়ে সাতটায়। সাহেব থাকবেন ঝিল-মঞ্জিলে। ওখানেই রাতে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

মেয়েটি বলল, আমি রইলাম রান্নার কাজে, তদারক করা আমার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়।

না না, সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। পাখি পালাবে না। আর পালাবেই বা কি করে। গেটে রয়েছে দুর্জয় সিং। বাজের মত চোখ আর নখ তার। ছোঁ মেরে ধরে নেবে।

লোকটা হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেল।

সীমা স্নানশেষে বেল বাজিয়েছিল। সঞ্চারী গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে এল। সে সময় একটু কথা হয়েছিল সীমার সঙ্গে সঞ্চারীর।

আপনি বুঝি এই বাড়িতে থাকেন ?

সীমা সাধারণভাবে প্রশ্ন করল।

সঞ্চারী বলল, এখানে অনেকগুলো বাড়ি আছে মালিকের। আমাকে এখানে ওখানে প্রায় সব জায়গাতেই থাকতে হয়।

আপনি কেবল রান্নার কাজ নিয়েই থাকেন ?

এখন তাই থাকতে হচ্ছে। আগে আমার অন্য কাজ ছিল।

সীমা মেয়েটির আগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করল না। সে শুধু বলল, আপনাদের এ জায়গাটা যত দেখছি ততই ভাল লাগছে, যেন একখানা ছবি।

মেয়েটি বলল, অভিজ্ঞতা তো আস্তে আস্তে হয়, এর পর আরও অনেক কিছু দেখবেন।

মেয়েটি চলে গেল। সীমা খাওয়ার শেষে বেল বাজাতে একটা বেয়ারা এসে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে চলে গেল। সীমা দরজা বন্ধ করে টানা একটা ঘুম দিল। দরজায় টোকা না শুনলে সে হয়ত উঠত না। উঠে পড়েই সে বুঝল ঘরটা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। সুইচটা সে হাতড়ে না পেয়ে দরজাটা এমনিই খুলে ফেলল।

সেই মেয়েটি আবার এসেছে।

সীমা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন অন্ধকারে ভরে গেছে ঘরখানা, সুইচবোর্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না, আপনি একটু জ্বালিয়ে দেবেন ?

মেয়েটি চুপিচুপি বলল, কথা আছে, আলোটা না জ্বালানোই ভাল। বরং ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিন।

মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকে নিজেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

সীমা একটু বিস্মিত হল। কি বলতে চায় মেয়েটি। ততক্ষণে সঞ্চারী খুলে দিয়েছে পশ্চিমের জানালা।

এদিকে আসুন।

মেয়েটির ডাকে সীমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন তো, কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?

সীমা দেখল নীচের লেকের মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটি বাড়ি। তার থেকে নানাধরনের আলো লেকের জলে এসে আলোর মালার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমদিকের এ ছবি সীমা আগে দেখেনি। ওখানে যে লেকের ওপরে এমন সুন্দর একখানা বাড়ি আছে তা তার জানা ছিল না।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ভারী সুন্দর তো, যত দেখছি তত ভাল লাগছে জায়গাটা।

মেয়েটি বলল, আর কিছুক্ষণের ভেতরই ঐ বাড়িতে আপনি যেতে পারবেন।

সীমা বলল, কি রকম ?

সাড়ে সাতটা নাগাদ গাড়ি আসবে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে।

ওখানে আমাকে যেতে হবে কেন ?

মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বলল, ডাইরেক্টর বাহাদুরের মনোরঞ্জনের জন্যে।

সীমা চমকে উঠল, মনোরঞ্জন! আপনি কি বলতে চাইছেন একটু খুলে বলুন দয়া করে।

সাতটা বেজেছে, বেশী বলার সময় নেই, এখুনি গাড়ি এসে যাবে।

সীমা ভীষণ ভয় পেয়ে মেয়েটির হাত জড়িয়ে ধরল, বলুন, দয়া করে বলুন, আমার কেমন ভয় করছে।

মেয়েটি বলল, আমি ভুক্তভোগী, তাই বলছি। যে সর্বনাশ আমার হয়েছে, আপনি যাতে সেই সর্বনাশের ভেতর না পড়েন, সেজন্যে সাবধান করে দেওয়া।

বলুন, কি সে সর্বনাশ!

মেয়েটি হাসল, আমার সংসার, স্বামী সব ছিল; সেখান থেকে একদিন ওরা কৌশলে আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাঁকে হত্যা করে আমাকে এখানে এনে তুলল।

কিন্তু, আপনি কি···।

সীমার কথা শেষ হল না, মেয়েটি বলল, না আমি এমন কুৎসিত ছিলাম না আগে। গত বছর ফাল্গুনে বসন্তরোগে আমাকে এমন কুৎসিত করে দিয়েছে। আমার মুখে এই কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।

সীমা অধীর হয়ে বলল, দিদি, আমাকে বাঁচান আপনি।

দুটো পথ বেছে নিতে হবে আপনাকে। একটি হল, ওদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। বিদেশীরা কারবারের সূত্রে এই কোম্পানিতে আসে। তাদের ভোগে লাগতে হবে আপনাকে। ডাইরেক্টর বাহাদুর আগে আপনাকে সব দিক থেকেই পরীক্ষা করে নেবেন।

সীমা বলল, মরে যাব দিদি, আমাকে বাঁচান আপনি।

মেয়েটি বলল, আমি বাঁচাতে পারব না বোন, তবে দ্বিতীয় আর একটা পথ খোলা আছে তোমার সামনে। সে পথে গিয়ে মরলেও তুমি বাঁচবে।

আমি তাই বেছে নেব, সে পথটা আমাকে বলে দিন।

মেয়েটি আঙুল তুলে লেকের দিকে দেখিয়ে দিলে, ঐ তোমার বাঁচার একটি-মাত্র পথ। যদি তুমি সাঁতরে ওপারে উঠে পালাতে পার, তাহলে হয়ত বাঁচবে, আর নয়তো ডুবে গিয়েও বাঁচবে।

সীমা ইতস্ততঃ করে বলল, রাত অন্ধকার, সামনের পথ ধরে কোথাও পালান যাবে না?

মেয়েটি হেসে বলল, আমি তাহলে হয়ত পালাতে পারতাম। কিন্তু এ ঘরে ঢুকলে বোধকরি মরণ ছাড়া বাঁচার পথ নেই। সামনে কড়া পাহারা মোতায়েন হয়ে আছে। কেবল লেকের পথটাই খোলা। কেউ এ পথে যে বাঁচতে পারে তা ওদের ধারণার বাইরে।

সীমা বলল, আমি সাঁতার জানি, আমাকে আপনি নিয়ে চলুন লেকের ধারে। যদি মরি তাহলেও আপনার উপকারের কথা মনে রেখেই মরব।

সময় নেই, এসো আমার সঙ্গে। যদি বেঁচে যাও মনে রেখ আমার কথা। না, আমাকে উদ্ধার করার কথা বলছি না, আমার বাইরের পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার পথ আছে খোলা। ভগবান তোমাকে বাঁচান, এই আমার প্রার্থনা।

খিড়কির পথ দিয়ে ওরা এল লেকের ধারে। নৌকো বাঁধা আছে, কিন্তু

ওকে ব্যবহার করা চলবে না। সীমা জানে না, কেমন করে নৌকো বাইতে হয়। নৌকোর সাহায্য নিলে ধরা পড়ারই সম্ভাবনা। সে ধীরে ধীরে জলে গিয়ে নামল। হাঁসের মত জল কেটে সে এগিয়ে চলল ঐ জলমহলের আলো লক্ষ্য করে। জলমহলের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে যেতে যেতে সে শুনতে পেল গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ। গাড়িটা ঐ জলমহল থেকে বেরিয়ে লেকের ভেতরে বাঁধান পথ ধরে বিদ্যুৎগতিতে প্রায় তার পাশ দিয়েই চলে গেল। তাকেই তাহলে আনতে চলেছে এ গাড়ি। সীমার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এল।

সীমা জল থেকে কূলে যে কি করে উঠল তা সে জানে না। একটা বিকট ভীতির রাক্ষস তাকে যেন তাড়া করে এগিয়ে নিয়ে চলল।

সীমার সারা শরীর সিক্ত, পা ক্ষতবিক্ষত। অন্ধকার পথে সে উঠছে পড়ছে। না, তবু সে থামবে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু তার থামার উপায় নেই।

সামনে একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ আলোটাকে লক্ষ্য করে সীমা ছুটে চলল। ক্রমে আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। তাহলে লোকালয় আছে ওখানে। আলোর কাছে সীমাকে একসময় পেঁৗছে দিয়ে পথটা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল।

একটা ভীষণ উদ্বেগ থেকে একটা নিশ্চিন্ততার ভেতর পেঁৗছে সীমা যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সে একটি ঘরের সামনে এসেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

শব্দটা কানে গিয়েছিল দিবাকর মিশ্রের। তিনি পড়া ফেলে হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আলো তুলে দেখলেন, কি সর্বনাশ, তাঁরই ঘরের বাইরে একটি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে! বৃদ্ধ দিবাকর তানিয়া তানিয়া বলে কাকে যেন ডাক দিলেন। একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে—কেনে ডাকছিস বাবা, বলতে বলতে দৌড়ে এল। দিবাকর বললেন, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আয় ভেতর থেকে। তিনি নত হয় মেয়েটিকে পরীক্ষা করলেন। সারা গা যে ভেজা। তানিয়া জল নিয়ে আসতেই তিনি মেয়েটির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই সীমা চোখ মেলল। আবার চোখ বন্ধ করে ভাববার চেষ্টা করল। শেষে পেছনের ঘটনাগুলো যখন তার মনে পড়ল তখন সে উঠে বসল মাটির ওপর।

দিবাকর মিশ্র আর তানিয়া সীমার হাত ধরে তাকে নিয়ে এল ঘরের ভেতর।

সীমা কিছু বলার চেষ্টা করছিল, মিশ্র মশায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কিছু বলার দরকার নেই মা, তুমি আগে বিশ্রাম করে সুস্থ হও।

তানিয়ার সাহায্যে সীমা তার ভেজা পোশাক পরিবর্তন করে একটি বিছানায় আশ্রয় নিল। তাড়াতাড়ি করে এক বাটি গরম দুধ সীমাকে খাওয়ান হল। পরম শান্তিতে সীমা ডুব দিল ঘুমের মাঝে। ভোরের আগে ভাঙল না

সে ঘুম।

কতকগুলো ছেলের কলরব কানে যেতেই সীমা উঠে বসল বিছানার ওপর। ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নদীর একটি অংশ। নদী না বলে একটি খাল বলা যায় ঐ স্রোতধারাকে। দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে কয়েকটা পাহাড়ের রেখা। ওদিকে কিছুটা চোখে পড়ে গ্রামের সবুজ।

কয়েকটা ছেলে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছিল। তারা দু' একবার জানলার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতেই সীমার চোখে পড়ল। আদিবাসীদের ছেলে বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিষ্কার ছোট ছোট কাপড় কোমরে জড়িয়ে বেঁধে পরেছে।

সীমা তাদের একজনকে হাত ইশারায় কাছে ডাকতেই সে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল সীমার দিকে। তার চোখে বিস্ময়। এই নতুন আগন্তুকটি কোথা থেকে এক রাতের ভেতর এখানে এসে হাজির হল।

সীমা ধীরে ধীরে বলল, তোমরা এখানে খেলা কর বুঝি ?

মেয়েটি বলল, আমরা পড়ি।

এখানে পড় ?

হাঁ, আমরা মিশ্র ঠাকুরের পাঠশালায় পড়ি।

সীমা বলল, মিশ্র ঠাকুর তোমাদের পড়ান বুঝি ?

ততক্ষণে আরও দু'চারটি কচি মুখ দেখা দিয়েছে। তাদের একজন অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে বলল, মিশ্র ঠাকুর পড়াবেন কেনো, ছোট ঠাকুর পড়াবেন। মিশ্র ঠাকুর তো আমাদের ঔষধ খাওয়াবেন।

সীমা বলল, মিশ্র ঠাকুর তোমাদের ওষুধ খাওয়ান, কি ওষুধ ?

খুব খারাপ ওষুধ। খেলে বুঝবে। মুখ ধুলেও যাবে নাই।

আরেকজন থুথু ফেলার ভঙ্গী করে বলল, তেতো, তেতো।

সব ছেলেরাই ঐ ছেলেটির দেখাদেখি থুথু ফেলতে লেগে গেল।

একজন বলল, ঐ যে ছোটঠাকুর আসছেন।

আর একজন বলল, চল্ চল্ পড়তে বসে যাই।

ছেলেগুলো চড়ুইপাখির মত ফর্‌ফর্ করে উড়ে পালাল।

সীমা বিছানায় বসে ঐ জানালার ফাঁকে তাকিয়ে রইল। ছোটঠাকুর নামক পাঠশালার পণ্ডিত মশাইটিকে দেখবার জন্যে তার ঔৎসুক্য প্রবল হল। ছোটঠাকুর একসময় সীমার জানালার সামনে এলেন, পরমুহূর্তেই অন্য প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক-মুহূর্তের দেখা, কিন্তু সীমার মনে একটা স্থায়ী দাগ টেনে দিয়ে গেলেন ছোটঠাকুর। পাঠশালার পণ্ডিতের আকৃতি আচরণ সম্বন্ধে সীমার যে চিরদিনের ধারণা, তার সঙ্গে এই মানুষটির কোথাও মিল আছে বলে মনে হল না। বয়েস তিরিশের মধ্যে বলেই মনে হল। দীপ্ত সুন্দর চেহারা। মুখে কেমন একধরনের প্রশান্ত দৃঢ়তা। এ মুখ একবার দেখলেই বহুদিন মনে রাখা যায়।

তানিয়া ঘরে ঢুকতেই সীমা তার দিকে ফিরে বসল।

ক্যামন আছেন গো ?

সীমা মিষ্টি মৃদু একটুখানি হেসে মাথা নেড়ে জানাল, সে ভাল আছে।

তানিয়া এবার বলল, পাশের ঘরে তুমি সিনান সেরে জলটল খেয়ে লাও, তারপর বাইরের ঘরে বাবামশায়ের সাথে দেখা কর।

সীমা ধীরে ধীরে সব কাজ সেরে উঠে দাঁড়াল বাইরে যাবার জন্যে। তানিয়া এসে তাকে নিয়ে গেল বাইরের ঘরে।

রাতে সীমা প্রায় কোনকিছুই দেখেনি, আর তার দেখার মত অবস্থাও ছিল না। এখন সে দেখল, দিগন্তজোড়া ফাঁকা পাহাড়ী অঞ্চল। পাশেই একটি নদী বয়ে চলেছে। অদূরে পশ্চিম দিকে সবুজ ক্ষেত আর কৃষকদের বসতির চিহ্ন।

এই বাড়ি আর তার সংলগ্ন বাগান, ঐ বসতি অঞ্চল থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই সীমার মনে হল।

তিন চারখানি টালিছাওয়া ঘর। একটি ঘর নদীর একেবারে ধারে, ডালপালা মেলে দেওয়া এক অশ্বত্থ গাছের তলায়। ছেলেরা তারই ভেতর গুঞ্জন করে কি যেন পড়ছিল। সীমা বুঝল ঐ ঘরখানাই পাঠশালার জন্যে নির্দিষ্ট।

তানিয়ার সঙ্গে সীমা যে ঘরে এসে ঢুকল, সেখানে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ মানুষ। বুক অবধি ঝুলে পড়েছে তাঁর সাদা দাড়ি। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা প্রসন্নতা। তিনি কতকগুলি আমলকী সযত্নে একটি পাত্রে রাখছিলেন।

এসো মা বস।

মাদুর বিছান ছিল। সীমা সেই মাদুরের এক প্রান্ত ঘেঁষে বসল।

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র হাতের কাজ শেষ করে সীমার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন।

কেমন মনে হচ্ছে এখন ?

সীমা বলল, ভাল।

তানিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমি যে ওষুধ দিয়েছিলাম, তা কাল রাতে ক'বার খাইয়েছ ?

দু'বার বাবামশায়।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে জানালেন, ঠিক আছে।

তানিয়া সেখান থেকে কর্মান্তরে চলে গেল। বৃদ্ধ বললেন, তুমি এখন কোথায় যেতে চাও বল, আমরা সঙ্গে লোক দিয়ে সেখানে তোমাকে রেখে আসব।

সীমা অন্যমনস্ক হল। সে ভেবে ঠিক করতে পারল না, এই অবস্থায় সে কোথায় যাবে। ঘর তার কাছে দুর্বিষহ বলে মনে হল। একটি আশ্রয় এখন তার প্রয়োজন যেখানে সে অন্ততঃ কয়েকটা দিন সুস্থভাবে থাকতে পারে।

সীমা বৃদ্ধের মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, যাবার মত জায়গা···। তারপর হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠল, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার বোঝা আমি আর বাড়াতে চাই না। আমি এখুনি এখান

থেকে চলে যাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, না, না, তা আমি বলছি না, তোমাকে চলে যেতে হবে কেন। আমি ভেবেছিলাম, যে কারণেই তুমি এখানে এসে পড় না কেন, ঘরে ফিরে যাবার একটা ইচ্ছে সবারই থাকে।

না বাবা, আমার তেমন কোন পেছুটান নেই।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি কি মা বিবাহিতা ?

সীমা মাথা নেড়ে জানাল যে সে বিবাহিতা নয়।

বৃদ্ধ দিবাকর বললেন, সংসারে এমন কোন দুঃখ নেই মা, যাকে জয় করা যায় না। সাময়িকভাবে কোন কারণে হয়ত তুমি বিচলিত হয়েছ, আবার দেখবে ধীরে ধীরে তুমি শান্ত হয়ে এসেছ।

একটু থেমে হেসে বললেন, মন আর জল দুটোই একরকম। একটুতেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার আপনিই স্থির হয়ে যায়।

সীমা বলল, আমার এখানে আসার একটা কারণ আছে বাবা, সে ঘটনা আপনি জানলে আমার সম্বন্ধে হয়ত অন্যরকম ভাবতে হবে আপনাকে।

কোন সংকোচ না রেখেই বল মা। কিছু একটা অসহায় অবস্থার ভেতরে পড়েই যে তুমি এসেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি, তবে যা একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার তাতে অন্যের কৌতূহল ঠিক নয়। তবে আমার কাছে তুমি সবকিছু খুলে বলতে পার।

সীমা বলল, আমি ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির একটি চাকরির আশায় কলকাতা থেকে এ অঞ্চলে এসেছিলাম।

বৃদ্ধ উৎসুক হয়ে বললেন, তারপর ?

সীমা বলল, আমি এসেই, বলতে পারেন একটা বিরাট ঘরে বন্দী হয়েছিলাম।

বৃদ্ধ তেমনি ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সীমার দিকে।

সীমা বলে চলল, ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি ঠিক সময়ে ওদের কু-মতলবের কথা জানতে পারি, আর রাতের অন্ধকারে লেক সাঁতরে পার হয়ে আপনার এখানে পালিয়ে আসি।

সীমা দেখল বৃদ্ধের স্থির দুটো চোখে যেন আগুন বেরোচ্ছে। একটু পরেই তা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বললেন, বড় কষ্ট পেলে মা। তবে যখন রক্ষাই পেলে তখন কলকাতা ফিরে যেতে চাইছ না কেন ?

সীমা বলল, সেখানে আমার কথা ভাববার মত কোন লোক নেই বলে।

বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন, এখন কি করতে চাও ?

সীমা বলল, আমি আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। পথে নেমেই হেঁটে চলব যেদিকে দু'চোখ যায়।

বৃদ্ধ বললেন, যখন মা বলে তোমাকে ডেকেছি তখন যতদিন তোমার খুশি এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

সীমা বলল, এমনি খেয়ে বসে কি করে থাকি বলুন, যদি এত দয়া করলেন,

তাহলে আমাকে কিছু কাজ দিন। তা যত ছোট, যে রকমেরই হোক। আপনার ঋণ একেবারে শোধ করতে না পারলেও, সাধ্যমত চেণ্টা করব।

বৃদ্ধ বললেন, কাজের রাস্তা ধরেই তো জীবনের চাকাটা গড়িয়ে চলে মা। ঐ রাস্তা অচল হলেই জং ধরবে জীবনের চাকায়।

একটু থেমে বললেন, তুমি কাজ করবে বইকি, তবে এখন বিশ্রাম কর, কাজের সময় এলে ঠিকই তোমাকে ডেকে নেব।

সীমা বলল, দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ করার অভ্যেস আছে আমার, তবে একটু শান্তি চাই আমি, যা কোথাও খুঁজে পাইনি।

হাসলেন বৃদ্ধ। নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, শান্তি এখানে ছাড়া কোথায় পাবে মা। এই মনখানাকে বশে আনলেই পাবে শান্তির সঠিক ঠিকানা।

সীমা মাথা নীচু করল।

বৃদ্ধ আবার বললেন, যে হাওয়ায় তরী ডোবায়, সেই হাওয়া নইলে যে মা প্রাণ বাঁচে না। এই মনই অশান্তির ঘূর্ণি তুলে তোলপাড় করে, আবার এই মনই শান্তির আশ্রয়। তুমি কিছু ভেব না মা, নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ উঠলেন। সীমা সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন, এখন আমাকে গ্রামে যেতে হচ্ছে। যা দরকার তানিয়াকে বললেই পাবে। সংকোচ করো না কোনকিছুতে। সুপ্রকাশ রয়েছে পাঠশালায়, তেমন কিছু দরকার পড়লে তার সাহায্যও পাবে। আমি ফিরব ওবেলা অপরাহ্নের দিকে।

সীমা মাথা নেড়ে জানাল, সে বৃদ্ধের সকল কথাই বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োজনে সব রকমের সাহায্যই সে নেবে।

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র লাঠি ঠুকতে ঠুকতে প্রথমে গিয়ে ঢুকলেন পাঠশালায়। সুপ্রকাশকে ডেকে নিয়ে এলেন বাইরে।

মেয়েটি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির লেক রাতের অন্ধকারে সাঁতরে পার হয়ে এসেছে, সুতরাং একটু সতর্ক থেক।

সুপ্রকাশ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এদিকে ওঁর খোঁজে কেউ আসতে সাহস করবে না।

বৃদ্ধ বললেন, তা জানি, তবু সাবধানের মার নেই।

সুপ্রকাশ বলল, আমি ত রইলাম, আপনি ফেরার সময় বীরু আর বঙ্কুকে নিয়ে আসবেন। ওরা রাতে ক'দিন এখানেই থাকবে।

বৃদ্ধ বললেন, তা আমি ভেবেই রেখেছি। আর শোন, মেয়েটির ঘরে ফেরার তাগিদ কিছু নেই, ও কাজ চায়, একটা কিছু ভেবে রেখো।

সুপ্রকাশ মাথা নাড়ল। বৃদ্ধ লাঠিখানা ঠকঠক করতে করতে এগোতে লাগলেন গ্রামের দিকে।

সুপ্রকাশ পেছন থেকে হাঁক দিয়ে বলল, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান না।

বৃদ্ধ থামলেন। একটুখানি মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমাকে এত তাড়াতাড়ি অক্ষম করে দিও না সুপ্রকাশ। মনে মনে যেদিন নিজেকে বুড়ো বলে ভাবব, সেদিন তো পায়ের চাকা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। যতদিন মন চলে ততদিন একা একা পা চালাতে দাও।

বৃদ্ধ আবার চলতে লাগলেন। সুপ্রকাশের মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। কিছুক্ষণ বৃদ্ধের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে সে ঢুকল পাঠশালার ভেতর।

সীমার হাতে কোন কাজ নেই। তানিয়া কিছু আগে সামনের পথ ধরে গরুগুলোকে নিয়ে গেছে ছোট নদীটার দিকে। ওখানে চরের বুকে হয়ত কচি ঘাসের সন্ধানে। সীমা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের চারদিকে। এখানে আকাশ এত বড়, প্রান্তর এমন প্রসারিত, বাতাস এত নির্মল যে সীমা মাঝে মাঝে চোখ বুজে বুক ভরে নিশ্বাস টানতে লাগল। সে দেখতে পেল ছোট নদীটি তরতর করে বয়ে চলেছে। এক ঝাঁক পাখি সামনের অশথগাছের পাতার ফাঁক থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল। তারা হাওয়ার ওপর নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে নদীর তীর ঘেঁষে উড়ে গেল কিছুদূর। তারপর প্রান্তরের বুকে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সীমা ভুলে গেল গত রাতের কথা। সে যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে, নিজের শেষ শক্তিটুকু প্রায় নিঃশেষ করে জয়ী হয়েছে, আজ তার কাছে সে সব কথা তুচ্ছ হয়ে গেল। সীমার মনে হল, তার পেছনে কোন জীবন নেই, কোন ইতিহাস নেই, সে সবে এই আলোয়, এই হাওয়ায় তরুণী হয়ে ভূমিষ্ঠ হল।

সীমা অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলল,

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে
ধন নয় মান নয়
একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

আবৃত্তি শেষ হল। সীমা দক্ষিণে ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একটি পলাশগাছ। সারা দেহে যেন আলোর প্রদীপ জ্বেলেছে। সীমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একটি ডাল নীচু হয়ে এসেছিল ভারী সুন্দর ভঙ্গীতে। ফুলগুলি যেন দীপাবলীর একসারি দীপের মত নেমে এসেছিল ঐ ডালের গা ছুঁয়ে। সীমা হাত বাড়িয়ে ফুল পাড়ার চেষ্টা করতে লাগল। আজ তার মন নিজের সঙ্গে কথা কইছে। সে সাজতে চায়, যৌবনের দিনগুলোকে এমনি পত্রপুষ্পহীন চলে যেতে দেবে না। কিন্তু নাগাল পেল না সে ফুলের। মন ছুঁয়েছে ফুল, কিন্তু হাত ছুঁতে পারছে না। ফিরে এল সীমা। আসতে আসতে কয়েকবার তাকাল পেছন ফিরে। সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়? জীবনকে ধন্য করবে যে তার প্রসাদ নইলে সাধ্য কি পাওয়া।

সীমা উঠোন পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তানিয়া ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

কি গো দিদি, চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখলে বুঝি?

হাঁ, এই একটু ঘুরে এলাম।

ক্যামন লাগল বললে নাই তো?

খুব ভাল তানিয়া।

তারপর কপট ক্রোধের ভান করে বলল, জান তোমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে।

তানিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল, কি দোষ করলাম গো দিদি?

সীমা হেসে বলল, তুমি এতদিন একা একা এমন সুন্দর একটা জায়গায় রয়েছ। তাই তোমাকে দেখে ভারী হিংসে হচ্ছে আমার।

ও তাই বল, আমি ভাবলাম, কি দোষ করলাম, বাবামশায় কি বললেন।

সীমা বলল, তুমি খু-উ-ব ভাল মেয়ে তানিয়া।

তানিয়া হাসতে লাগল।

আচ্ছা তানিয়া তোমার বাড়ি কোথায়, কে আছে তোমার বাড়িতে?

তানিয়া সপ্রতিভ উত্তর করল, কেউ নাই দিদি। বাপ মা আমাকে ছোটকালে বেচে দিয়ে কুথা চলিয়ে গেছে। যার কাছে বেচল, আমার বয়স হলে সে বুড়া আমাকে সাদি করল। এক বরষ যাইল না বুড়া মরল। তখন আমার জাতের মরদগুলা আমার লেগে লড়াই শুরু করিয়ে দিল। আমি বাবামশায়ের পা জড়াইয়ে ধরলাম আর ছাড়লম নাই। কইলম, এগুলানের হাত থেইকে আমাকে রক্ষা কর!

বাবামশায় কইলেন, আবার সাদি না করিয়ে তুই থাকতে পারবি? আমি কইলম, হুঁ, কেনে পারব নাই। বাবামশায় তখন আমাকে তেনার কাজে বহাল করলেন।

সীমা বলল, তাহলে তুমি বেঁচে গেলে তানিয়া।

তানিয়া বলল, বাবামশায় আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বাবামশায় কেমন লোক তানিয়া?

তানিয়া যেন মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল। মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, দেবতা, বুড়া শিউজী। এ তল্লাটের যত চাষাভুষা, কুলিকামিন সব বাবা-মশায়কে 'ঠাকুর' বুইলে ডাকে। আর হুঁই যে পাঠশালায় আছেন গো, উনি হলেন ছোটঠাকুর। ওকে সবাই ডরে। এমন মরদ নাই যে ওর ডাকে সাড়া দিবে নাই।

সীমা সুপ্রকাশর সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তানিয়া, তোমাদের ছোটঠাকুর বড়ঠাকুরের কেউ হন কি?

অতশত বোলতে পারব নাই দিদি। তবে ছোটঠাকুর যদি কারো কথা শোনে সে হল বাবামশায়ের। বাবামশায়ের ওপরে কারো কথা চলবে নাই।

তোমাদের ছোটঠাকুর আর বাবামশায় কি এখানেই থাকেন?

বাবামশায় এইখানে থাকেন, ছোটঠাকুর গাঁওতে চলিয়ে যান।

সেখানে ওঁর বাড়ি?

তানিয়া বলল, ওঁর ঘরবাড়ি নাই গো দিদি। লোকে বলে, ও রাজা, সবার সঙ্গে ভিখারী সাজিয়ে আছে।

ভিখারী সেজে আছে!

হাঁ গো হাঁ, ওঁর মাথায় নাকি এত্তবড় একখানা জাহাজ আছে, পুঁথির জাহাজ গো। আর নাকি বস্তা বস্তা টাকা ঐ চাষাগুলানকে দিয়ে দিয়েছে।

খুব ভাল লোক তাহলে তোমাদের ছোটঠাকুর, কি বল?

তানিয়া এবার কেমন যেন বিষণ্ণ মুখ করে বলল, ভাল আছে, তবে কোনদিন আমার হাত থেইকে এক ঘটি দুধ চাইয়া খাইল নাই। খালি বলে, তানিয়া ঐ বাচ্চাগুলানের ছুটি হইয়া গেলে উদের দুধ খাওয়াইয়ে দাও। বোল ত দিদি, কত কষ্ট হয় মনটায়।

সীমা বলল, এ তো ভাল কথা তানিয়া। ছোটরা দুধ খেলে তবে তো তাদের চেহারা ভাল হবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবে। লেখাপড়া ভাল শিখবে।

তানিয়ার কথাটা মনে ধরল না। সে বলল, আরে ধুৎ, ঐ বাচ্চাগুলান বড় হইলে কুলিকামিন হবে। হাঁড়িয়া গিলবে। জরু ঠেঙাবে।

সীমা বলল, ও কথা ভাবছ কেন তানিয়া। ছোটঠাকুরের কাছে যখন ওরা পড়ছে তখন নিশ্চয়ই ওরা হাঁড়িয়া খেয়ে মাতলামি করবে না।

তানিয়া অন্যমনস্কভাবে বলল, হবে দিদি, হবেও বা; ছোটঠাকুর মানুষ নাই, দেব্‌তা আছে।

ওদের কথার মাঝে হঠাৎ একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। একটি ছেলে কোঁচড়ে করে অনেকগুলো পলাশফুল নিয়ে এসে সীমার কাছে দাঁড়াল। সীমা তো পলাশ দেখে অবাক।

ছেলেটি বলল, তোমার জন্যে এই ফুল এনেছি।

সীমা দু'হাত ভরে ফুলগুলো নিল। তারপর বলল, তুমি কি করে জানলে যে আমি পলাশফুল ভালবাসি?

ছোটঠাকুর বললেন, ফুল পেড়ে দিয়ে আয়।

সীমা কৌতুক করে বলল, কাকে দিতে বললেন?

ছেলেটি বলল, তুমি যখন ফুল পাড়তে গিয়ে নাগাল পেলে না, তখন ছোটঠাকুর পাঠশালা থেকে দেখছিলেন, তারপর তুমি চলে এলে আমাকে ফুল পেড়ে তোমার হাতে দিয়ে আসতে বললেন।

সীমা মনের খুশি যেন চেপে রাখতে পারছিল না। বলল, তুমি লক্ষ্মী ছেলে। আমি খুব ভালবাসি ফুল।

ছেলেটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে এবার একদৌড়ে পাঠশালার ভেতর গিয়ে ঢুকল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। দিবাকর মিশ্র সীমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাইরের ঘরে। এ ক'দিন সীমা প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল। চিরদিন কাজই ছিল

তার একমাত্র অবলম্বন। তা সে যত ছোটই হোক। কিন্তু এখানে আসার পর সীমা যেমন উদার প্রকৃতির মাঝে মুক্তি পেয়েছিল, তেমনি কাজের মাঝে থাকতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠছিল। তাই দিবাকর মিশ্র যখন তাকে ডেকে পাঠালেন তখন সীমা যেন কি এক প্রত্যাশায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দিবাকর মিশ্র সীমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, বোস মা, কয়েকদিন বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি।

সীমা বসল।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কেমন লাগছে মা তোমার ?

সীমা বলল, আপনার আশ্রয়ে ভাল না লাগবার কথা নয়, কিন্তু আমি যে বড় হাঁপিয়ে উঠেছি বাবা।

কেন মা ?

কাজ ছাড়া কেবল শুয়ে বসে থাকা আমার আছে বড় কণ্টকর হয়ে উঠেছে বাবা।

ও, এই কথা।

হাসলেন দিবাকর মিশ্র। বললেন, চলাটা জীবনের ধর্ম ঠিক, কিন্ত কখনো কখনো থামতেও হয় মা। থেমে থাকা নতুন চলারই প্রস্তুতি। গাছ কি সবসময় ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তাকেও থামতে হয়। এই থামার ভেতর দিয়েই চলে তার নতুন ফলের আয়োজন।

সীমা লজ্জিত হল।

জীবনে কোন কিছু করতে না পেরে আমি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি তোমার জন্যে কাজ এনেছি মা।

সীমা উৎসুক চোখ তুলে তাকাল দিবাকর মিশ্রের দিকে।

কাজটা সাময়িক, পরে অন্য কাজের কথা ভাবা যাবে, কিন্তু এখন কিছুদিন তোমাকে এই কাজই করতে হবে।

বলুন কি করতে হবে আমাকে ?

এই পাঠশালাটি চালানোর কাজ। এ কাজ সুপ্রকাশই করে, তবে কিছু-দিনের জন্যে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে জরুরী কাজে, তাই এ ভার আপাততঃ তোমার ওপরেই এসে পড়ল।

আমি কি পারব বাবা ?

সংশয় কেন মা ? পারব বলে যারা কাজে নেমে পড়ে, অনেক অসাধ্যই তাদের ভেতর এসে যায়।

আপনার ভরসা পেলাম। এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই পারব।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কাজটা কিন্তু মা তোমাকে বুঝে নিতে হবে সুপ্রকাশের কাছ থেকে।

সীমা বলল, তাই হবে।

পরে বলল, ওঁর কাছে কি এখন যেতে হবে বাবা ?

দিবাকর মিশ্র বললেন, ও নিজেই তোমার কাছে ডাক পাঠাবে। সমস্ত কাজ ওর ছবির মত ছকে ফেলা। কাজ করতে করতে দেখবে মা, কত আনন্দ ও প্রীতিটি কাজের ভেতর মিশিয়ে দিয়েছে। চাষাভুষো থেকে কুলিকামিন তাই তো ওর বশে।

সীমা বলল, সেই জন্যেই তো ভয় আমার। মনে হয় এমন সুন্দর ছন্দে-বাঁধা কাজগুলোকে হয়ত ভেঙে চুরে এলোমেলো করে ফেলব।

ভুল না হলে তো শিখতে পারবে না মা পুরোপুরি। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে ভুল হয়, সে ভুল জানবে মঙ্গলের।

সীমা বলল, আমি চেষ্টা করব ওঁর নির্দেশমত কাজ করতে।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন দিবাকর মিশ্র। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মত করে বললেন, খরশান ইস্পাত আমার সুপ্রকাশ। ও যতখানি নমনীয় ঠিক ততখানিই আবার দৃঢ়। সারা দেশ জুড়ে কয়েকজন মাত্র সুপ্রকাশ যদি জন্ম নিত তাহলে আমূল বদলে যেত দেশের চেহারা। এ জাতের ছেলেরা শুধু স্বপ্ন দেখতেই জানে না তাকে রূপ দিতেও জানে।

থেমে গেলেন দিবাকর মিশ্র। সীমা দেখল, কি এক তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

তারপর একসময় সহজ হয়ে বললেন, সুপ্রকাশের কাছে কোনকিছু গোপন রেখ না মা, ও বড় স্বচ্ছ, বড় পরিষ্কার। স্পষ্ট করে তোমার কথা বলবে, তাতে খুশী হবে ও।

সীমা বলল, কাজের ভেতর দিয়ে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব ওঁকে খুশী করবার।

সেই ভাল মা, বড় কাজপাগল ও। কাজ ছাড়া কিছু জানে না। কাজের মানুষ সঙ্গে পেলে ও একেবারে মেতে ওঠে।

দুপুরের দিকে বৃদ্ধ দিবাকর চলে গেলেন গ্রামে। একা একা বসে থেকে সীমার ভাল লাগছিল না। সে তানিয়ার সঙ্গে তাই বেরল নদীর চরে। উদ্দেশ্য গরুগুলোর তদারকি। বাছুরগুলোকে এখন মায়েদের কাছছাড়া করে ঘরে ফিরিয়ে না আনলে সাঁঝে আর দুধ পাওয়া যাবে না। ছোট্ট একটি খাল বেরিয়ে এসেছিল নদী থেকে। তানিয়া তার ভেতর নেমে পড়ল। সে সঙ্গে এনেছিল ছাঁকনি জাল। তা দিয়ে সে ছোট ছোট মাছ ধরার কাজে লেগে গেল। খালের পাড়ে বসে সীমা মাছ ধরা দেখছিল। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সেও তানিয়ার দেখাদেখি নেমে পড়ল জলে। দুজনে মহা উৎসাহে মাছ ধরতে লেগে গেল। সীমা ও কাজে একেবারে অনভ্যস্ত। তাই তার মাছ ধরার কাজ যত না এগোলো, জলে ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপিটাই চলল বেশী। কাপড় তো আগেই ভিজেছিল, এখন মাথার চুলগুলোও বড় একটা রক্ষা পেল না। যখন ওরা মাছ ধরার খেলা ফেলে উঠল তখন সূর্য অপরাহ্ণের আকাশে রঙ বদল করছে। তানিয়া বলল, এই দুটো বাছুরকে তাড়িয়ে নিয়ে তুমি ঘরে যাও দিদি, আমি

গরুগুলোন লিয়ে পিছু যাচ্ছি। উয়াদের জল খাওয়াইতে হবে।

সীমাকে আজ যেন খেলায় পেয়ে বসেছে। সে বাছুরগুলোর পেছন পেছন দৌড়ে তাড়া করে নিয়ে চলল। চঞ্চল বাছুরগুলো এদিক ওদিক নেচে নেচে দৌড়য়, আবার থামে, আবার দৌড়য়। সীমা সমানে তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল। এ সত্যিই এক মজার খেলা। ছোট থাকার জন্যে বাছুরগুলোর বুদ্ধি গরুগুলোর মত পাকেনি, তাই ঘরের কাছে এসেই ওরা গোবেচারার মত গোয়ালে সরাসরি ঢুকে পড়ল না, ঢুকল গিয়ে সবজিক্ষেতে। সবে কিসের যেন চারা বসান হয়েছিল, যাবি তো যা একেবারে তারই মাঝখানে। সেখানে পৌঁছেও তাদের নাচ থামে না। দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে সীমা মহা বিব্রত। সবজিক্ষেতটা আবার পাঠশালার লাগাও। সীমা ক্ষেতের ভেতর ঢুকতেও সাহস পাচ্ছিল না। কে জানে সুপ্রকাশ এখন পাঠশালায় আছেন কি না। তাছাড়া খালে মাছ ধরতে গিয়ে তার চেহারাখানার যা অবস্থা হয়েছে তা ভদ্রসমাজে বের কবার মত নয়। ভাবতে ভাবতেই পাঠশালা থেকে দুটো ছেলে বুলেটের মত দৌড়ে বেরিয়ে এল। তারা অতি কৌশলী। বেরিয়ে এল যত বেগে, বেড়ার কাছে এসে সে বেগ একেবারে স্তিমিত হয়ে গেল। অতি ধীরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সবজিক্ষেতে ঢুকল। কয়েকটা পাতা তোলার অভিনয় করল, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বাছুরগুলোর কাছে। এবার জড়িয়ে ধরল ওদের গলা। একেবারে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল গোয়ালে। সীমা লজ্জিত হয়ে পায়ে পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তখন কাপড়চোপড় বদলে সীমা একটু ভদ্রস্থ হয়েছে, ডাক এল পাঠশালা থেকে।

সীমা মনে মনে যে একটু ভয় পেল না তা নয়। আজ সারা দুপুর আর বিকেল সে যেভাবে কাটিয়েছে তাতে কিছু বকুনি যে তার প্রাপ্যের ঘরে জমা পড়েছে, এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহই রইল না।

সে বাধ্য একজন পাঠশালার ছাত্রীর মত পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সুপ্রকাশের সামনে। ছেলেরা চাটাই পেতে বসে ছিল। সুপ্রকাশেরও উপবেশন একখানি চাটাইএর ওপর। সীমা আসতেই সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করল। ছেলেরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটি ছেলে বলল, ঠাকুর, ঝিঙেফুল ফুটে গেছে, এখন আমাদের ছুটি।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, আচ্ছা এসো তোমরা।

ছেলেরা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল, সুপ্রকাশ তাদের বলল, একটু থাম।

ওরা দাঁড়াতেই সুপ্রকাশ সীমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব, ইনি কাল থেকে তোমাদের পড়াবেন, বুঝলে?

ছেলেরা মাথা নাড়ল। সুপ্রকাশ বলল, আচ্ছা এখন তোমরা এসো।

ওরা চলে গেলে সুপ্রকাশ সীমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ছেলেদের কিন্তু আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

সীমা মৃদু হেসে বলল, কি করে বুঝলেন ?

এই আপনি ওদের মত নদীতে ঝাঁপাই ঝুড়তে, গরু বাছুরের পেছনে দৌড়তে, গাছ থেকে ফুল পাড়তে ভালবাসেন বলে।

সীমা আর সুপ্রকাশ একই সঙ্গে হেসে উঠল।

সীমা ভাবতে পারেনি যে তাদের প্রথম পরিচয় এমন সহজ হয়ে দেখা দেবে।

সুপ্রকাশ বলল, আপনি বাবামশায়কে কাজ কাজ করে পাগল করে তুলেছিলেন, এখন কাজের প্রথম পরীক্ষাটা দিন।

বলুন কি করতে হবে।

কাল থেকে কিছুদিন আমার ছুটি, আর সে পদে আপনাকে বহলে হতে হবে।

সীমা হঠাৎ বলে বসল, ছুটি কেন ?

সুপ্রকাশ বলল, সে কি কথা, কাজ করলে ছুটি পাওনা হবে না ! অন্ততঃ সে ছুটি তো আমার প্রাপ্য।

সীমা মৃদু হেসে মাথা নাড়তে লাগল। ভাবল, এধরনের ছুটির দরকারই হবে না সুপ্রকাশবাবুর।

সুপ্রকাশ বলল, মনে হচ্ছে না আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করলেন বলে। তাহলে আপনার বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটা বলতে হয়, তাই শুনুন। ঐ যে গ্রামখানা দেখছেন, ওর নাম সীতাপুর। ঐ গ্রামে তিন বছর অন্তর একটি করে মেলার আয়োজন করতে হয়। আর তারই ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকতে হবে বলে আমার ছুটির দরকার।

সীমা বলল, কোন পালপার্বণে ঐ মেলা বসে বুঝি ?

না না, তা নয়। ঐ গ্রামখানাকে আদর্শ একটি গ্রামের রূপ দেবার জন্যে আমরা কাজ করি। কিভাবে কাজের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, তা দেখাবার জন্যেই এই মেলার আয়োজন। আমাদের এখানে যে সব কাপড় বোনা হয়, কিংবা যে সব কুটিরশিল্পের কাজ হয়, তা যাতে বিভিন্ন গ্রাম আর শহর বাজারে বিক্রি হতে পারে সেজন্যেও এই মেলার ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিত হয়ে কলকাতার অনেক ব্যবসায়ীই এসময় এখানে আসেন। তাঁদের আকর্ষণ করবার জন্যেও আমাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হয়।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, এখন পাঠশালায় ছেলে পড়ানোর কাজে হাত পাকান, তারপর এসব কাজেও আপনার হাত লাগানোর দরকার হয়ে পড়বে।

সীমা বলল, খুব ইচ্ছে করে আপনাদের ঐ গ্রামে যেতে।

সুপ্রকাশ বলল, নিশ্চয়ই যাবেন। ও গ্রাম সবার জন্যে। আমরা নানা জায়গা থেকে লোককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি। তাঁরা দেখে কিছু সমালোচনা করুন অথবা প্রেরণা পান, এইটাই আমরা চাই। এতে আমাদের কাজের সংস্কারও যেমন হবে, তেমনি আদর্শ যদি কিছু থেকে থাকে তাও ছড়িয়ে পড়বে।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, পরশু রোববার, ছুটির দিন। বিকেলের

দিকে নিয়ে যাব আপনাকে গ্রামে।

সীমা বলল, দূর থেকে ঐ জায়গাটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। এত সবুজ, চোখ জুড়িয়ে যায়।

সুপ্রকাশ বলল, শহরের হাত থেকে ঐ সবুজটুকু বাঁচাবার জন্যেই আমাদের যুদ্ধ। প্রকৃতির সবুজ আর মনের সবুজ, দুটোই মিলবে ঐখানে!

সীমা চুপ করে রইল। তার মনে হল কৃত্রিম একটা জগৎ থেকে সে আজ যেখানে এসে পড়েছে, সে জগতের সঙ্গে কোথায় যেন তার প্রাণের একটা যোগ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

সুপ্রকাশ এবার কাজের কথা পাড়ল, দেখুন এখন আমরা একটু কাজের কথা আলোচনা করে নিই।

সীমা সুপ্রকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আমি এই পাঠশালার কথা বলছিলাম। এর কাজ কিন্তু একটু অন্য ধরনের। আপনি ছেলেদের কোন একটি অঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন। তারপর কয়েকটি ঐ ধরনের অঙ্ক কষতে দিলেন। এখন সব ছেলেই যে ঠিক করবে এমন নয়। কেউ কেউ ভুলও করবে।

সীমা বলল, ভুল তো করবেই, আমি সাধ্যমত বুঝিয়ে দেব ওদের।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, সেইটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি একটু অন্যরকমের।

সীমা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল সুপ্রকাশের দিকে।

সুপ্রকাশ বলল, আমরা ছেলেদের দিয়েই ছেলেদের পড়ানোর চেষ্টা করি। যে ছেলে অঙ্ক ঠিক করল তার ওপর ভার দি' যারা পারেনি তাদের বুঝিয়ে দেবার। এ কাজে দরকার হলে আমাদের সাহায্য তো আছেই। শুধু অঙ্ক নয়, সব বিষয়েই আমাদের এই ব্যবস্থা।

সীমা বলল, বাঃ ভারী সুন্দর তো।

সুপ্রকাশ বলল, এতে ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়। তাছাড়া বোঝাতে গিয়ে কথা বলার ক্ষমতাও বাড়ে।

সীমা বলল, আমি এমনিভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব।

সুপ্রকাশ বলল, আমাদের পাঠশালায় শাস্তির ব্যবস্থাও আছে কিন্তু।

সীমা কৌতূহলী হল, কি রকম?

এই বার বার বুঝিয়েও যাকে বোঝান গেল না, তাকে আমরা সবজিক্ষেতের কাজে পাঠাই, কিংবা দুধ দোয়ার সময়ে বাছুর ধরার কাজে লাগাই।

সীমা বলল, এতে তো ওদের মজা বলেই আমার মনে হয়।

ঠিক তাই। হাতেনাতে কাজও কিছু করে, আবার পাঠশালার বাইরে খোলা হাওয়ায় মাথাটা কিছু সাফও হয়।

সীমা হেসে বলল, এরকম শাস্তি পেলে আমরাও পাঠশালায় ভরতি হয়ে যেতে পারি।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল বাইরে। বলল, আমি এখন চললাম

গ্রামে। বাবামশায়ের ফিরতে একটু রাতই হবে। সাবধানে থাকবেন। আমিও এখুনি রওনা হচ্ছি।

চলে গেল সুপ্রকাশ। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মিথ্যা গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজেকে গুণ্ঠিত করে রাখে যে সব মানুষ তাদের চেয়ে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পরের দিন ভোরবেলা সীমা তৈরী হয়েই ছিল। ছেলেরা আসতেই সীমা তাদের নিয়ে পাঠশালার ভেতর পড়াতে শুরু করে দিলে।

সীমা একটি ছেলেকে বলল, কি নাম তোমার ?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সমীরণ।

সীমা গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার অভিনয় করে বলল, বাব্বাঃ এত বড় নাম !

তার রকম দেখে ছেলেরা খুব মজা পেয়ে হেসে উঠল।

আচ্ছা সমীরণ মানে কি বল তো ?

ছেলেটি আকাশপাতাল ভেবেও মানে বের করতে পারল না।

সীমা বলল, এখন তোমরা কেউ ওর নামের মানেটা ওকে বুঝিয়ে দাও।

একটি ছেলে বলল, ওর ভাইকে সবাই ডাকে 'সমী' বলে। ওর ভাইয়ের আসল নাম শমীন্দ্র। আমার মনে হয় ওর ভাই এর সঙ্গে 'রণ' মানে যুদ্ধ মারামারি করে বলেই ওর নাম হয়েছে সমীরণ।

সীমা তো হেসেই সারা। এমন গম্ভীর হয়ে আবিষ্কারকের মত ছেলেটি কথাগুলো বলে গেল যে সীমা তাকে কাছে ডেকে আদর না করে পারল না।

সীমা বলল, খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তুমি। হাতের কাছে সন্দেশ বা রসগোল্লা থাকলে এখুনি তোমাকে খাইয়ে দিতাম। তা যখন নেই তখন ··।

সীমা হাতখানা মারের ভঙ্গীতে তুলে আলতো করে ছেলেটির পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলল, এটাকে কি খাওয়া বলে ?

সকলে চেঁচিয়ে উঠল, মার খাওয়া।

সীমা বলল, তাই খাওয়ালাম এখন। পরে সন্দেশ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাবে।

সবাই খুব মজা পেয়ে গেল। সীমা এবার সমীরণ কথাটির মানে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলল. সমীরণ মানে বাতাস। এখন এই বাতাসকে আর কি কি শব্দে বোঝান যায় বল দেখি ? অন্ততঃ আর গোটা চারেক শব্দের নাম কর।

একটি ছেলে বলল, বায়ু, পবন।

আর একটি বলল, সমীর।

এরপর সারা পাঠশালার ছেলেদের মুখে ফুটে উঠল শুধু ভাবনারই ছবি। সমাধান আর হল না।

তখন সীমা বলল, চারের নম্বরের নামটা হল গন্ধবহ। তার মানে বাইরে ফুল ফুটলে কে গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে।

ছেলেরা বলল, বাতাস।

সীমা বলল, তাই বাতাসের আর এক নাম গন্ধবহ। আচ্ছা বল তো, বর্ষাকালে যে বাতাস মেঘ বৃষ্টি বয়ে আনে তাকে কি বাতাস বলে?

একজন বলল, মৌসুমী বাতাস।

আর একজন বলল, ঐ যে 'মৌসুমী' বসে আছে ওখানে।

মৌসুমী মেয়েটি ওদের ক্লাসে পড়ে।

ছেলেরা 'মৌসুমী বাতাস', 'আমাদের মৌসুমী বাতাস' বলে মনের আনন্দে যত চেঁচাতে লাগল, মেয়েটি তত কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকাতে লাগল চারদিকে।

একজন বলল, ঐ দ্যাখ মৌসুমীর চোখে বৃষ্টি নামছে রে।

সবাই চেঁচাতে লাগল বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি বলে।

মেয়েটি হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সীমা উঠে গিয়ে মেয়েটিকে নিজের কাছে টেনে নিল। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। কেন বিনা দোষে মৌসুমীকে এমন করে কাঁদালে!

ছেলেরা একেবারে চুপ।

সীমা বলল, সবাই বাইরে গিয়ে সবজিক্ষেতে জল দেওয়ার কাজ কিংবা অন্য কিছু করোগে।

মৌসুমী ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল। সীমা বলল, আধঘণ্টার ভেতর চলে এসো কিন্তু।

সবাই চলে গেলে সীমা মৌসুমীকে বলল, তুমি রাগ করছিলে কেন বোকা মেয়ে। বলতে পারলে না ওদের যে মৌসুমীর বৃষ্টি নইলে মাঠে চাষ হবে কি করে? ধান না হলে খাবে কি তোমরা? তাহলে দেখতে সবাই কেমন জব্দ হয়ে যেত।

বুদ্ধিটা পেয়ে মৌসুমী খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণের ভেতর একটি ছেলে ফিরে এল। হাতে তার পলাশফুলের একটি ডাল। সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খুব ভাল ফুল আছে এতে।

সীমা দেখল সেদিনের সেই ছেলেটি, যে তাকে ফুল দিয়ে এসেছিল। সীমা কপট ক্রোধে বলল, কে তোমাকে ফুল আনতে বলল!

আপনি ফুল ভালবাসেন বলেছিলেন সেদিন, তাই আনলাম। অনেক উঁচু ডালের থেকে পেড়ে এনেছি।

সীমা বলল, যদি অত উঁচু ডালে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে?

ছেলেটি বোধহয় এরকম কথা কোনদিন শোনেনি। অবাক হওয়ার পালা তার, পড়ব কেন, ডাল ধরে গাছে উঠলে আবার কেউ পড়ে নাকি?

সীমাকে স্বীকার করতেই হল যে গাছ বেয়ে উঠলে বাস্তবিকই কারো পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। অন্ততঃ মুখ চোখে তেমনি ভাবই ফোটাতে হল সীমাকে।

সে হাত বাড়িয়ে তার কাছ থেকে সেই ফুলে ভরা ডালটা নিয়ে মৌসুমীর হাতে দিয়ে বলল, নাও, এটা তোমাকে দিলাম।

এমনি পড়া পড়া খেলার ভেতর দিয়ে কোথা দিয়ে কেটে গেল দিনটা। বেলাশেষে ছেলেরা নদীর তীর ধরে চলে গেল গাঁয়ের দিকে। সীমা তাকিয়ে রইল ওদের চলে যাবার পথের দিকে। তার শুধু মনে হতে লাগল, এই মুক্তি কি পায় শহরের ছেলেরা তাদের ইস্কুল, কলেজ, পাঠশালায়।

রোববার এলো। সুপ্রকাশের দেখা নেই। সকালে সীমা দেখল নদী পেরিয়ে দলে দলে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ আসছে তাদের আস্তানার দিকে। তারা এসে ভিড় করল পাঠশালার উঠোনে। দিবাকর মিশ্র ঘর থেকে বেরোতেই ওরা প্রণাম করল।

বল্, কেমন আছিস সব।

ভাল নয়, বাবামশয়।

কেন রে, কি হল তোদের ?

ওদের হয়ে সর্দার মুংরাই কথা বলল, কি কইরে ভাল থাইকব। সাহেবের হুকুম জারি হইয়েছে এবার মেলায় যে আসবে তার কাজে জবাব হইয়ে যাবে।

দিবাকর মিশ্র বললেন, মেলা তো একটা আনন্দের ব্যাপার। ক'দিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াস, তীর ছোঁড়ার খেলায় মাতিস, তাতে সাহেবের রাগের কি কারণ হল ?

মুংরা বলল, বুঝলি নাই, হিংসায় জ্বলিয়ে মরছে। এত বড় মেলা আমাদের রাজাভাই বানাইল, আর ও কিছু বানাইতে পারল নাই।

ওকে তো কেউ বারণ করেনি মুংরা। ও যদি ভাল কিছু করে তাহলে সীতাপুর গাঁয়ের চাষাভুষো সবাই তাতে যোগ দেবে।

মুংরা বলল, ওর আরও রাগ আছে বাবামশয়। আমাদের ছেইলাগুলান তোর পাঠশালায় পড়ছে। কথা বুইলতে শিখছে, হিসাব শিখছে, এই উয়াদের রাগ।

দিবাকর মিশ্র বললেন, ওরা তো একটা পাঠশালা খুললে পারে।

মুংরা বলল, সে তো তুই জানিস বাবামশয়। আমাদের মতন ছেইলেগুলান হিসাব শিখবে নাই, কিতাব পড়বে নাই, তবে ত উয়াদের সুবিধা হবে। ঠগবাজি করবে উয়ার চেলাগুলান। পড়ালিখা শিখলে উয়াদের যে জুয়াচুরি চলবে নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, এখন তাহলে তোরা কি ঠিক করলি, মেলায় আসবি না আসবি না ?

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আলবৎ আসব। কেন আসব নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কাজ যাবে তোদের সেকথা ভেবে দেখেছিস ? বউ ছেলে নিয়ে যাবি কোথায় ?

নোকরি যায় তুর পায়ে আইসে পড়ব। তবু উয়ার কথা শুনতে

পারব নাই।

দিবাকর মিশ্র একটু ধমকের সুরেই বললেন, ছেলেমানুষি করিসনে মুংরা। তোরা কাজ করছিস ওখানে। এখুনি চাকরি গেলে এতগুলো লোকে খাবি কি। ছেলে বাচ্চাগুলোর মুখেই বা কি দিবি। তার চেয়ে সাহেবের কথা শুনে এ বছর সামলে থাক। ধীরে ধীরে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

তু তো এমনি কথা বলবি।

না রে মুংরা, তোদের রাজাভাই বলে, তোদের ছেলেগুলো যখন লেখাপড়া শিখে কাজ করতে যাবে তখন ভেঙে দেবে ওদের বিষদাঁতগুলো। ঠিক ঠিক কাজ করবে আর ঠিক ঠিক পাওনা আদায় করে নেবে।

দু'একজন বলল, হুঁ, ঠিক্, ঠিক্ কথা কইছে আমাদের রাজাভাই।

ক'টি মেয়ে এসেছিল ওদের সঙ্গে। তাদের একজন বলল, মরদগুলানের কথা বাদ দাও, আমরা মেয়েছেইলা কাচ্চাবাচ্চা লিয়ে মেলায় আইসব। বড়ঠাকুর তু আমাদের বাধা দিবি নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, তোরা যদি আসিস আমি বাধা দিতে যাব কেন বল? তোদের সকলের জন্যেই তো মেলার ব্যবস্থা। তবে বুঝে সুঝে কাজ করিস, এই আমার কথা।

ওরা নিজেদের ভেতর কিসব বলাবলি করল, তারপর নমস্কার করে চলে গেল আস্তানার দিকে।

বিকেলে বেলা পড়ে এলে একটি মেয়ে এল সীতাপুর গাঁ থেকে। দিবাকর মিশ্রের ঘরে ঢুকে কি যেন বলল। দিবাকর মিশ্র সীমাকে ডেকে বললেন, এই যে মা তোমার ডাক এসেছে সুপ্রকাশের কাছ থেকে। তুমি আজ ঐ গাঁয়েই থাকবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

সীমা তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল মেয়েটির সঙ্গে।

পথে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল।

সীমা জিজ্ঞেস করল, কি নাম ভাই তোমার?

গৌরী।

সীতাপুর গ্রামেই তোমার বাড়ি?

না দিদি, আমার বাড়ি তিন চারখানা গাঁয়ের ওপারে অক্ষয়বট গাঁয়ে। আমার মামার বাড়ি সীতাপুরে।

এখানে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

না, আমি এখানেই থাকি। সীতাপুর ইস্কুলে পড়ি।

সীতাপুরে ইস্কুল আছে বুঝি?

হাঁ, দুটো ইস্কুল। একটা মেয়েদের, আর একটা ছেলেদের।

সীমা অন্য কথায় গেল, তোমাদের এখানে মেলা হবে বলে শুনছি?

হাঁ, মেলা হবে। খুব বড় মেলা। অনেক লোক আসে নানা জায়গা থেকে। কত যাত্রা, কবিগানের আসর বসে। পুতুলনাচ, সার্কাস—সে এক এলাহী ব্যাপার।

তোমরা খুব মজা কর নিশ্চয়ই।

মেয়েটি বলল, মজা হয় খুব, তবে সুপ্রকাশদা আমাদের ওপর অনেক কাজের ভার দিয়েছেন।

সীমা কৌতুক করে বলল, তাহলে তো তোমাদের মজা ষোল আনা হল না ভাই।

মেয়েটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, বাইরের কত লোক আসেন আমাদের গাঁয়ে। তাঁরা খুশী হয়ে ফিরলে আমাদের কত আনন্দ হয় বলুন দেখি। তাছাড়া আমরা গাঁয়ের তৈরী জিনিস স্টলে সাজিয়ে বিক্রি করি। সে যে কি মজা তা আর কি বলব।

সীমা বলল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করব ভাই।

করবেন বৈকি। সুপ্রকাশদার কাছে কারো রেহাই নেই। সারা গাঁয়ের ছেলে বউ ঝি সবাই কাজে লেগে যায়। জানেন, মেলার সাত দিন কোন বাড়িতে রান্না হয় না। গ্রামের সকলে মিলে ইস্কুলবাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে।

সীমা মনে মনে ভীষণ খুশী হল।

উত্তর দিক থেকে নদীর তীর বরাবর একটা বড় বাঁধ এসে গাঁয়ের ভেতর ঢুকে গেছে। সীমা দেখল সেই বাঁধের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসছে পাল পাল গরু আর মোষ। রাখাল ছেলেরা তাদের আগে পাছে চলেছে। সীমার মনে হল, এ যেন এক শোভাযাত্রা। একেবারে রাস্তা জুড়ে তারা ফিরছে গাঁয়ের দিকে। ওরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওদের চলে যাওয়ার পথ করে দিলে। কয়েকটা রাখাল শুয়ে ছিল মোষগুলোর পিঠের ওপর। তারা তাদের বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি ছেলে মোষের পিঠে বসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলেছে। সীমার মনে হল, এ যেন এক অন্য জগৎ, ভিন্ন জীবন। গোধূলির আকাশ শেষ সূর্যের গলানো সোনায়, গরুর খুরের ধূলিতে আর ঊর্ধ্বমুখী তালগাছ-গুলোর পাতার আন্দোলনে এক মহান দৃশ্য মেলে ধরল সীমার চোখের ওপর। সে মনে মনে তার প্রাণের ঈশ্বরকে নমস্কার জানাল।

মেয়েটি সীমাকে নিয়ে যেখানে এল, সেখানে আগেই অনেক মেয়ে এসে জমায়েত হয়েছিল। সুপ্রকাশ বসে ছিল সেখানে। কি যেন আলোচনা চলছিল তাদের ভেতর। সীমা এসে পৌঁছলে ওদের আলোচনা থেমে গেল।

সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইনি আমাদের নতুন কর্মী সীমা। বাবা-মশায়ের ইচ্ছে, এবার আমাদের মেয়েমহলের কাজের পুরো দায়িত্ব এঁরই ওপর দেওয়া হোক।

মেয়েরা খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হল। তাদের মধ্যে একজন উঠে বলল, আমরা আমাদের ভেতর নতুন মানুষটিকে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। আমরা সকলেই বাবামশায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী ওঁর নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলব।

এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় সীমা বুঝি কখনও পড়েনি। সীমা সবাইকে নমস্কার করল। তারপর বলল, আমি আপনাদের প্রীতির আশ্রয়ে এসেছি,

সুতরাং আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব আমি আমার সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করব। পরিচালনা করবার বা নির্দেশ দেবার যোগ্যতা আমার নেই। আমরা সবাই সহযোগিতার ভেতর দিয়ে কাজ করব। আমি একেবারে নতুন, আপনারা এ কাজে অভিজ্ঞ, তাই আমার ভুল ত্রুটি ঘটলে আপনারা শুধরে নেবেন। আজ আপনাদের ভেতর এসে মনে হচ্ছে, আপনারা আমার অনেকদিনের পরিচিত। আপনারা আমাকে আপনাদের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত বলে মনে করলে আমার আনন্দ আর তৃপ্তির শেষ থাকবে না।

সীমা কথাগুলো বলে বসে পড়ল। মেয়েগুলি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সীমাকে ঘিরে বসে আলাপ করতে লাগল।

মেলার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথাই আলোচনা করল সুপ্রকাশ। তারপর একসময় উঠে পড়ল।

চলুন, আপনাকে আমাদের কয়েকটা কাজকর্মের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাই।

সীমা বেরিয়ে গেল সুপ্রকাশের সঙ্গে। আকাশে চাঁদের পূর্ণতা এসেছে। চতুর্দশীর চাঁদ ভৃঙ্গার থেকে যেন সাদা দুধ ঢেলে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। পথঘাট, ঘরবাড়ি, গাছপালা সবই রাতের বেলাতেও দৃশ্যমান।

সুপ্রকাশ চলতে চলতে বলল, আপনি যে এতখানি কাজের মানুষ, তা কিন্তু আমি আগে বুঝতেই পারিনি।

সীমা অবাক হয়ে বলল, কি রকম?

এই যে আপনাকে পরিচালিকার পদটি দেওয়ামাত্র আপনি কোন ওজর আপত্তি না দেখিয়েই গ্রহণ করে ফেললেন।

সীমা বলল, সত্যি বলছি, আপনি এতখানি বিপদে ফেলবেন জানলে আমি আজ কিছুতেই এমুখো হতাম না।

সুপ্রকাশ বলল, সাঁতার কাটতে যখন জানেন, তখন এটাও জানেন যে সাঁতার শেখার প্রথম দিকে যিনি শেখান তিনি জলের মধ্যে ঠেলে দেন। প্রথমটা ভীষণ কষ্ট হয়, কিন্তু পরিণামে ওতেই কাজ হয়।

সীমা হাসল। বলল, আপনি শিক্ষার্থীকে ধারে কাছে রেখে আগে হাত পাটাও চালাতে শেখালেন না, একেবারে ডুবজলে ছুঁড়ে দিলেন। চেষ্টা করব উঠতে, না পারলে গুরুই ধরে ওঠাবেন।

এবার হাসির পালা সুপ্রকাশের।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল একটি লম্বা ঘরের সামনে। ভেতরে হেজাকের আলো জ্বলছে। ঠকাঠক মাকু চলছে। সঙ্গে সঙ্গে গান।

ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে গানটা শুনল। গান শেষ হলে সীমাকে নিয়ে সুপ্রকাশ ঢুকল ভেতরে।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, এই যে আমাদের রাজাভাই এসেছে।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলল, ভাল গান বেঁধেছ দেখছি। গানটা লিখল কে?

সিধু মাস্টার।

সুর দিল কে ?

সুধা দি।

গাইল কে ?

আমরা গো, আমরা সবাই।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলল, এই তোমাদের গাঁয়ের নতুন মানুষ। গ্রামকে ভালবেসে শহর কলকাতা ছেড়ে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন।

ওরা নমস্কার করল। সীমা হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল ওদের। একজন বলল, তুমি খাঁটি জহুরী রাজাভাই, দামী হীরে চেনা তোমার পক্ষে শক্ত কি।

ওরা সমস্ত তাঁত বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখল। সীমা তো অবাক। এত সুন্দর ডিজাইনের কাপড়ও তৈরী হয় এখানে।

সীমা বলল, সত্যি কাপড়ের জমি আর ডিজাইন দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে এত দূরের একটা গাঁয়েও এসব তৈরী হচ্ছে।

সুপ্রকাশ বলল, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই এসব করেছে। দেশবিদেশের ডিজাইন বই দেখে আমাদের গাঁয়ের পাসকরা শিল্পী ছেলেরা এসব নতুন নতুন ডিজাইন বের করেছে। পুরোনোদিনের বালুচরী শাড়ি, শবনম্ মসলিন থেকে আটপৌরে সাধারণ শাড়ি পর্যন্ত এখানে এইসব শিল্পীরা তৈরী করছে।

সীমা বলল, মসলিন প্রভৃতি শাড়ি আজ তো দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে বললেই হয়। তেমন কারিগর কি এখনও আছে ?

সুপ্রকাশ বলল, হয়ত তত সূক্ষ্মকাজের কারিগর নেই, কিন্তু এরা যা করছে তাতে অনেকেই অবাক না হয়ে পারেন না। আসল কথা কাজে যদি প্রাণ থাকে তাহলে কাজটা নিখুঁত হতে দেরি লাগে না।

ওরা কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

সুপ্রকাশ বলল, এইসব ছেলেদের অনেকেই বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছে। দেশবিদেশের নানা জিনিস ওরা চোখে দেখে, হাতে কলমে শিখে তবে এসেছে এ গাঁয়ে। এদের এক একজন অনেক টাকার মাইনেতে ঢুকে যেতে পারত কোন বড় চাকরিতে, কিন্তু তা ওরা করেনি। ওদেরও সামনে একটা আদর্শ আছে। চাকরিতে বসে শুধু পদোন্নতি কি করে হয় সে কথা ভাবলে দেশকে কিছু দেওয়া যায় না। এই বিশ্বাস নিয়েই ওরা কাজ করছে।

সীমা বলল, আজকের দুনিয়ায় এ কথা ভাবলেও অবাক লাগে।

এবার ওরা এসে পেঁাছল আর একখানা ঘরের পাশে। সেখানে নানারকমের হাতের কাজ চলছিল। কেউ শোলা দিয়ে তৈরি করছিল কৃষ্ণরাধার মূর্তি। কাংড়া পেণ্টিংএর অনুসরণে। তার চারদিকে অবশ্য কল্কা আর ময়ূরের বেষ্টনী দিয়ে নতুন পুরাতন রীতির মিলন ঘটান হচ্ছিল। কোথাও তৈরী হচ্ছিল সফ্‌ট্ স্টোনের মূর্তি। কোনারক, ভুবনেশ্বরের মূর্তির অনুকরণে শিল্পী তৈরী করছিলেন মূর্তিগুলি।

সুপ্রকাশ বলল, এরা উড়িষ্যাতে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ শিখে এসেছে।

একটি মূর্তি হাতে তুলে বলল, দেখুন তো দেখি ঐ বইএর ফটোর সঙ্গে এর মিল আছে কিনা ?

এমন নিখুঁত কাজ সত্যিই সীমা দেখেনি।

সে বলল, আমি ভাবতেও পারছি না, এখানে কি করে এ দক্ষতা পেলেন এঁরা।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, তাহলে রঙরেজিনীর গল্প বলতে হয়। একদিন বাদশা দেখলেন তাঁর উজীর বড় সুন্দর রঙে পাগড়িখানা রাঙিয়ে এসেছেন। বাদশার ভারী পছন্দ হয়ে গেল। তিনি বললেন, ওহে উজীর, তুমি এ পাগড়ি রাঙালে কোথায় ? উজীর বললেন, জাঁহাপনা, আমার বিবিসাহেবা এ কাজ করে দিয়েছেন।

বাদশা তখন খুশী হয়ে বললেন, তাহলে আমার জন্যেও এমনি একখানা রাঙিয়ে এনো।

কয়েকদিন পরে উজীর নিয়ে এলেন একখানা পাগড়ি রাঙিয়ে। কিন্তু বাদশার পছন্দ হল না। এ রঙ উজীরের পাগড়ির রঙের চেয়ে নিরেস বলেই তাঁর মনে হল।

তখন একটার পর একটা পাগড়ি রাঙিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন উজীর বাদশার কাছে। কিন্তু বাদশা শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে জানাতে লাগলেন, হল না, এ ঠিক হল না।

শেষে একদিন বাদশা তলব করলেন উজীরের বিবিকে। উজীর সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁকে।

বাদশা বললেন, আচ্ছা আপনি তো একই রঙ গুলে পাগড়ি রাঙিয়েছেন, কিন্তু উজীরেরটি যেমন হয়েছে, আর কোনটি তেমন হচ্ছে না কেন? বিবিসাহেবা বললেন, জাঁহাপনা, সব পাগড়িই আমি একই রঙে ছুপিয়েছি ঠিক, কিন্তু আপনার উজীরের পাগড়িতে আর একটা বেশী রঙ পড়েছে।

বাদশা অমনি বললেন, কি সে রঙ ?

বিবি হেসে বললেন, জাঁহাপনা, সে রঙ আমার দিলের—অনুরাগের। তা ঐ উজীরের পাগড়িতে ছাড়া আর কোথায় ঢালব বলুন।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, এদের কাজে সেই দিলের রঙ লেগে এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে সবকিছু।

একজন বলল, সে রঙ হয়ত সবার মনেই ছিল, তবে তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে শিখিয়েছ তুমিই রাজাভাই।

সেখান থেকে ওরা পথে নামল। চলতে চলতে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রকাশ। হঠাৎ কি মনে হতেই উঠে পড়ল ঐ বাড়ির দাওয়ায়।

হাসি ? হাসি আছিস নাকি রে ?

ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বছর ষোল সতের বয়স হবে।

হাসি এসেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এই তোমার নারকোল মুড়ি খেতে আসার সময় হল। সেই পরশু সকালে হেঁকে বলে গেলে, আমি এখুনি

আসছি, মুড়ি নারকোল রেডি রাখিস। তারপর আর দাদাসাহেবের দেখাই নেই। ভারী বয়ে গেছে আমার তোমাকে খাওয়াতে। দেখো আর কখখনো যদি তোমার হাতে কিছু তুলে দিই।

হাসির গলাটা সত্যিই ভারী হয়ে এল।

সুপ্রকাশ বলল, কে যে তোর হাসি নামটা রেখেছিল তাই ভাবি, তোর নাম কান্না, নয়তো অশ্রু হওয়াই উচিত ছিল।

হাসি এবার সত্যিই হেসে ফেলল, তুমি মনে করেছ, এমন করে হাসিয়ে দিয়ে তুমি আমার রাগ কেড়ে নেবে।

সুপ্রকাশ অমনি বলে উঠল, তোর রাগ কেড়ে নেব কি রে, রাগলেই তো তোকে ভাল দেখায়।

আবার হাসল হাসি।

সুপ্রকাশ বলল, এই তো, একেবারে পূর্ণিমার শশিমুখী। দে, এখন কিছু খেতে দে।

তারপর হঠাৎ সীমার কথা মনে পড়ে গেল। অমনি সুপ্রকাশ বলল, হাঁ শোন হাসি, যিনি ঐ দাঁড়িয়ে আছেন পথে, তিনি আমাদের মহিলা সমিতির নতুন পরিচালিকা নিযুক্ত হয়েছেন। বাবামশায়ের নির্বাচন।

হাসি বলল, তুমি তো ভারী স্বার্থপর। নতুন মানুষকে নিজে আগলে বেড়াচ্ছ। সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে আসবে তো।

বলতে বলতে হাসি পথে বেরিয়ে গিয়ে সীমাকে নমস্কার করে বলল, দেখুন তো দিদি, সুপ্রকাশদার কাণ্ডখানা, আপনাকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে গল্পে মত্ত হয়ে গেছেন।

সীমা বলল, না না তাতে কি হয়েছে। আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। বেশ লাগছে।

আপনার হয়ত ভাল লাগছে, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমার ঘরের সামনে এসে আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এ কি করে হয়।

অগত্যা সীমা হাসির ঘরে গিয়ে উঠল।

সুপ্রকাশ বলল, হাসি, ইনি হলেন সীমা।

তারপর সীমার দিকে ফিরে বলল, আর উনি যে হাসি তা ওঁর হাসি হাসি মুখখানা দেখেই বুঝতে পারছেন।

সীমা আর হাসি দুজনেই হেসে উঠল।

হাসি সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন বল কি খাবে?

সুপ্রকাশ বলল, হাসি, ইনি আজ রাত থেকে মেলা না ফুরোনো পর্যন্ত তোর এখানেই থাকবেন। ওঁকে নিয়ে আমি একটু পরেই ফিরে আসছি। তুই খাবার যোগাড় করে রাখ, আমিও খেয়ে যাব।

হাসি বলল, কি ভাল লাগছে আমার। একা একা ছিলাম, সঙ্গী পাওয়া গেল। তুমি কি ভালো সুপ্রকাশদা। আজ আমি তোমার প্রিয় খাদ্য ছানার ডালনা রেঁধে খাওয়াব।

সুপ্রকাশ পথে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, বেশী লোভ দেখাসনে, হয়ত কাজকর্ম ভুলে এখানেই থেকে যাব।

সীমা গ্রামখানা ঘুরে ঘুরে অনেককিছুই দেখল। দিনরাত গ্রামের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই মিলে আগামী মেলার জন্যে কাজ করে চলেছে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কোন কাজকে ছোট বলে কেউ অবজ্ঞা করছে না, অসম্পূর্ণ অবস্থায় দূরে সরিয়ে রাখছে না। গান উঠেছে আকাশে বাতাসে।

'মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলাভাষা
মাগো তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।'

সীমা মনে মনে অনুভব করল, এ এক পরিপূর্ণতার জগতে সে এসে পড়েছে।

পরের দিন ভোরে সীমা দেখল, নদী থেকে খাল কেটে নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের ভেতর, আর সেই খালের থেকে জল তুলে চাষ হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ধান আর নানারকম সবজির। সুপ্রকাশ বলল, এ সমস্ত জমি জায়গা, এর উৎপন্ন ফসল সব গ্রামবাসীদের। তারা জমির ভেতর ছোট ছোট আলের সীমা ভেঙে দিয়ে নিজেদের ভেতরের বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলেছে। এ জমি ট্র্যাক্টরেই চাষ হয়।

সীমা বলল, চাষের পর ফসলের ভাগ যে যার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নেয় নিশ্চয়।

সুপ্রকাশ বলল, তা কেন হবে। ফসলের কমবেশী ভাগ হয়, প্রতি বাড়ির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাছাড়া এ গ্রামে আগে ছিল বাবামশায়ের জমিদারি। ওঁর জমিই ছিল বেশী। বাকী যাদের জমি জায়গা ছিল, উনি তাদের অন্য গ্রামে বদলী জমি দিয়ে, কাউকে বা নগদ টাকা দিয়ে এ গ্রামখানা একেবারে নিজের করে নেন। তারপর পড়াশোনা শেষ করে যখন ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন, এ গ্রামখানা আমার বড় প্রিয়। তোমার হাতে একে তুলে দিচ্ছি। তুমি মনের মত করে একে গড়ে তোল। তোমার লেখাপড়ার শক্তিতে তুমি হয়ত চাকরি বা ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে, কিন্তু অনেক শান্তি এই গ্রামের ছায়ায় লুকিয়ে আছে, তুমি তার খোঁজ কর, এই আমার ইচ্ছে।

সুপ্রকাশ বলল, আজ যে গ্রামখানাকে গড়ে উঠতে দেখছেন, এ তাঁরই ইচ্ছার রূপ। আমি এ গ্রাম সমস্ত গ্রামবাসীকেই দান করেছি। এ এখন

সকলের সম্পত্তি।

সীমা বলল, ভারতের প্রতি গ্রাম যদি এমন হোত তাহলে হয়ত মানুষে মানুষে অনেক বিভেদ ঘুচে যেত।

সুপ্রকাশ বলল, আমার স্বপ্ন ঠিক তাই জানবেন। তবে এ কাজ একার দ্বারা হয় না। দেশের সরকার যদি হাতে তুলে নেন এ কাজ তাহলেই কেবল তা সম্ভব। অবশ্য লাল ফিতার বাঁধনের ভেতর শুধু পরিকল্পনার পর পরিকল্পনার স্তূপ জমিয়ে তুলে কোন লাভই হবে না।

পড়ন্তবেলায় আবার বেরল সুপ্রকাশ আর সীমা। নদীর ওপর একটি কাঠের সাঁকো। কয়েকখানা নৌকোয় মাল বোঝাই হচ্ছিল। সুপ্রকাশ সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, মোহনদা, শনিবারের ভেতর ফিরে আসা চাই কিন্তু। মাদারপুর থেকে কবিগানের লোকজনকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে ভুল হয় না যেন।

মাঝি মোহন পাল হেঁকে বলল, সে কথা ভুললে ছেলেছোকরার দল আমাকে কি আর আস্ত রাখবে দাদাভাই।

সাঁকো পেরিয়ে সুপ্রকাশ চলল ওপারে। এদিকে আদিবাসী পল্লী। ছোট ছোট চালাঘর। মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। একদল হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে পাশের কোন একটা জলা জায়গা থেকে উঠে এল। দুটো ছাগলছানা ভয় পেয়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। তাদের ঘিরে কালো একটা পোষা কুকুর দৌড়োদৌড়ি আর লম্ফঝম্প করছে।

সুপ্রকাশ একটা চালার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, ঝুমরী ঘরে আছিস ?

একটা বুড়ী বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে। কপালে বাঁ হাতখানার আড়াল দিয়ে আগন্তুককে দেখার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ পরে যেন ঠাওর করে বলল, কে, ছোটঠাকুর না ?

হাঁ, আমি। তা তুমি আছ কেমন ?

আর থাকব কি, বুড়া হইয়েছি, নজর চলে নাই।

সুপ্রকাশ বলল, যেও একদিন ঝুমরীকে নিয়ে আমাদের হাসপাতালে। মনে হচ্ছে ছানি পড়েছে চোখে। কাটাতে হবে।

বুড়ী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, দোহাই ছোটঠাকুর, কাটাইতে পারব নাই। একেবারে অন্ধ হইয়ে যাব।

অন্ধ হয়ে গেলে ভয় নেই, আমি তোমার হাত ধরে পথে পথে ঘোরাব।

তু বড় ভাল লোক আছিস ছোটঠাকুর, তোর খুব দয়া আছে।

এবার সুপ্রকাশ বলল, ঝুমরী কোথা, আমাকে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে পালাল নাকি ?

একটা খিলখিল হাসির আওয়াজ এল ঘরের ভেতর থেকে।

পালাইব কেনে। তু কি শের আছিস, তু তো ছোটঠাকুর আছিস।

সুপ্রকাশ বলল, বেরিয়ে আয় একবার, শের কি ঠাকুর দেখে যা। ঠিক

ধরেছি, এখনও চাটাই তৈরী হয়নি, তাই লুকোনো হচ্ছে।

ঘরের ভেতর থেকে একগোছা তালপাতায় বোনা চাটাই তুলে এনে সুপ্রকাশের সামনে ফেলে দিয়ে ঝুমরী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

বুনি নাই। দ্যাখ কত্তো চাটাই বুইনেছি।

এই ক'খানা বুনে আবার বীরত্ব হচ্ছে। আমার কিন্তু শুক্রবারের ভেতর চাই। না পেলে তোর ঐ দাঁতক'টা ভেঙে দেব। দেখবি তখন আর চুরি করে শক্ত পেয়ারাগুলো চিবিয়ে খেতে পারবিনে।

খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমরী, তু আমার দাঁত ভেইঙে দিবি রাজাভাই। আমার মরদ কি বইলবে।

তোর ভাঙা দাঁত দেখলে গুরাং তোর মাথাটাই ভেঙে ফেলবে।

ঝুমরী অঙ্গভঙ্গী করে হাত নেড়ে বলল, যাঃ, তাহলে ল্যাঠা একেবারে চুকিয়ে যাবে।

সুপ্রকাশ আর সীমা হাসতে হাসতে চলল এগিয়ে। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছিল। এদিকে কয়েকটা পলাশগাছ। পাতা নেই, শুধু ডালের কোলে কে যেন আটকে রেখে গেছে লাল লাল ফুল।

সুপ্রকাশ হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, কে ওখানে ?

আমি ছোটঠাকুর।

কে তুই, বলবি তো ?

শনিচারী।

ভর সাঁঝে কি করছিস ওখানে, এদিকে আয়।

শনিচারী সুপ্রকাশের ডাকে কাছে এল।

ওরা দেখল শনিচারী তেল দিয়ে মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ে বেঁধেছে। কালো খোঁপায় পলাশফুল গোঁজা।

কিরে খুব সেজেগুজে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

মরদের লেইগে !

খুব ভাল, বুধনের আসার সময় হল।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, হাঁরে, ওদের তো শুনেছি ওভারটাইম চলছে। ও এত তাড়াতাড়ি আসবে কেন ?

ওকে বাড়তি কাম দিবে নাই।

কেন, কি হল আবার ওর ?

ও সাহেবের সামনে বুইলেছে, ও মেলায় যাবে। তাই সাহেব গোসা কইরেছে। চাকরি খতম হইয়ে যেত, মুংরা সাহেবের কাছে ওর হইয়ে মাপ চাইয়েছে।

সুপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলল, বাবামশায় তো বারণ করেছেন তোদের মেলায় আসতে। মিছিমিছি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে কেন বুধন।

ও মানবেক নাই। ও বলে, আমি বাড়্তি কাম করব নাই।

তোদের জ্বালায় পারা গেল না দেখছি। হাঁ শোন, বুধনকে বুঝিয়ে বলিস,

মেলায় এবার না এলেও টাকা ঠিক পাবি তোরা। এইখানে তীর ছোঁড়ার খেলা খেলতে বলিস।

সে আমি বইলব কেমন কইরে। ও মরদ আমাকে মানবেক না।

সুপ্রকাশ বলল, তোর গায়ে জোর নাই? মেরে মানাবি।

শনিচারী হেসে অস্থির। বলল, তু মারলে ও কুছু বলবে নাই। আমি মারলে দু'খান কইরে নদীতে ভাসাইবে।

বুধনকে আমার নাম করে বলিস, ও যেন গোলমাল না করে।

ওরা এবার ফিরল গাঁয়ের দিকে।

সুপ্রকাশ বলল, এইসব সাধারণ মানুষ, মেলায় এসে একটু আনন্দ করে, তীর ছোঁড়ার খেলায় অংশ নেয়, তাতে মালিকের ক্ষতি কোথায় তা বুঝতে পারি না। কাজের ভেতর আনন্দ না ছড়ালে কাজ যে মানুষের কাছে ভার হয়ে উঠবে।

সীমা বলল, ওরা চিরাচরিত প্রথায় কাজ করে যায়, ওতেই ওদের অভ্যেস। কাজের ভেতর আনন্দকে ওরা মনে করে অনাসৃষ্টি। আজকের দিনের মালিকরা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর মাঝখানে বাস করছে। বাইরের একটু আলোয় ওদের চোখ বুজে আসে, একটু মুক্ত হাওয়ায় বন্ধ হয়ে আসে ওদের দম।

সুপ্রকাশ বলল, ভারি সুন্দর বলেছেন আপনি। আমার কি মনে হয় জানেন, কৃষি আর শিল্প, দুটো নিয়েই আমাদের দেশের উন্নতি। কাউকে ছেড়ে কেউ এগিয়ে চলবে না। পাশাপাশি চলবে নির্বিরোধে। শুধু বদলে দিতে হবে পুরোনো ধারাগুলো। শাসন আর শোষণ থাকলেই তার সঙ্গে থাকবে পতনও।

এ কথা ওরা বোঝে না কেন?

হাসল সুপ্রকাশ। বলল, এত সহজে বুঝলে ওদের যে সব চলে যাবে। ক্ষমতার যে নেশায় ওদের পেয়ে বসেছে, সে নেশা আছে তার চেয়ে অনেক বড়।

সীমা বলল, আজকের দুনিয়ায় রোজই ওরা আঘাত পাচ্ছে, অশান্তির কাঁটায় বিঁধছে সারা শরীর তবু হুঁশ নেই।

সুপ্রকাশ বলল, শিকারী যারা, তারা বিপদের ঝুঁকি নিতেই ভালবাসে। শিকার তাদের নেশা। ওরা এ দুনিয়ার দুরন্ত শিকারী। এক দল পশুকে হত্যা করছে, অন্য দল মানুষকে।

ওদের কি সুবুদ্ধি কখনো হবে না?

যার যত তাড়াতাড়ি ঐ বুদ্ধিটা আসবে, বাঁচার পথ তার ততখানিই খোলা থাকবে।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে পড়ল গাঁয়ের ভেতর।

একটা প্রবল উন্মাদনার ভেতর দিয়ে চলল কয়েকটা দিন আর রাত। সীমা যেন কাজের মাঝে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। মেয়েদের নানারকমের কুটির-শিল্পগুলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে সে স্টল সাজাল। কখনো বা গানের দলের সঙ্গে

বসে গান গাইল। কখনো বা বিক্রেতা মেয়েদের বুঝিয়ে বলল, এক দাম বলবে জিনিসের। আমাদের কাছে দ্বিতীয় কোন দাম নেই। এই অভ্যেসটা চালু হয়নি বলেই ক্রেতা অনবরত দাম কমাবার চেষ্টা করে, আর বিক্রেতা চেষ্টা করে তাকে ঠকাতে।

আবার বলল, যদি কোন ক্রেতা তোমার সমস্ত সাজান জিনিস নেড়ে চেড়ে কিছু না কিনেও চলে যায়, তাহলেও তুমি তার পেছনে কোনরকম মন্তব্য করো না। বরং হাত জোড় করে বলবে, দরকার হলে দয়া করে আবার আসবেন।

মেলা বসেছে। অতিথিরা বিভিন্ন শহর, গঞ্জ থেকে এসেছেন। দর্শকেরাও মিছিল করে আসছে প্রতিদিন। সীমার উন্মাদনার শেষ নেই। দলে দলে ভাগ করে ফেলেছে সে তার বাহিনী। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ওপর দেওয়া দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

সীমা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দৌড়োদৌড়ি করে ফিরছে।

একসময় একটি কর্তব্যরত মেয়ের কাছে এসে সে চুপি চুপি বলছে, রাণুদিদি আসবেন তোমার জায়গায়, কিন্তু খেতে একটু দেরি হচ্ছে ভাই, তাই আসতেও দেরি হচ্ছে। বুঝতে পারছি বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে তোমার। এই নাও একটা বেগুনী খেয়ে নাও।

সীমা মেয়েটির মুখে বেগুনী পুরে দিয়ে চলে গেল।

কোথাও গিয়ে বলল, ফুলপিসি, পান ছাড়া কি করে আছ গো? তোমার তো এক মিনিট পান ছাড়া চলে না।

কি করব মা। কাজ ছেড়ে ঘরে যাই কি করে। মুখের ভেতরটা টক হয়ে উঠেছে। তা হোক, কাজ ফেলে তো আর পান খাওয়া যায় না।

এই নাও তোমার পান। জর্দাও এনেছি সঙ্গে।

ফুলপিসি অমনি ফুটে উঠলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, বেঁচে থাক মা। আহা, এমন করে আমার কথা মনে রেখেছ।

সীমা সেখান থেকে সরে চলে গেল।

অতিথিদের জন্য যে আস্তানা করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ঢুকল সীমা। কোন কোন বিশিষ্ট অতিথি সস্ত্রীক এসেছেন মেলায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তাঁদের তদারক করার জন্যে পালা করে মেয়েরা আসছে। গান-বাজনা, হাসি-গল্প সবই চলেছে সেখানে।

সীমা এসে বলল, সার্কাস কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ইচ্ছে করলে ওখানে যেতে পারেন।

একটি অতিথি বলে উঠলেন, শহরে তো সার্কাসের অনেক খেলাই দেখেছি, এখানে আর নতুন কি দেখব?

সীমা হেসে বলল, একটা ভারি সুন্দর বিশ্বাসের খেলা দেখায় এরা। হয়ত আপনারা এ খেলা একটু ভিন্ন রকমে দেখে থাকবেন। কিন্তু বারবার দেখলেও এ খেলা পুরোনো হয় না।

একটি মহিলা অতিথি বল্লেন, কি রকম?

সীমা বলল, পেছনে একটি বোর্ড, তার সামনে একটি মেয়ে। কিছু দূর থেকে স্বামী তার স্ত্রীর দিকে খুব ধারাল ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। স্ত্রী বেরিয়ে এলে দেখা গেল ছোরা দিয়ে অবিকল একটি মেয়ে তৈরী হয়ে গেছে।

অতিথিরা বললেন, এ খেলা আমরা দেখেছি।

সীমা বলল, এরপর ওরাই গভীর বিশ্বাসের খেলাটা দেখাবে।

স্বামীর চোখ ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল এবার। স্ত্রী গিয়ে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে। হাতে একখানা ছোট হাতুড়ি। তাই দিয়ে নিজের শরীরের চারদিকে ঘা দিয়ে চলল, আর স্বামীটি সেই শব্দ শুনে তীক্ষ্ণধার ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকুও ভয় নেই মনে। এতটুকুও কাঁপল না। কি আশ্চর্য নির্ভরতা!

অতিথি ভদ্রমহিলা ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, চল না দেখে আসি।

স্বামী বেচারা কি আর করেন, চললেন স্ত্রীকে খুশী করতে।

সীমা হেসে বলল, এমনি নির্ভরতা সংসার জীবনেও দরকার, কি বলেন?

ভদ্রমহিলা হেসে জবাব দিলেন, কেবল একতরফা হলেই চলবে না। স্বামীকেও ভাবতে হবে, সংসারের সব আঘাত থেকে স্ত্রীকে অক্ষত অবস্থায় কি করে রক্ষা করা যায়।

সীমা বলল, আপনার একথা অবশ্যই মানব। পরস্পরের বিশ্বাস আর একাগ্রতা না থাকলে সংসার জীবনে বিপদ বাধা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

ওরা এসে পেঁছিল সার্কাসের তাঁবুর সামনে। সীমা ওদের বসিয়ে দিয়ে এল অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে।

ফিরে আসছিল, কানে গেল কবির গান। একজায়গায় আসর জমজমাট। কবির লড়াই চলেছে।

একজন বলছে:

ও ভাই, সরস্বতী গুণবতী গুণের সীমা নাই
তেনার কমল চরণ করলে শরণ ভাবনা কি আর ভাই।
বলি, বিদ্যা বলে মানুষ চলে গ্রহ গ্রহান্তরে
তাই, সরস্বতীর দেখ খাতির সবার ঘরে ঘরে।

লক্ষ্মীর স্বপক্ষে ততক্ষণে বাদ্যিবাজনা শুরু হয়ে গেছে। দেবী লক্ষ্মীর পক্ষের কবিয়াল লম্ফ দিয়ে আসরের মাঝখানে এসে গেল।

লক্ষ্মীছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কর ব্যাটাকে এদেশ ছাড়া;
চাল কলা আর পাওনা ছাড়া মন্ত্র পড়া টিকি নাড়া—
চলবে ক'দিন?
বলি, চলবে ক'দিন তাক্ ধিনা ধিন্, চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয়,
সরস্বতীর বুলি লম্বা, অন্তরম্ভা, ভরে না পেট শূন্য দেহ।
দেখ, ভাল ছেলে ঘরে এলে সবাই বলে 'লক্ষ্মী ছেলে',
'সরস্বতী ছেলে' বলে কোনকালে ডাকে কেহ?

এমন ঘুরে ফিরে আসর জমিয়ে গান করছিল লোকটি যে সীমার হাসি পেয়ে গেল। সে আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াল না। তার মনে হল কেতকী ভারি মজার মেয়ে। ক'দিন কাজের মাঝে সে হাসি গল্পে প্রায় জমিয়ে রেখে দিয়েছিল। ও এই গান শুনলে বড় খুশী হবে। শুধু তাই নয়, অনেকদিন ও এইসব অভিনয় করে সবার হাসির খোরাক যোগাতে পারবে।

সীমা চলল মিষ্টির স্টলের দিকে। গ্রামে তৈরী নানারকমের মিষ্টি সাজান ছিল সেই স্টলে। কেতকীর ওপর ভার ছিল খদ্দেরদের কাছে সেই মিষ্টি পরিবেশনের। সীমা গিয়ে দেখল, কয়েকজন খদ্দের ওদিকের বেঞ্চে বসে মিষ্টি খাচ্ছে। ও কেতকীর কাছে গিয়ে বলল, মিষ্টিমুখ করাচ্ছ দেখছি?

কেতকী বলল, ময়রার তো নিজের মিষ্টি খাবার হুকুম নেই, তাই মিষ্টি-মুখ করান ছাড়া তার আর গতি কি বল।

সীমা বলল, আর মুখ ব্যাজার করে থাকতে হবে না, দৌড়ে চলে যাও কবিগানের আসরে। কিছুক্ষণের ভেতরেই আশা করি হাসিমুখখানা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

কেতকী চোখ কপালে তুলে বলল, আর দোকান দেখবে কে?

সীমা বলল, সে ভাবনা আপাততঃ আমার। তবে গিয়ে একেবারে জমে যেও না। এই আধঘণ্টা ছুটি তোমার।

কেতকী হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাল।

সীমা দাঁড়িয়ে ছিল স্টলের ভেতর নির্দিষ্ট জায়গায়। একটি একটি করে খদ্দের খেয়ে উঠে আসছিল। সীমার হাতে তারা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শেষে দুটি লোক উঠে এল। তারা সীমার হাতে একটি পাঁচটাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল।

সীমা ভাঙানি নিয়ে মুখ তুলে দেখল লোকগুলি চলে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে বলল, এই যে শুনছেন, চেঞ্জটা নিয়ে যান।

সীমার ডাকে ওরা একবার ফিরে দাঁড়াল। তারপর দূর থেকে একমুখ অদ্ভুত হাসি হেসে জনতার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূত দেখলেও বুঝি সীমা এতখানি বিচলিত হত না। তার সারা দেহ কেঁপে উঠল, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। সে বসে পড়ল চেয়ারের ওপর।

সে ঠিকই দেখেছে সেই দুজনকে যারা তার বাড়িতে গিয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানিতে এনে তুলেছিল। সমস্ত মুখে কি বিকৃত শয়তানি হাসি ফুটিয়ে ওরা চলে গেল। সীমার মনে হচ্ছিল সে যেন এখনও বন্দী হয়ে আছে প্রথম দিনের সেই প্রাসাদোপম ঘরখানির ভেতর।

যে মেয়েটি প্লেটে করে পরিবেশন করছিল, সে সীমার কাছে এসে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি সীমাদি?

সীমা এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল। সে বলল, না, এই মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল দাও তো ভাই।

মেয়েটি জল এনে দিল। সীমা চোখে মুখে জল দিল। তারপর ধীরে ধীরে

সুস্থ হয়ে আবার মন দিল বিক্রির কাজে। ইতিমধ্যে কেতকী ফিরে এল। সীমা তার হাতে কাজের ভার দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এই জনারণ্য থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেই নদীর ধারে। কাঠের কালো ব্রীজখানা দাঁড়িয়ে আছে। এপার ওপারের একমাত্র সেতুবন্ধ। এদিকে কৃষক পল্লী ওদিকে আদিবাসী কুলিকামিনের আস্তানা। সীমার মনে হল, একজন দেশকে গড়ছে সর্বস্ব দিয়ে, আর অন্যজন দেশকে ভেঙে শুধু ভরাচ্ছে নিজের বিত্তের ভাণ্ডার। কেবল এতটুকু নদীর ব্যবধান। কিন্তু কি বিপুল ব্যবধান এদের দু'পক্ষের চিন্তার।

সীমা মেলার দিকে তাকিয়ে দেখল, আলো জ্বলছে, কোলাহল এখানেও ভেসে আসছে, দপদপ করে সবার মাথার ওপর জ্বলছে সার্কাসের তাঁবুর মাথার আলোটা।

সীমার মনে হল, তাদের অতিথি স্বামীস্ত্রীতে এখন হয়ত দারুণ উত্তেজনার খেলাটা পাশাপাশি বসে দেখছেন। তাঁরা নিবিড় ভয়ংকর মৃত্যুমুহূর্তে হয়ত পরস্পরের হাত অন্ধকারের ভেতর জড়িয়ে ধরেছেন। তারপর খেলা শেষ হলে হাসিমুখে বোর্ডের কাছ থেকে চলে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে সেই সার্কাসের মেয়েটি। দর্শকদের করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। সীমা যেন দেখতে পেল, অতিথি ভদ্রলোক আব তাঁর স্ত্রী সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিযে আসছেন হাত ধবাধবি কবে। একটা পবম নির্ভরতার আলো ফুটে উঠেছে ওঁদের মুখে। ওঁদের চোখে মুখে যেন সেই প্রতিজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে,—আমরা বিশ্বাসে হাত বেঁধে চললে কোন ঝড়ই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

সীমা, সীমা—।

সীমা চমকে উঠল। সুপ্রকাশের গলা বলে তার মনে হল।

দূর থেকে কাছে এল সুপ্রকাশ।

আপনি এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে! ওদিকে অতিথি ভবনে কেউ কেউ আপনার খোঁজ করছেন।

সীমা বুঝল, সার্কাসের ঐ খেলা দেখে এসে স্বামী স্ত্রী বিশেষ তৃপ্ত হয়েছেন, আর তাই তার খোঁজ পড়েছে এসময়।

সে সুপ্রকাশকে বলল, যদি নাম ধরেই ডাকলেন, তাহলে আর আপনির গণ্ডী টেনে দূরে সরিয়ে রাখলেন কেন?

ও এই কথা।

মনে হল সুপ্রকাশের গলায় অপ্রস্তুতের একটা স্বর বেজে উঠল।

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, একদিন মেলামেশার ভেতর তো নাম ধরে ডাকতেই হবে।

সীমা বলল, সেই ডাকটা যখন আজকের শুভমুহূর্তে ভেসে এল আমার কাছে, তখন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকেই সত্য বলে মেনে নেব সুপ্রকাশদা।

সুপ্রকাশ সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। দূরের পাহাড়ের আড়াল থেকে রক্তবর্ণ চাঁদটা উঁকি দিল।

সুপ্রকাশ সীমার হাত ধরে বলল, এ ক'দিনে নিজেকে নিঃশেষ করে তুমি কাজ করে গেছ সীমা। তোমার এই অক্লান্ত উৎসাহই আমার সমস্ত শক্তির উৎস। আজ শুধু বল, আমার এ কর্মযজ্ঞ কেবল আমার নয়, তোমারও।

তাই হবে সুপ্রকাশদা।

সীমার গলা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। সে বলল, শুধু বঞ্চনার পৃথিবী থেকে তুমি আমাকে টেনে তুললে বিশ্বাসের জগতে। আমার মনে হচ্ছে, দুজনে পাশাপাশি চলে আমরা পৌঁছতে পারব নতুন সূর্যোদয়ের দেশে।

...মেলার শেষ দিনটি ঘনিয়ে এল। আদিবাসীরা মানল না তাদের সাহেবের কথা। তারা মেয়ে পুরুষে দলে দলে পৌঁছল শেষ দিনের অনুষ্ঠানে। তেমনি উৎসাহে চলল তীরের খেলা। শুধু মেলায় এল না বুড়ী তুরাইয়া। সে চোখে ভাল দেখে না, তার ওপর পল্লী ছেড়ে সবাই চলে যাবে কি করে। একজন অন্ততঃ পাহারায় থাকা চাই। সাঁঝের আগে লক্ষ্যভেদের খেলা শেষ হলে শুরু হবে মেয়েদের নাচ। ওরা সবাই চলে গেছে। মনের খুশিতে পলাশফুল সংগ্রহ করতে থেকে গেছে শুধু একজন। সে শনিচারী। পলাশবনে ঘুরে ঘুরে আঁকশি দিয়ে সে ফুল পেড়ে চলল। আজ তার খুশী বাধ মানছিল না। মরদগুলো আজ তার স্বামীর কথা মেনেছে। তারা যদি উপরি কাজ নাও পায় তবু তারা যাবে মেলায়। তাই আজ শনিচারীর সুখের দিন। গর্বে তার বুকটা ভরে উঠেছে। সে মেয়েদের বলে দিয়েছে, তুরা যা, আমি ফুল লিয়ে যাব।

মনের খুশীতে ফুল পেড়ে সে ঝুড়ি ভরেই চলেছে। কখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে সে বুঝতেই পারেনি। যখন আর ফুল দেখা যায় না, তখন শনিচারী ফিরে দেখল পশ্চিমের লালচে আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

একি, এ যে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী! শনিচারী পাগলের মত ছুটে চলল। বস্তি দাউদাউ করে জ্বলছে। তুরাইয়া, তুরাইয়া বলে ডেকে চলল সে। পথের ধুলায় ছড়িয়ে পড়ল সদ্য তুলে আনা রাশি রাশি পলাশফুল।

আগুন তখন অনেকগুলো জিভ মেলে দিয়েছে। শনিচারী ছুটল নদীর ওপর সাঁকো লক্ষ্য করে। হাঁপাচ্ছে সে। পথে পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে দৌড়চ্ছে। সাঁকোর কাছে এসে সে আছড়ে পড়ে গেল। সাঁকো জ্বলছে। এপার থেকে ওপারে যাবার পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। কারা শনিচারীর অবশ দেহখানাকে তুলে নিল জীপে। কে যেন বলে উঠল, এটা সেই হারামজাদা বুধনের বউ।

এদিকে তখন মেলায় আদিবাসী মেয়েদের নাচ শুরু হয়ে গেছে। মাদল বাজাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছে আর গাইছে।

আগুন! আগুন!

আগুনের মত সারা মেলায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। সবাই ছুটল আগুন লক্ষ্য করে। দৌড়ে তারা যখন এসে পৌঁছল নদীর ধারে তখন সাঁকোটা জ্বলে নদীর স্রোতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

আদিবাসী মেয়ে পুরুষেরা চীৎকার করে বুক চাপড়াতে লাগল। বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র তাঁর আস্তানা থেকে তখন আগুন দেখতে পেয়ে চলে এসেছেন। তাঁকে দেখে মুংরা তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ল, বাবামশয় আমাদের সব্বোনাশ হইয়ে গেলো। এ আমাদের কি হইল রে! হায়, হায়, হায়!

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র শুধু কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইলেন নদীর ওপারে লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে।

সেই মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটল। বুধন শনিচারী শনিচারী বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল খরস্রোতা নদীর জলে। অন্ধকার স্রোতে ভাসমান সেতুর কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে কোথায় সে হারিয়ে গেল।

আদিবাসীরা রয়ে গেল এপারে। পরদিন অনেক পথ ঘুরে মুংরা যে খবর ট্রেডিং কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে আনল তা আরও ভয়াবহ। রাতে কোম্পানির ডাইরেক্টর সাহেব খুন হয়েছেন। আর এই খুনের দায়ে ধরা পড়েছে বুধন আর শনিচারী।

···কেস চলল। একদিকে পুলিস অন্যদিকে আদিবাসীরা। ডাইরেক্টর বাহাদুর ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কেস চালাতে লাগল পুলিস। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামীরা। পুরাতন কোন আক্রোশের সুযোগ নিয়ে তারা এই হত্যাকাণ্ড করেছে। বুধন নিজেই আদিবাসী পল্লীতে আগুন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যে ডাইরেক্টর সাহেবের লোকেরা এ কাজ করেছে। তারপর নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। এর ভেতরেও সে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তার স্ত্রীর ওপর বলাৎকার করার দরুনই এ কাজ সে করতে বাধ্য হয়েছে।

পুলিস পক্ষ আরও বলেছে, আমরা অনুসন্ধানে জেনেছি, সেদিন আদিবাসী পল্লীর একটি বৃদ্ধা ছাড়া সবাই সীতাপুর গ্রামে মেলায় গিয়েছিল। তবে এই আদিবাসী স্বামী স্ত্রীতেই বা কি জন্যে যায়নি সেখানে। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। তাছাড়া আরও কোন সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক মনে হয় এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু প্রমাণ অভাবে এখনও সঠিক সে কথা বলা যাচ্ছে না। এই যুবা আদিবাসী দম্পতি শুধু যে ডাইরেক্টর বাহাদুরকেই খুন করেছে তা নয়, একটি নিরীহ বৃদ্ধাও এদের এই নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে।

জেরার মুখে বুধন বলেছে, সে স্ত্রীর মান বাঁচাতে সাহেবকে মেরেছে।

আবার শনিচারী বলেছে, তার মরদের কোন দোষ নেই। সে নিজেই মান বাঁচাতে মেরেছে সাহেবকে। মরদ তাকে খুঁজতে এসেছিল সাহেবের মঞ্জিলে।

পুলিস বলেছে, অসম্ভব কথা। ডাইরেক্টর তিমিরবরণ মিশ্রের নামে এমন কোন কলঙ্কের কাহিনী তাদের জানা নেই। তারা তাঁকে সৎ একজন কর্মযোগী পুরুষ বলেই জানে। তাছাড়া, তারা একসময় কোন একটি অনুষ্ঠানে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মুখ থেকে শুনেছে যে, কাজই তাঁর সহধর্মিণী।

সুপ্রকাশ এসে বলল, সীমা, এখন তোমার পালা। সমস্ত সংকোচকে দূরে সরিয়ে সত্যকে তুলে ধরার সময় এসেছে।

সীমা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

জেরার উত্তরে সে বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে একটি ভদ্র রকমের চাকরি যোগাড় করতে পারেনি। শুধু লজেন্স বিক্রি করেই দিন কাটছিল। একদিন এক পত্রিকার রিপোর্টারের সঙ্গে তার দেখা। সেই রিপোর্টার ভদ্রলোক তাঁদের পত্রিকায় তার অবস্থা সম্বন্ধে একটি পরিচয় প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকা পাঠ করে দুটি লোক তার বাড়িতে যান, এবং তাঁদের কোম্পানির ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁরা এও বলেন যে ডাইরেক্টর বাহাদুর নাকি তাঁর ফার্মে এমনি কর্মীই চান।

সীমা বলল, সে সেই আশ্বাসেই এসেছিল, এবং এসেই উঠেছিল ডাইরেক্টর বাহাদুরের অতিথি নিবাসে। কিন্তু রাতে একটি মেয়ে এসে ডাইরেক্টরের কু-মতলবের কথা তার কাছে বলে। সে তখন নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পার হয়ে আসে। তারপর রাতের অন্ধকারে বহুদূর পথ পার হয়ে দিবাকর মিশ্র মহাশয়ের আশ্রয়ে এসে পেঁছিয়!

সীমার সাক্ষ্য শেষ হলে হাজির করা হল সেই মেয়েটিকে যে ডাইরেক্টরের কু-মতলবের খবর দিয়েছিল সীমার কাছে।

বসন্তের দাগে ভর মুখ নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, দোহাই ধর্মাবতার, আমার অতীত জীবনের কথা তুলে আমাকে আর বিব্রত করবেন না। শুধু আমি এইটুকু বলব, আমার আগের সাক্ষী যে দুটি লোকের কথা উল্লেখ করে গেলেন তারাই একদিন গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। তারপর নানাছলে আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা তাঁকে চাকরি দেবার নাম করে নিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর সেখান থেকে ওদেরই একজন একদিন গ্রামে আমার কাছে গিয়ে বলে যে আমার স্বামী বিশেষ অসুস্থ, আমাকে তখুনি যেতে হবে। আমি ওদের সঙ্গে চলে এলাম। এসে দেখলাম, একটি অন্ধকার ভাঙা ঘরে আমার স্বামী মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর কি রোগে মৃত্যু হল তা আমি বুঝলাম না। তখন শোকে আমি আচ্ছন্ন। স্বামীর শেষকৃত্য করে ওদেরই সঙ্গে এসে উঠলাম ডাইরেক্টর বাহাদুরের প্রমোদভবনে। সে বন্দী জীবন আমার আজও চলেছে। বিশ্বাস করুন, আমি সুন্দরীই ছিলাম একদিন। এই কিছুকাল আগে বসন্তরোগে আমি আমার রূপ হারিয়েছি। বোধহয় রূপ হারিয়েই আমি বেঁচে গিয়েছি। আমাকে শুধু ডাইরেক্টর বাহাদুরেরই মনোরঞ্জন করতে হত না, তাঁর ওখানে ব্যবসায়িক সূত্রে যে সব দেশবিদেশের অতিথি আসতেন তাঁদেরও মনোরঞ্জন করতে হত। আমি একটি পণ্যা নারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য যাতে আর কারো ওপর গিয়ে না পড়ে সেজন্যে আমি সীমা দেবীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

শেষ সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র।

মহামান্য বিচারক মহোদয়,

জীবনের একটি সত্যকে এতকাল আমি গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু

এখন বুঝেছি সত্যকে কখনো গোপন করে রাখা যায় না।

এই যে ট্রেডিং কোম্পানি, এককালে এর মালিক ছিলাম আমি। আমার সঙ্গে প্রথম থেকে কাজ করে যিনি এই ফার্মটি গড়ে তোলায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি আমার কর্মচারী হলেও ছিলেন বন্ধুর মত। তাঁর সততায় ও আমার কর্মক্ষমতায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। আমরা এমনি বন্ধু ছিলাম যে দুই বোনকে আমরা বিয়ে করি। দু'বোনের দুটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু এক অগ্নিকাণ্ডে এক বোনকে বাঁচাতে গিয়ে দুই বোনেরই মৃত্যু হয়। শিশু দুটি বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল বলে তারা রক্ষা পায়। আমার বন্ধু এমনি ব্যথা পেয়েছিলেন যে তিনি সংসার ছেড়ে তাঁর সন্তানকে আমার হাতে তুলে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান।···আমি শিশু দুটিকে মানুষ করি। কিন্তু আমার নিজের সন্তান অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আমার বন্ধুর ছেলেটি হল সুস্থির। আমি দুটিকে বাল্যকালেই ভারতের দুটি আলাদা জায়গায় রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলাম। ওরা যখন শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে ফিরল তখন আমার আপন সন্তানের হাতে তুলে দিলাম এই ফার্মের ভার, আর আমার বন্ধুর পুত্রকে দিলাম আমার জমিদারি—সীতাপুর গ্রামখানা।

আমি দেখলাম, শিক্ষা আমার সন্তানের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারল না। তার উচ্ছৃংখলতার খবর আমার কানে এসে পেঁছিতে লাগল। এদিকে আমার বন্ধুপুত্র সুপ্রকাশ তার গুণে আমাকে মুগ্ধ করল। আমি দেখলাম, লোভ মানুষকে কিভাবে হত্যা করে আর ভালবাসা, মানুষকে কিভাবে সবার অন্তরে চিরজীবী করে। তিমিরবরণকে আমি জন্ম দিয়েছি কিন্তু সুপ্রকাশ পেয়েছে আমার হৃদয়ের অধিকার। ধর্মাবতার, পুত্রের মৃত্যু প্রতিটি পিতার কাছেই শোকের সংবাদ, কিন্তু পুত্রের অন্যায়কে যদি আজ আমি না স্বীকার করি তাহলে পরলোকে গিয়েও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

বিচারগৃহ স্তব্ধ।

যেদিন রায় বের হল, সেদিন বেকসুর মুক্তি পেল বুধন আর শনিচারী।

এরপর শুরু হল সেই ভাঙা সেতু গড়ে তোলার কাজ। সীতাপুরের কৃষক আর আদিবাসী কুলিরা হাত মেলাল একসঙ্গে। সুপ্রকাশ পেল ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির দায়িত্বভার। সেদিন সীতাপুরের কৃষক আর ওপারের কুলিরা মিলে তাদের চিরদিনের রাজাভাইকে নিয়ে উৎসব করল। সেদিন কর্মচারীদের কল্যাণেই সুপ্রকাশ উৎসর্গ করল তার ফার্ম।

একসময় নিভৃতে সীমাকে পেয়ে সুপ্রকাশ বলল, বিধাতা দু'পারের রাখী-বন্ধন সম্পূর্ণ করলেন। এখন বাকী রইল শুধু আর একটি বন্ধন।

সীমা বলল, সে কি আজও বাকী আছে সুপ্রকাশদা।